চিন্তামণি

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রণীত

প্রথম সংস্করণ

১৩২৯

প্রকাশক
শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শান্তিনিকেতন।

মূল্য ১৲ টাকা।

শান্তিনিকেতন প্রেসে
শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত
শান্তিনিকেতন (বীরভূম)

সূচী

চিন্তামণি

হারামণির অন্বেষণ।

উপক্রমণিকা।

প্রাণ চায় তো আর-কিছু না—কেবল সে খাইয়া-পরিয়া কথঞ্চিৎ-প্রকারে বর্ত্তিয়া থাকিতে পারিলেই বাঁচে। মনের আকিঞ্চন আর-একটু বেশী—মন চায় আনন্দে বর্ত্তিয়া থাকিতে। জ্ঞান হাত বাড়ায় আরো উচ্চে—জ্ঞান চায় অক্ষয়ধনে ধনী হইয়া নিত্যকাল আনন্দে বর্ত্তিয়া থাকিতে, অর্থাৎ আনন্দে বর্ত্তিয়া থাকা'র ব্যাপারটাকে আপনার কর্ত্তৃত্বের মুঠার মধ্যে আনিতে। জ্ঞান যাহা চায়, তাহা সে পাইবে কেমন করিয়া? জ্ঞান যে আত্মবিস্মৃত। একএকবার বিদ্যুতের ন্যায় যখন তাহার স্মৃতি গা ঝাড়া দিয়া উঠিতেছে, তখন সে মাথা তুলিতেছে—তাহার পরক্ষণেই নতশির! আত্মাকে হারাইয়া জ্ঞান দুর্ব্বিপাকে পড়িয়াছে বড়ই বিষম! মণিহারা ফণীর ন্যায় অধীর হইয়া উঠিতেছে যখন-তখন! হারামণি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে যেখানে সেখানে! চেষ্টা ছাড়িতেছে না কিছুতেই! একবার'কার রোগী যেমন আরবার'কার রোঝা হয়, জ্ঞান তেম্নি—একবার প্রাণ হইয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে, একবার মন হইয়া প্রশ্ন তুলিতেছে, একবার বুদ্ধি হইয়া উত্তর প্রদান করিতেছে। বুদ্ধির কথা—একবার মন বুঝিতেছে, প্রাণ বুঝিতেছে না; একবার প্রাণ বুঝিতেছে, মন বুঝিতেছে, না; একএকবার আবার এমনও হইতেছে যে, বুদ্ধি নিজের কথা নিজে বুঝিতেছে কি না,

সন্দেহ। নানা শ্রেণীর নানা কথার ঘ্যান্‌ঘ্যানানিতে তিতিবিরক্ত হইয়া আমি জ্ঞানকে বলিলাম—"তোমার আপনার সঙ্গে আপনার এরূপ বোঝাপড়া চলিতে থাকিবে কতদিন?" ভাবিত অন্তঃকরণে ভ্রূললাট কুঞ্চিত করিয়া জ্ঞানতাহার উত্তর দিলেন, এই যে, "হারামণি পাওয়া না যাইবে যতদিন।"

প্রশ্নোত্তর।

মূল জিজ্ঞাস্য দুইটি—(১) কি আছে এবং (২) কি চাই। ইহার সোজা উত্তর এই যে, আছে সত্য,—চাই মঙ্গল।

প্রশ্ন। এ যে একটি কথা তুমি বলিতেছ "আছে সত্য"—তোমার এই গোড়া'র কথাটি'র ভাবার্থ আমি এইরূপ বুঝিতেছি যে যাহা আছে তাহাই সত্য। তবেই হইতেছে যে, সবই সত্য—সত্য ছাড়া দ্বিতীয় পদার্থ নাই। কিন্তু মঙ্গল চাহিতে গেলে মঙ্গল বলিয়া একটা পৃথক্ বস্তু থাকা চাই, আর, তা ছাড়া—চাহিবার একজন কর্ত্তা থাকা চাই। সত্য ছাড়া দ্বিতীয় পদার্থ যখন নাই—তখন যাহা আছে তাহাতেই সন্তুষ্ট না থাকিয়া তদ্ব্যতীত চাহিবার বস্তুই বা পাইতেছ কোথা হইতে—চাহিবার কর্ত্তাই বা পাইতেছ কোথা হইতে?

উত্তর। সত্য আপনিই চাহিবার বস্তু, আপনিই চাহিবার কর্ত্তা। সত্য আপনাকে আপনি চা'ন, আপনাকে আপনি পা'ন, আপনাতে আপনি আনন্দে বিহার করেন;—সত্যই মঙ্গল।

প্রশ্ন। আপনাকে-আপনি-চাওয়াই বা কিরূপ, আপনাকে আপনি-পাওয়াই বা কিরূপ?

উত্তর। সত্য যদি কস্মিন্‌কালেও কাহারো নিকট প্রকাশিত না হ'ন;

না আপনার নিকটে—না অন্যের নিকটে—কাহারো নিকটে কোনকালে প্রকাশিত না হ'ন, আর, কোনোকালে যে কাহারো নিকটে প্রকাশিত হইবেন—মূলেই যদি তাহার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে "সত্য আছেন" কথাটাই মিথ্যা হইয়া যায়। সত্য যদি প্রকাশই না পা'ন, তবে তিনি যে আছেন, তাহা কে বলিল? তাহার প্রমাণ কি? সত্য যদি তোমার নিকটে জন্মেও প্রকাশ না-পাইয়া থাকেন, আর, তবুও যদি তুমি বলো "সত্য আছেন", তবে তোমার সে কথার মূল্য—এক কানাকড়িও নহে। দ্বিপ্রহর রজনীতে তুমি যখন প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিলে, তখন তুমি ভাবিতেও পার নাই যে, সত্য বলিয়া এক অদ্বিতীয় ধ্রুবপদার্থ সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে বিদ্যমান। তোমার নিদ্রাভঙ্গে যখন তোমার নবোন্মীলিত চক্ষে চেতনের কপাট এবং দিক্‌চক্রবালে আলোকের কপাট—এক কপাট মর্ত্ত্যলোকে এবং আর এক কপাট স্বর্গলোকে—দুই লোকে দুই কপাট একই সময়ে উদ্‌ঘাটিত হইল, আর, সেই শুভযোগে যখন তুমি উপরে নীচে আশেপাশে এবং চারিদিকে চাহিয়া-দেখিয়া জানিতে পারিলে যে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কল্যও যাহা ছিল—অদ্যও তাহাই আছে, আর, সেই সঙ্গে যখন দেখিলে যে, বিশ্বজ-নী প্রকৃতির ক্রোড়ে কল্যও যেমন নিঃশঙ্কচিত্তে বসিয়া-ছিলে, অদ্যও তেমনি নিঃশঙ্কচিত্তে বসিয়া আছ, তখন তোমার মন বলিল যে, সত্য আছেন, আর, তোমার সুবুদ্ধি তৎক্ষণাৎ তাহাতে সায় দিল। "কে তোমাকে জাগাইয়া তুলিল?" এখন তোমার মুখে কথা ফুটিয়াছে, তাই তুমি বলিতেছ "আমাকে কেহই জাগাইয়া তোলে নাই—আমি আপ্নি জাগিয়া উঠিয়াছি।" এটা তুমি দেখিতেছ না যে, তুমি যাহাকে বলিতেছ "আমি আপ্নি"—তোমার গতরাত্রের প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় সে আপ্নি ছিলই না মূলে, তাহার পরিবর্ত্তে ছিল কেবল একটা অন্ধ, পঙ্গু এবং অক-র্ম্মণ্যের একশেষ তোমার বিছানায় পড়িয়া। সেই অসাড় অপদার্থটার কম্ম

কি আপনার বলে অজ্ঞান-অন্ধকার ঠেলিয়া-ফেলিয়া জ্ঞানে ভর দিয়া দাঁড়ানো ? যাহার হাত-পা অসাড়, চক্ষু অন্ধ, তাহার কি কর্ম্ম সাঁতার দিয়া পদ্মা পার হইয়া উচ্চডাঙায় উঠিয়া দাঁড়ানো ? সে তো তখন অকর্ত্তা। অকর্ত্তা'র আবার কর্ম্ম কিরূপ ? অকর্ত্তার কর্ম্মও যেমন, আর, বন্ধ্যার পুত্রও তেম্‌নি দুইই সমান। ফল কথা এই যে, তোমার প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় একে তো জাগিয়া উঠিতে পারিবার মতো শক্তি ছিল না তোমার হাড়ে একবিন্দুও ; তাহাতে আবার, জাগিয়া উঠিবার ইচ্ছা যে, কোনো দিক্ দিয়া তোমার মনের ত্রিসীমার মধ্যেও প্রবেশ করিবে, তাহার পথ ছিল না মূলেই। অতএব এটা স্থির যে, তুমি আপন ইচ্ছায় জাগিয়া ওঠো নাই। কাহার ইচ্ছায় তবে তোমার মনের অজ্ঞান অন্ধকার ঠেলিয়া ফেলিয়া প্রাণের ভিতর হইতে জ্ঞানের আলোক অল্পে-অল্পে ফুটিয়া বাহির হইল ? সত্য ভিন্ন যখন দ্বিতীয় পদার্থ নাই, তখন কাজেই বলিতে হইতেছে যে জাগ্রৎজগতেই হো'ক্ আর নিদ্রিত জগতেই হো'ক্, পর্ব্বতশিখরেই হো'ক্ আর সমুদ্রগর্ব্ভেই হো'ক্, পর্ণকুটীরেই হো'ক্ আর স্বর্ণপ্রাসাদেই হো'ক্—যেখানে যে-কোনো কার্য্য হইতেছে, হইতেছে তাহা সত্যেরই ইচ্ছায়—তোমার ইচ্ছায়'ও নহে, আমার ইচ্ছায়'ও নহে। সত্যই আপন ইচ্ছায় তোমাকে জাগাইয়া তুলিয়া তোমার নিকটে প্রকাশিত হইলেন ; তা' শুধু না—তিনিই আপন ইচ্ছায় তোমাকে জাগাইয়া-রাখিয়া তোমার নিকটে প্রকাশ পাইতেছেন, আর, প্রকাশ পাইতেছেন বলিয়াই, তুমি অকুতোভয়ে বলিতে পারিতেছ যে, সত্য আছেন। সত্য এই যে তোমার নিকটে প্রকাশিত হইতেছেন, আর, তুমি যে সত্যের প্রকাশ নয়ন ভরিয়া পান করিয়া প্রত্যহ পুনর্জন্ম লাভ করিতেছ, ইহার অবশ্যই কোনো-না-কোনো নিগূঢ় কারণ আছে—নহিলে সত্যই বা তোমার কে, আর, তুমিই বা সত্যের কে যে, তুমি সত্যের দেখা না পাইলে তোমার

মঙ্গল নাই, আর, সত্য তোমাকে দেখা না দিলে তাঁহার নিস্তার নাই। কেমন করিয়া বলিব যে, তুমি সত্যের কেহই না বা সত্য তোমার কেহই না। তুমি তো আর অসত্য নহ। তুমি যে আমার চক্ষের সম্মুখে সত্য দেদীপ্যমান! তুমি যদি অসত্য হইতে, তবে তোমাকে কে বা পুছিত? তুমি সত্য বলিয়াই সত্য তোমার নিকটে প্রকাশিত হইতেছেন; সত্য সত্যেরই নিকটে প্রকাশিত হইতেছেন—পরের নিকটে না। অতএব এটা স্থির যে তোমার নিকটেই হো'ক্, আমার নিকটেই হো'ক্, আর তৃতীয় যে-কোনো ব্যক্তির নিকটেই হো'ক্ যাহারই নিকটে সত্য প্রকাশ পা'ন—প্রকাশ পা'ন তিনি সত্যেরই নিকটে—আপনারই নিকটে। সত্যের এই যে আপনার নিকটে আপনার প্রকাশ, ইহারই নাম আপনাকে আপনি পাওয়া। কেন না, সত্যের প্রকাশেরই নাম সত্যের উপলব্ধি, আর, তাহারই নাম সত্যকে পাওয়া। আপনাকে-আপনি-পাওয়া কিরূপ তাহা দেখিলাম, এখন আপনাকে-আপনি-চাওয়া কিরূপ, তাহা দেখা যা'ক্।

আপনার প্রকাশে যখন আপনার প্রতি আপনার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, তখন আপনার প্রতি আপনার দৃষ্টির সেই যে প্রসক্তি, তাহা শুধুই কি কেবল চক্ষের চাওয়া? উদাসীন পরিব্রাজক পার্শ্বস্থ পুরস্বামীর প্রতি যে-ভাবে মুহূর্ত্তেক চাহিয়া আপনার গন্তব্যপথ অনুসরণ করেন, উহা কি সেইভাবের চাওয়া? সত্য কি আপনার নিকটে আপনি কোথাকার কোন্‌একজন বেয়ানা পথিক? তাহা হইতেই পারে না। ঠিক্ তাহার বিপরীত। পরস্পরের পছন্দসই সুবিবাহিত বরকন্যার শুভদৃষ্টির বিনিময়কালে উভয়ের চক্ষের চাওয়া'র মধ্য দিয়া কেমন অকৃত্রিম প্রাণের চাওয়া বাহির হইয়া পড়িতে থাকে—তাহা তো তোমার দেখিতে বাকি নাই! সেইভাবের প্রাণের চাওয়ার সঙ্গে আপনাকে-আপনি-চাওয়া'র সৌসাদৃশ্য থাকিবারই

কথা, কেন না, সুবিবাহিত বরকন্যা দোঁহে দোঁহার দ্বিতীয় আপ্নি। এটাও কিন্তু দেখা উচিত যে, দুয়ের মধ্যে সৌসাদৃশ্য যতই থাকুক্ না কেন, তাহা সৌসাদৃশ্য বই আর কিছুই নহে; সে সৌসাদৃশ্য একপ্রকার অপ্রতিমের প্রতিমা বা জ্যোতির্ম্মণ্ডলের গাত্রচ্ছায়া। প্রকৃত কথা এই যে, সত্য যে কিরূপ শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-পবিত্র-মধুময়-ভাবে আপনার প্রতি আপনি চা'ন আর, সেই অনিরুদ্ধ জ্ঞানের চাওয়ার মধ্য দিয়া অতলস্পর্শ গভীর প্রাণের চাওয়া যে কিরূপ অপরিসীম ধীরগম্ভীর এবং অটল শক্তিপ্রভাবে—মহাসংযম এবং মহা-উদ্যম দুয়ের্ অনির্ব্বচনীয় যোগপ্রভাবে উদ্বেল হইয়া, জ্যোতির্ম্ময় আশীর্ব্বাদে নিখিল ব্যোম উদ্দীপিত করিয়া, ভূর্ভুবস্বঃ হইয়া, দশদিকে ফাটিয়া পড়িতেছে, তাহা (আমরা তো কীটাণুকীট) মহোচ্চ দিব্যধামবাসী মুনিঋষি এবং দেবতাদিগেরও ধ্যানের অতীত।

প্রশ্ন। তা তো বুঝিলাম। কিন্তু তাহাতে আমার জিজ্ঞাসা থামিতেছে কই?—বরং বৃদ্ধিই পাইতেছে। আমি চাই জানিতে চাওয়া এবং পাওয়া একত্র বাস করিবে কেমন করিয়া? বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল পি'বে কেমন করিয়া? আমি তো এইরূপ বুঝি যে, যতক্ষণ পাওয়া না হয়, ততক্ষণই প্রাণের ভিতর হইতে চাওয়া বাহির হইতে থাকে; পাওয়া হইলেই চাওয়া ঘুচিয়া যায়। তবে যদি বলো যে, সত্য কোনো-সময়ে বা আপনাকে পা'ন, কোনো-সময়ে বা আপনাকে চা'ন; সেটা বটে একটা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। তাই কি তোমার অভিপ্রায়? তুমি কি বলিতে চাও, সত্যের প্রকাশ সাময়িক প্রকাশ? আবার তা'ও বলি, অপ্রকাশের অবস্থায় চাওয়া কতদুর সম্ভবে—সেটাও একটা ভাবিবার বিষয়—বিশেষত প্রতিদিনই যখন দেখিতেছি যে, রাত্রিকালের প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় অপ্রকাশ যে-সময়ে সর্ব্বেসর্ব্বা হয়, সে সময়ে চাওয়া ধুইয়া-পুঁছিয়া মন হইতে এম্নি সাফ্ সরিয়া পলায় যে, তাহার চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট থাকে না। বলিতে

কি—আমার জিজ্ঞাসা রক্তবীজের সহোদর—মরিতে চাহে না কিছুতেই! ওক বীরের নিপাত হইল তো অমি তার জায়গায় তিন বীর আসিয়া তাল ঠুকিয়া দণ্ডায়মান! তার সাক্ষী :—

নবোত্থিত তিন প্রশ্ন।

(১) চাওয়া-পাওয়া'র একত্র বাস কিরূপে সম্ভবে?

(২) সত্যের প্রকাশ সাময়িক প্রকাশ, না চিরপ্রকাশ?

(৩) প্রকাশ এবং অপ্রকাশের সহিত চাওয়া-পাওয়া'র কিরূপ সম্বন্ধ?

উত্তর। তোমার তিন প্রশ্নের উত্তর এক সঙ্গে দিতে হইলে, তাহা আমার ন্যায় একমুখো ব্যক্তির সাধ্যের অতীত; কিন্তু, তা বলিয়া, তোমার হতোদ্যম হইবার বিশেষ কোনো কারণ দেখি না, কেন না এটা আমি বেস্ জানি যে, ঐ তিন প্রশ্নের একটির রীতিমত মীমাংসা হইলেই, সেইসঙ্গে আর-দুইটির মীমাংসা আপনা আপনি হইয়া যাইবে, তা বই, তাহার জন্য স্বতন্ত্র উপায়-চেষ্টার প্রয়োজন হইবে না। তিনটির মধ্যে কোন্‌টি তোমার মুখ্য জিজ্ঞাস্য—সেইটি আমাকে বলো, তাহা হইলে তোমার জিজ্ঞাসার রসদ যোগানো আমাকর্তৃক যতদূর সম্ভবে তাহার আমি বিধিমতে চেষ্টা দেখিব।

প্রশ্ন। বলিতেছিলাম যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত পাওয়া না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্তই চাওয়া বাহির হইতে থাকে—পাওয়া হইয়া চুকিলেই চাওয়া বন্ধ হয়। তাই বলি যে, চাওয়া এবং পাওয়া একত্রে বাস করিবে কেমন করিয়া—বাঘেগরুতে একঘাটে জল পি'বে কেমন করিয়া?

উত্তর। এইমাত্র তুমি তোমার বাগানের মালীকে ডাকিয়া আম্র চাহিলে। তুমি যদি ইহার পূর্ব্বে কোনোকালে আম্রের আস্বাদ না পাইতে, তাহা

হইলে কখনই তুমি আম্র চাহিতে না। তবেই হইতেছে যে, চাওয়া বলিয়া যে একটি ব্যাপার, তাহা পাওয়া'রই রেস্ অর্থাৎ অনুতান বা লেজুড়। আবার, একটু পূর্ব্বে তুমি যখন তোমার বাগানের মালঞ্চ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলে, আর, সেই সুযোগে আমি যখন দিব্য একটি ফুটন্ত গোলাপ-ফুল দেখিয়া তাহা তুলিবার জন্য হাত বাড়াইলাম, তুমি তৎক্ষণাৎ আমার হাত টানিয়া ধরিয়া বলিলে, "কর কি—কর কি! উহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আমার মন বলিতেছে 'চিরজীবী হইয়া বাঁচিয়া থাকো!' আর, তুমি কি না স্বচ্ছন্দে উহাকে বধ করিবার জন্য হস্ত উত্তোলন করিতেছ—তুমি দেখিতেছি জল্লাদের শিরোমণি!" ফুলের সৌন্দর্য্য সেই যে তুমি জ্ঞানে উপলব্ধি করিলে, জ্ঞানের সেই উপলব্ধিক্রিয়ার নামই পাওয়া, আর, আমি ফুলের গাত্রে হস্তক্ষেপ করিবামাত্র তোমার প্রাণ সেই যে কাঁদিয়া উঠিল প্রাণের সেই ক্রন্দনের নামই ফুলটিকে বাঁচাইয়া রাখিতে চাওয়া। যে সময়ে তুমি ফুলটিকে তোমার চক্ষের সম্মুখে পাইয়াছিলে, সেই সময় হইতেই তুমি চাহিতেছিলে যে, ফুলটি চিরজীবী হইয়া বাঁচিয়া থাকুক্; একই অভিন্ন সময়ে, তোমার জ্ঞানের পাওয়া এবং প্রাণের চাওয়া পরস্পরের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া হরিহরাত্মা হইয়া গিয়াছিল;—তবে আর কেমন করিয়া বলিব যে, চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্যে ব্যাঘ্রমৃগের সম্বন্ধ। তোমার দৃষ্টিতে তুমি যেখানে দেখিতেছ ব্যাঘ্রমৃগের সম্বন্ধ, আমার দৃষ্টিতে আমি সেখানে দেখিতেছি পুরুষপ্রকৃতির সম্বন্ধ বা জ্ঞানপ্রাণের সম্বন্ধ। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—জ্ঞান সব-চেয়ে ভাল বাসে কাহাকে? জ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করিলে জ্ঞান কি বলে? জ্ঞান বলে—প্রাণতুল্য ভালবাসাই ভালবাসার সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। তাহা যখন সে বলে, তখন তাহতেই বুঝিতে পারা যায় যে, জ্ঞান প্রাণকে যেমন ভালবাসে, এমন আর কাহাকেও নহে। প্রাণ আবার তেমি-ভালবাসে জ্ঞানকে। জ্ঞান এক-

মুহূর্ত্ত চক্ষের আড়াল হইলে প্রাণ দশদিক্ অন্ধকার দেখে। জ্ঞান ছাড়িয়া পলাইলে প্রাণের নাড়ি ছাড়িয়া যায়। ভালবাসা যদিচ বস্তু একই, তথাপি জ্ঞানের ভালবাসা এবং প্রাণের ভালবাসার মধ্যে একপ্রকার অভেদ-ঘ্যাঁসা প্রভেদ আছে, আর, সে যে প্রভেদ, তাহার গোড়ার কথা হ'চ্চে প্রতিযোগিতা অর্থাৎ পাশ্চাত্যবিজ্ঞানশাস্ত্রে যাহাকে বলে Polarity কিনা মিথুনীভাব। পুরুষ যেভাবে স্ত্রীকে ভালবাসে, জ্ঞান সেইভাবে প্রাণকে ভালবাসে, আবার, স্ত্রী যেভাবে পুরুষকে ভালবাসে, প্রাণ সেইভাবে জ্ঞানকে ভালবাসে। রূপকচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, নবোদিত সূর্য্য যেভাবে পদ্মিনীর প্রতি চক্ষু উন্মীলন করে, নবোদিত জ্ঞান সেইভাবে প্রাণের প্রতি চক্ষু উন্মীলন করে, তার সাক্ষী—মানুষ্যাবতারের আদিম বয়সে পৃথিবীতে জ্ঞানের যখন সবে-মাত্র অরুণোদয় দেখা দিয়াছিল, তখন জ্ঞানের কার্য্যই ছিল—প্রাণ কিসে ভাল থাকে—অহোরাত্র কেবল তাহারই পন্থায় ঘুরিয়া বেড়ানো। আবার, সুরভি নিশ্বাস ছাড়িয়া পদ্মিনী যেভাবে নব বিভা-করের প্রতি হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করে;—প্রাণ সেইভাবে জ্ঞানের প্রতি হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করে;—জ্ঞানকে পাইলেই প্রাণ তাহার নিকটে আপনার নিগূঢ় অন্তরের কথা খোলে—বিনা বাক্যে অবশ্য, কেন না, জ্ঞান শ্রোতা নহে—জ্ঞান দ্রষ্টা; জিজ্ঞাসা বটে শ্রোতা, আর সেই জন্য তাহার সাঙ্কেতিক-চিহ্ন কর্ণাকৃতি (?) এইরূপ,—ফলে, জ্ঞানের চক্ষে আকারইঙ্গিতই বাক্যের চূড়ান্ত। একই আম্রের অঙ্কুর যেমন আঁটির দলযুগলের যোড়ের মাঝখান হইতে দুই দিকের দুই ডাল হইয়া ছট্‌কাইয়া বাহির হয়, একই ভালবাসা তেম্‌নি পুরুষপ্রকৃতির দাম্পত্যবন্ধনের মাঝখান হইতে দুইভাবের দুইতরো ভালবাসা হইয়া ছট্‌কাইয়া বাহির হয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, স্ত্রীর প্রতি পুরুষের ভালবাসাই বা কি-ভাবের ভালবাসা? যখন দেখিতেছি-যে, স্বামী নববিবাহিতা স্ত্রীকে "তুমি আমার ভব জলধি-রত্ন" বলিয়া অধি

কার করে, তখন তাহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, স্বামীর ভালবাসা অধিকার প্রধান—স্বামীত্ব-প্রধান—পাওয়া প্রধান ; পক্ষান্তরে, যখন দেখিতেছি যে, স্ত্রী অকথিত ভাষায় "আমি তোমারই" বলিয়া একান্ত অধীনাভাবে স্বামীর আশ্রয় যাচ্ঞা করে, তখন তাহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, স্ত্রীর ভালবাসা অধীনতা-প্রধান—চাওয়া প্রধান, আর, চাওয়া মুখ খুলিতে পারে না বলিয়া লজ্জ-প্রধান। এখন দেখিতে হইবে এই যে, পাওয়া বা অধিক্রিয়া বা উপলব্ধিক্রিয়া প্রানের যেমন স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, চাওয়া বা অভাবজ্ঞাপক বা ক্রন্দন প্রাণের তেম্‌নি স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। পুরুষের প্রতি স্ত্রীর যেরূপ চাওয়া-প্রধান ভালবাসা, তাহা প্রাণ-ঘ্যাঁসা-মনের ভালবাসা—সংক্ষেপে প্রাণের ভালবাসা ; আর, স্ত্রীর প্রতি পুরুষের যেরূপ পাওয়া-প্রধান ভালবাসা তাহা জ্ঞানঘ্যাঁসা-মনের ভালবাসা—সংক্ষেপে জ্ঞানের ভালবাসা। স্ত্রীর প্রাণের ভালবাসা এক-প্রকার জ্ঞানশূন্য অহেতুক ভালবাসা ; রাধাকে তাই কবিরা বলেন "উন্মাদিনী রাধা"। পক্ষান্তরে, পুরুষের জ্ঞানের ভালবাসা একপ্রকার রত্নচেনা চোকো'লো ভালবাসা, কৃষ্ণকে তাই কবিরা বলেন "চতুর চূড়ামণি"। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, "কৃষ্ণকে ভালবাসি জানি না সই আমি কি জন্য" এইরূপ জ্ঞানশূন্য অহেতুক ভালবাসা বড় না "রাধা মূর্ত্তিমতী প্রেমমাধুরী, তাই আমি রাধার চরণ-কিঙ্কর" এইরূপ চোকো'লো-ধাঁচার সহেতুক ভালবাসা বড়? ইহার উত্তর এই যে রাধার অহেতুক ভালবাসা প্রাণাংশে বড়, কৃষ্ণের সহেতুক ভালবাসা জ্ঞানাংশে বড়। হারজিতের কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহার উত্তরে আমি বলি এই যে,

ভিন্ন জাতির ভিন্ন রীত।
আপন মুলুকে সবার'ই জিত।

ফলকথা এই যে কৃষ্ণরাধিকার যুগবাঁধা প্রেম এ বলে আমায় ন্যাখ, ও বলে

আমায় স্থাথ্; দুয়েরই মর্য্যদা নিক্তির ওজনে সমান; যেহেতু জ্ঞানের পাওয়া এবং প্রাণের চাওয়া চখাচখীর ন্যায় সখাসখী। ভিতরের কথাটি তবে তোমাকে ভাঙিয়া বলি—

প্রাণ হইতে জ্ঞানে পৌঁছিবার মাঝপথে একটি ঘাটি-স্থান আছে, সেই-টিই ভালবাসার জন্মস্থান। সেই স্থানটি হ'চ্চে মন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, মন পদার্থটা কি? গঙ্গাজলই যেমন গঙ্গার সারসর্ব্বস্ব, তেম্নি, মানস বলিয়া যে-একটি মনোবৃত্তি আছে তাহাই মনের সারসর্ব্বস্ব। মানস, সঙ্কল্প, ইচ্ছা, মন একই। তার সাক্ষী—"মন নাই" বলিলে বুঝায় ইচ্ছা নাই, "মনে ধরে না" বলিলে বুঝায় ইচ্ছার সঙ্গে মেলে না, "মন যায় না" বলিলে বুঝায় ইচ্ছা হয় না। পৃথিবীর ভূগোল তোমার নখাগ্রে তাহা আমি জানি; তোমার জানিতে কেবল বাকি মনের ভূগোল; জানা কিন্তু উচিত—বিশে-ষতঃ তোমার মতো পণ্ডিতলোকের। অতএব প্রণিধান কর—

মন হ'চ্চে মানস-সরোবর বা ইচ্ছা-সরোবর, আর তা'র দুই কূল হ'চ্চে জ্ঞান এবং প্রাণ। মনের যে-জায়গাটি জ্ঞানের কূল ঘেঁষিয়া তরঙ্গিত হয়, মানস-সরোবর সেই জ্ঞানঘ্যাঁসা কিনারাটি প্রভাবাত্মক বা প্রভুত্বপ্রধান বা পাওয়া প্রধান ইচ্ছা সংক্ষেপে ঈশনা; আর মনের যে জায়গাটি প্রাণের কূল ঘেঁসিয়া তরঙ্গিত হয়, মানস-সরোবরের সেই প্রাণঘ্যাঁসা কিনারাটি অভাবা-ত্মক বা অধীনতাপ্রধান বা চাওয়া-প্রধান ইচ্ছা, সংক্ষেপে বাসনা। মুখে সব কথা খোলোসা করিয়া বলিতে গেলে বড্ড বেশী বকিতে হয়, অথচ, বক্তা'র কেবল বকুনিই সার হয়—শুনিবেন যাঁহারা, তাঁহারা ঘড়ি-ঘড়ি স্ব স্ব গৃহের দিকে মুখ ফিরাইতে থাকেন। তাহাতে কাজ নাই। মানস সরোবরের একখানি ক্ষুদ্র মানচিত্রের (একপ্রকার চুম্বক চিটে'র) জোগাড় করিয়াছি, তাহা দেখিলেই সরোবরটি'র কূলকিনারা'র ঠাহর পাইতে তোমার একমুহূর্ত্তও বিলম্ব হইবে না; অতএব দেখ—

ও কূল—জ্ঞান

ও পারের কিনারা-ঈশনা বা পাওয়া-প্রধান ইচ্ছা

মানস সরোবর বা সঙ্কল্প বা ইচ্ছা বা মন

এ-পারের কিনারা—বাসনা বা চাওয়া-প্রধান ইচ্ছা

এ কূল—প্রাণ

মানচিত্রে এ যাহা দেখিলে, তাহা যদি বাস্তবিক-মানসসরোবরের সহিত হাতে কলমে মিলাইয়া দেখিতে চাও, তবে চলো তোমাকে সরোবরটির এ-পার হইতে পাড়ি দিয়া ও-পারে লইয়া যাই, তাহা হইলেই তোমার ধন্দ মিটিয়া যাইবে।

একটু পূর্ব্বে তুমি যখন নিদ্রায় অচেতন ছিলে, তখন তোমার নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘড়ি'র কলের মতো বাঁধানিয়মে চলিতেছিল ইহাতে আর ভুল নাই। ঘড়ি'র কলকে তো চালায় জানি ঘড়ি'র স্প্রিঙ্—তোমার নিদ্রাবস্থায় তোমার নিশ্বাস-প্রশ্বাস চালাইতেছিল কে? তোমার প্রাণ অবশ্য। তুমিট তো নিদ্রায় অচেতন, আর, আমি সেই সময়ে তোমার শয়নঘরের এককোণে চেয়ারে হ্যালান দিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছি; ইতিমধ্যে তোমার নাক ডাকিয়া উঠিল গগনভেদী সপ্তমস্বরে—ডাকিয়া উঠিল অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের ন্যায় এম্‌নি সহসা যে, আমি চমকিয়া উঠিলাম, আর সেই মুহূর্ত্তে যে-ছোট ছেলেটি তোমার পার্শ্বে শুইয়াছিল, তাহার ঘুম ভাঙিয়া যাওয়াতে সে বিছানায় উঠিয়া-বসিয়া ভয়োদ্বিগ্নচিত্তে তোমার শব্দায়মান নাসিকার প্রতি এক-

দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তুমি তো সামান্য ডাক্তার নহ, তুমি মহামহোপাধ্যায় এম-ডি, বলি তাই—সেই বছর-সাতেকের ছেলেটি তোমারই তো ছেলে! অ্যালোপাথিক ডাক্তারিবিদ্যায় সে পেঠ-থেকে পড়িয়াই পণ্ডিত। সে ভাবিল যে, "বাবার নাকের ছিদ্র দিয়া প্রাণ বাহির হইতে চাহিতেছে—কিছুতেই আমি তাহা হইতে দিব না"; এইরূপ ভাবিয়া ছেলেটি নাক টিপিয়া ধরিল যতদূর তাহার সাধ্য শক্ত করিয়া। তাহার ফল যাহা হইল, তাহা আনুপূর্ব্বিক বলিতেছি, শ্রবণ কর—

প্রথমে নিদ্রার ভাঙো-ভাঙো অবস্থায় তোমার দুঃস্বপ্নপীড়িত অর্দ্ধস্ফুট মনে নিশ্বাস প্রশ্বাসের পথের বাধা সরাইয়া ফেলিবার ইচ্ছার উদ্রেক হইল; আর, সে যে ইচ্ছা, তাহা নিতান্ত অবলা ইচ্ছা—চাওয়াপ্রধান প্রাণঘঁ্যাসা ইচ্ছা—বাসনা মাত্র। তাহার পরে তুমি ধড়্ফড়্ করিয়া জাগিয়া-উঠিয়া ছেলেটির হাতের কামড়্ হইতে তোমার নাসিকা ছাড়াইয়া লইতে ইচ্ছা করিলে; এবার'কার এ ইচ্ছা প্রভাবাত্মক সবলা ইচ্ছা—পাওয়া-প্রধান জ্ঞানঘঁ্যাসা ইচ্ছা; ইহারই নাম ঈশনা। যেই তোমার মনে জাগ্রত জ্ঞানের-উদয় হইল, সেই-অম্নি ঈশনার পরাক্রমের চোটে ছেলেটির হস্ত হইতে তৎক্ষণাৎ তুমি তোমার বিপন্ন নাসাগ্র টানিয়া-লইয়া ছেলে বেচারাটিকে এক ধমকে কাঁদাইয়া ফেলিলে। মানস-সরোবরের এ-কূল হইতে ও-কূলে—প্রাণ হইতে জ্ঞানে উত্তীর্ণ হইবার পথের ঠিক-ঠিকানা এই তো তুমি হাতে-কলমে পরীক্ষা করিয়া সুনির্ঘাত জানিতে পারিলে। পথ-অতিবাহনের ক্রম-পদ্ধতির বিবরণ এ যাহা তুমি জানিতে পারিলে, তাহা সংক্ষেপে এই—

স্থূল ক্রমপদ্ধতি।

(১) প্রাণ

(২) মন

(৩) জ্ঞান

সবিশেষ ক্রমপদ্ধতি।

(১) প্রাণ

(২)মন { (১॥০) প্রাণঘেঁ্যাসা মন—বাসনা
(৩॥০) জ্ঞানঘেঁ্যাসা মন—ঈশনা }

(৩) জ্ঞান

পূর্ব্বপ্রদর্শিত মানচিত্রখানিতে ক্রমপদ্ধতির অঙ্কচিহ্ন ছিল না। মানস-সরোবরের অমন একখানি সুন্দর নখদর্পণে অসম্পূর্ণতা-দোষ থাকিতে দেওয়া উচিৎ হয় কি? কোনোক্রমেই না; অতএব দেখ—

মানস-সরোবর মানচিত্রের

দ্বিতীয় সংস্করণ।

(৩) ও কূল——জ্ঞান

(৩॥০) পাওয়া-প্রধান জ্ঞানঘেঁ্যাসা মন—ঈশনা

(২) মানস-সরোবর—মন

(১॥০) চাওয়া প্রধান প্রাণঘেঁ্যাসা মন—বাসনা

(১) এ কূল—প্রাণ

প্রথমে পাওয়া হইয়াছিল মানস-সরোবরের কূলকিনারা'র সন্ধান. এক্ষনে পাওয়া হইল মানস-সরোবরের এ-কূল হইতে ও-কূলে পৌঁছিবার ক্রমপদ্ধতির সন্ধান। আর তিনটি বিষয়ের সন্ধান পাইতে এখনো বাকী; সে তিনটি বিষয় হ'চ্চে—(১) ব্যক্তাব্যক্ত-রহস্য, (২) ত্রিগুণ-রহস্য, এবং (৩) দ্বন্দ্ব-রহস্য বা চাওয়া-পাওয়া'র বিচ্ছেদমিলনের ব্যাপার।

ব্যক্তাব্যক্তরহস্য।

যাত্রাকালে পথযাত্রীর পক্ষে দুইটি কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ সমান আবশ্যক। প্রথমে দেখা চাই—কাজের সামগ্রীগুলি সমস্তই মোট বাঁধিয়া সঙ্গে লওয়া হইয়াছে কি না, তাহার পরে দেখা চাই—যে সময়ের জন্য যাহা প্রয়োজন, সেই সময়ে তাহা ঝট্‌পট্ খুঁজিয়া পাইতে পাইবার মতো সুন্দর প্রণালীতে সমস্ত ব্যবহার্য্য-দ্রব্য গুছাইয়া রাখা হইয়াছে কি না। প্রথম কার্য্যটী (অর্থাৎ মোটবাঁধা কার্য্যটী) একপ্রকার হইয়া চুকিল মন্দ না—প্রাণ, মন, জ্ঞান, এই তিন বৃহৎ প্যাঁটরা'র মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পূরিয়া ফ্যালা হইল। এখন, দ্বিতীয় কার্য্যটি (দ্রব্যাদি ভাগ-ভাগ করিয়া সুপ্রণালীতে গুছাইয়া রাখা কার্য্যটি) হইয়া-চুকিলেই নির্ঝঞ্ঝট হওয়া যায়; তাহাতেই প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

বিশাল অরণ্যে যে অগ্নি কোথায় লুকাইয়া থাকে, তাহা জানিতে পারা ভার, দাবানলের আরম্ভ কালে সেই অগ্নিই (অরণ্যদারুর অন্তর্নিগূঢ় অদৃশ্য অগ্নিই) শাখাগুলা'র ঝুটোপুটি'র উপদ্রবে উত্ত্যক্ত হইয়া হেথা হোথা সেথা ছিন্নছিন্নভাবে ফুটিয়া বাহির হয়; ক্ষণপরে আবার সেই অগ্নিই প্রচণ্ডবেগে সমস্ত অরণ্যের আপাদমস্তক অধিকার করিয়া আকাশে জয়পাতাকা উড্ডীয়মান করে। আমাদের মধ্যেও অগ্নি আছে, সে অগ্নি আধ্যাত্মিক অগ্নি; তাহার নাম চেতন।

যে-চেতন আমাদের প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় আমাদের ভিতরে কোথায় লুকাইয়া থাকে, তাহা আমরা জানিতেও পারি না, আমাদের স্বপ্নাবস্থায় সেই চেতনই বাসনাবশে ছিন্নছিন্নভাবে ফুটিয়া বাহির হয়; আবার, আমাদের জাগরণকালে সেই চেতনই আমাদের অন্তঃকরণের আপাদমস্তক অধিকার করিয়া মুক্ত চিদাকাশে ঈশনার জয়পাতাকা উড্ডীয়মান করে।

তিন অবস্থার অগ্নি যেমন তিন প্রকার, তিন অবস্থার চেতনও তেম্নি তিনপ্রকার। নিদ্রাবস্থার অব্যক্ত-চেতন কাষ্ঠের অন্তর্নিগূঢ় তাপাগ্নি; স্বপ্নাবস্থার অর্দ্ধস্ফুট-চেতন তপ্তাঙ্গারের গা-ঘ্যাঁসা দাহাগ্নি; জাগরিতাবস্থার সুব্যক্ত চেতন আকাশ-লেলিহ্যমান শিখাগ্নি।

প্রথমাবস্থার অব্যক্ত চেতনের সংক্ষিপ্ত নাম প্রাণ; মাঝের অবস্থার অর্দ্ধস্ফুট-চেতনের সংক্ষিপ্ত নাম মন; তৃতীয় অবস্থার সুব্যক্ত চেতনের সংক্ষিপ্ত নাম জ্ঞান।

প্রাণ অব্যক্তসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ঘুমের ঘোরে বাঁধা-পথে চলে। শাস্ত্রে অব্যক্তসংস্কারের নাম আছে রাশি-রাশি; প্রাক্তনসংস্কার, অদৃষ্ট, নিয়তি, কর্ম্মবিপাকাশয়, এ সব নাম তাহারই নাম; পরন্তু কেহ যদি ঐ সব বিদেশী-সিক্কে ওজনের নামের বোঝা তোমার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিয়া তোমার কাছে পারিতোষিক যাচ্‌ঞা করে, তবে তুমি যে তাহাকে কিরূপ পারিতোষিক প্রদান কর, তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে; অতএব তাহাতে কাজ নাই। "সংস্কার" বলিতে কি বুঝায়, তাহা আমরা সকলেই জানি;—উপস্থিত কার্য্যনির্ব্বাহের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। প্রাণ অব্যক্ত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ঘুমের ঘোরে বাঁধা পথে চলে; মন বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া কল্পনাস্বপ্নের কাল্পনিক সত্তাতে অবগাহন করে; জ্ঞান ঈশনায় ভর করিয়া দাঁড়াইয়া বস্তুসকলের বাস্তবিক সত্তাতে অবগাহন করে, এক কথায়—সত্যে অবগাহন করে।

তিন অবস্থার তিনপ্রকার অগ্নি শুধু যে কেবল একটার পর আরেকটা পরে পরে আবির্ভূত হয়, তাহা নহে, পরন্তু একটার পর আরেকটা পরে-পরে আবির্ভূত হইয়া স্তরে স্তরে উপর্য্যুপরি সন্নিবেশিত হয়। দাবানলের প্রজ্বলিত অবস্থায় অগ্নির মধ্যে তুমি যদি অনুসন্ধান-দৃষ্টি চালনা কর, তবে সর্ব্বোপরি উপরের স্তরে দেখিবে মুক্ত আকাশে উত্থান করিতেছে প্রজ্বলিত

শিখাগ্নি; মাঝের স্তরে দেখিবে কাষ্ঠভক্ষণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতেছে দাহাগ্নি; নীচের স্তরে ঘুমাইয়া রহিয়াছে দেখিবে দগ্ধাবশিষ্ট ভস্মরাশির অন্তর্নিগূঢ় তাপাগ্নি। তেমনি আবার তুমি যদি তোমার জাগরিতাবস্থার সুব্যক্ত চেতনের ভিতরে উঁকি দিয়া দেখ তবে উপরের স্তরে রহিয়াছে দেখিবে জ্ঞানের দিবালোকে দেদীপ্যমান ঈশনার জাগ্রতভাব; মাঝের স্তরে রহিয়াছে দেখিবে অর্দ্ধস্ফুট-চেতনের সান্ধ্যচ্ছায়ায় পরিবৃত বাসনার স্বপ্ন; নীচের স্তরে রহিয়াছে দেখিবে প্রাণের অমানিশায় অবগুণ্ঠিত ঘুমন্ত সংস্কার।

সে কথা যা'ক্! তুমি একটু পূর্ব্বে যাঁহার কথা বলিতেছিলে—তোমার সেই পুরাতন বন্ধু দেবদত্ত কি সরেস লোকই ছিলেন! আজিকের বাজারে তাঁহার মতো সদাশয় লোক সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি আজ বিশবৎসর হইল তোমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া সেই-যে-সেই দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত ঘুণাক্ষরেও তাঁহার কোনো সংবাদ তুমিও পাও নাই আমিও পাই নাই। তুমি তো জানি সহরের মধ্যে একজন সেরা চিত্রকর; তোমার মন থেকে দেবদত্তের একখানি ছবি যদি তুমি আমাকে আঁকিয়া দিতে পার, তবে তোমাকে আমি কত যে ধন্যবাদ দিই, তাহা বলিতে পারি না; কেন না, দেবদত্ত আমারও পরম বন্ধু ছিলেন। তাহা তুমি কিছুতেই পারিয়া উঠিবে না, তাহা জানি; তাহা জানিয়াও, এটা আমি সুনির্ঘাত বলিতে পারি যে, দেবদত্তের দিব্য একখানি ছবি তোমার প্রাণের চোরকুটুরীর ছবির আল্‌মারিতে গুছানো রহিয়াছে; আর, সে যে ছবি তাহা দেবদত্ত বিশবৎসর পূর্ব্বে যেমনটি ছিলেন, তাহারই মতো অবিকল। তারসাক্ষী—এইমাত্র তুমি আমাকে বলিলে যে, গতরাত্রের স্বপ্নে দেবদত্তকে দেখিয়াছ—ঠিক্ সেই বিশ বৎসর পূর্ব্বের দেবদত্ত যেন তোমার সম্মুখে মূর্ত্তিমান্। তোমার নিদ্রিত অবস্থায় ব্যাপারটা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে;—

প্রাণের অব্যক্তসংস্কার মনের বাসনাতে সোয়ার হইয়া কল্পনার রঙ্গভূমিতে দেবদত্তবেশে সাজিয়া বাহির হইয়াছিল তা' বই আর কিছুই না।

এই বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে তুমি যদি জানালার ফাঁক দিয়া হঠাৎ দেখ যে, একটি অর্দ্ধপ্রবীণগোছের পথযাত্রী বৃষ্টির ভয়ে রাস্তার ও-ধারের ঐ ময়রার দোকানটার দ্বারের গোড়ায় দাড়াইয়া বৃষ্টি-ধরিয়া যাওনের অবসর প্রতীক্ষা করিতেছে, তিনি যদি তোমার সেই পুরাতন বন্ধু দেবদত্ত হ'ন তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তোমার মন বলিবে—"ভদ্রলোকটি না জানি কে?" ইহারি নাম জিজ্ঞাসা। তাহার পরে তোমার গতরাত্রের স্বপ্নের প্রফুল্ল যুব. সম্মুখস্থিত বিমর্ষভাবাপন্ন অর্দ্ধপ্রবীন ব্যক্তিটির সহিত মিশিয়া যাইতে চেষ্টা করিবে, আর, সে চেষ্টার প্রথম উদ্যমে তুমি দেবদত্তকে চেন' চেন' করিয়াও চিনিতে না পারিয়া ক্রমাগতই তাঁহার মুখাকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকিবে; ইহারই নাম অনুসন্ধান। তাহার পরে তুমি সেই অর্দ্ধপ্রবীণ ব্যক্তিটির মুখচক্ষুর আকারপ্রকার-ভাবভঙ্গীর ভিতরে কয়েকটি পূর্ব্বপরিচিত অভি-জ্ঞানচিহ্ন খুঁজিয়া পাইয়া আচম্বিতে বলিয়া উঠিবে—"এ কি! দেবদত্ত যে!" ইহারই নাম অনুমান। এই যে তোমার মনোমধ্যে জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধান, এবং অনুমান একটার পর আর একটা পয়ে-পরে আসিয়া স্বস্ব কার্য্যে কোমর বাঁধিয়া বসিয়া গেল – এতো দেখিতেছি একপ্রকার গম্বিবী চাল; যে-ওস্তাদ পিছনে থাকিয়া চাল চালিতেছে তাহাকে তো কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছি না; খুঁজিয়া পাইব কেমন করিয়া? সে যে অব্যক্ত-সংস্কার; অব্যক্তসংস্কার আপনাকে ধরিতে ছুঁইতে দিবার পাত্র নহে; তাহা কেবল ফলেন পরিচীয়তে।

গতরাত্রের স্বপ্নে তোমার মনোমধ্যে জিজ্ঞাসাও ছিল না—অনুসন্ধানও ছিল না। গতরাত্রে শুদ্ধ-কেবল বাসনার মন্ত্রের চোটে অর্দ্ধস্ফুট-চেতনের ঝাপ্‌সা আলোকে দেবদত্তের প্রতিমূর্ত্তি তোমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে দেখা

দিয়াছিল। বাসনা অব্যক্তসংস্কারের একধাপ-উপরের স্তরে নবপ্রসূত পক্ষিশাবকের ন্যায় ক্ষণে উড়িয়া উপরে ওঠে, ক্ষণে নীচে পড়িয়া গিয়া ভূতলে অবলুণ্ঠন করে; তাহা এক দণ্ডও স্থির হইয়া থাকে না, ক্রমাগতই উড়ুউড়ু করে। বাসনা প্রাণঘ্যাঁসা ইচ্ছা বা প্রাণঘ্যাঁসা মন। গতরাত্রের স্বপ্নে তোমার অর্দ্ধস্ফুট-চেতন শুদ্ধ-কেবল বাসনাতে ভর করিয়া সম্মুখবর্ত্তী বিষয়ের কাল্পনিক সত্তায় অবগাহন করিয়াছিল। আজ তুমি জাগরিতবস্থার সুব্যক্ত-চেতনের দিবালোকে সুপ্রত্যক্ষ বিষয়ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা এবং অনুসন্ধান চালনা করিয়া জানিতে পারিলে যে, দেবদত্ত তোমার সম্মুখে বিরাজমান। আজ্‌কে'কার এই যে তোমার জাগ্রতভাবের জিজ্ঞাসা এবং অনুসন্ধান, ইহার ভিতরে ঈশনার হস্ত স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ঈশনা আর কিছু না—জ্ঞানঘ্যাঁসা ইচ্ছা বা জ্ঞানঘ্যাঁসা মন। গতরাত্রে তোমার মনের বাসনার নীচের স্তরে প্রাণের অব্যক্তসংস্কার তলেতলে কার্য্য করিয়াছিল; আজ তোমার জ্ঞানের ঈশনা সর্ব্বোপরি কর্ত্তা হইয়া বিরাজমান আর জ্ঞানের সেই যে ঈশনা তাহার নীচের স্তরে মনের বাসনা এবং তাহারো নীচের স্তরে প্রাণের অব্যক্তসংস্কার তালে-তালে কার্য্য করিয়া তোমার জ্ঞানের আনুমানিক সিদ্ধান্তে বলসঞ্চার করিতেছে। অতএব তিনটি বিষয় সুনিশ্চিত; সে তিনটি বিষয় এই যে. (১) তোমার জাগরিতাবস্থায় —জ্ঞান, মন এবং প্রাণ, তিনই একজোট হইয়া কার্য্য করে; (২) স্বপ্নাবস্থায়, মন এবং প্রাণ একজোট হইয়া কার্য্য করে; (৩) সুষুপ্ত অবস্থায় প্রাণ একাকী কার্য্য করে। যেমন রাজা এবং সেনা একজোট হইয়া যুদ্ধ করিতেছে বলিলেই বুঝায় যে, রাজা. সেনাপতি এবং সেনা, তিনই এক জোট হইয়া যুদ্ধ করিতেছে, তেমান জ্ঞানবান জীবের জাগরিতবস্থায় জ্ঞান এবং প্রাণ একজোট হইয়া কার্য্য করিতেছে বলিলেই বুঝায় যে, জ্ঞান, মন এবং প্রাণ, তিনই একজোট হইয়া কার্য্য করিতেছে। তা ছাড়া, যেমন

রাজা এবং সেনাপতি দুইকে এক সঙ্গে ধরিয়া বলা যাইতে পারে—সৈন্যের অধিনায়ক, তথৈব, সেনা এবং সেনাপতির অধীনস্থ সর্দার দিগকে একসঙ্গে ধরিয়া বলা যাইতে পারে—সেনা; সেইরূপ-ন্যায়ে—স্থলবিশেষে আবশ্যক হইলে জ্ঞান এবং জ্ঞানঘ্যাসা মন দুইকে একসঙ্গে ধরিয়া সংক্ষেপে বলা যাইবে—জ্ঞান; তথৈব, প্রাণ এবং প্রাণঘ্যাসা মন দুইকে একসঙ্গে ধরিয়া বলা যাইবে—প্রাণ। এরূপস্থলে জ্ঞান এবং প্রাণ একজোট হইয়া কার্য্য করিতেছে বলিলেই জ্ঞান এবং প্রাণের মাঝের জায়গায় মনও যে কার্য্য করিতেছে, তাহা আপনা-আপনিই বুঝা যাইবে, আর তাহা হইলেই স্বতন্ত্ররূপে মনের নামোল্লেখ করিবার প্রয়োজন হইবে না। ক্ষেত্র দেখঃ—

সংক্ষিপ্ত নামকরণ।

জ্ঞান	{ ঈশনা	} মন (উহ্য)
প্রাণ	{ বাসনা	}
	প্রাণ	

আপাতত এখানে আমি মাঝের অঞ্চলের মনের ব্যাপারটিকে ঐরূপে উহ্য রাখিয়া বলিতে চাই এই যে, আমাদের জাগরিতাবস্থায়, জ্ঞান এবং প্রাণ কর্ত্তাগৃহিণীর ন্যায় একজোট হইয়া একত্রে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের পরিচালনাকার্য্যে নিযুক্ত থাকে; পরন্তু নিদ্রাবস্থায় জ্ঞানের অনুপস্থিতিকালে প্রাণ একাকী ঐ কার্য্য সুনির্ব্বাহ করে। তোমার এই যে নিশ্বাসপ্রশ্বাস ঘ'ড়ির কলের ন্যায় বাঁধা-নিয়মে অষ্টপ্রহর চলিতেছে—তাহা চালাইতেছে কে? তোমার প্রাণেরই তাহা কাজ, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। এটাও

কিন্তু দেখিতেছি যে, তোমার প্রাণের সে যাহা কাজ, তাহার উপরে তোমার জ্ঞানের বিলক্ষণ কর্তৃত্ব চলে ; দেখিতেছি যে, তুমি সজ্ঞানভাবে নিশ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করিতেও পারো, কমাইতে-বাড়াইতেও পারো, ইচ্ছা-মাত্রেই। এইজন্যই আমি বলিতেছি যে, যেমন কর্ত্তাগৃহিণী উভয়ে এক-জোট হইয়া ঘরসংসার চালা'ন, তেম্নি জ্ঞান এবং প্রাণ উভয়ে একজোট হইয়া তোমায় চালাইতেছে। আবার এটাও দেখিতেছি যে, কার্য্যপ্রণালী দোঁহার দুইরূপ। যেমন—বাঁধানিয়মে ছোট-ছোট ছেলেদের মানুষ করিয়া তোলা গৃহিণীরই কাজ, তা বই, কর্ত্তা সে কার্য্যে নিতান্তই অপটু; তেমনি বাধানিয়মে অষ্টপ্রহর নিশ্বাসপ্রশ্বাস পরিচালনা করা প্রাণেরই কাজ ; তা বই, জ্ঞান তাহাতে নিতান্তই অপটু। পক্ষান্তরে, যেমন—ছেলেদের শিক্ষার জন্য নূতন কোনোপ্রকার বৈজ্ঞানিকনিয়ম প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে কর্ত্তাই তাহা পারেন, তা বই, গৃহিণী তাহাতে অপটু, তেম্নি নিশ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করিয়া কুম্ভক করিতে হইলে, অথবা নিশ্বাসপ্রশ্বাস কমাইয়া-বাড়াইয়া রেচকপূরক করিতে হইলে জ্ঞানই তাহা পারে, তা বই প্রাণ তাহাতে নিতান্তই অপটু। কিন্তু জ্ঞান যতই কেন প্রাণের উপরে কর্তৃত্ব করুক্ না, প্রাণকে সে চটাইয়া প্রাণের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্রভাবে কোনো কার্য্যই করিতে পারে না। প্রাণায়াম সাধন করিবার সময় জ্ঞান ধীরে ধীরে প্রাণকে বশ করিয়া আপনার অভিপ্রেত পথে বাগাইয়া আনে, তা বই, প্রাণকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যও করে না, আর, প্রাণের উপরে যথেচ্ছ বলপ্রকাশও করে না। জ্ঞান সবসময়েই প্রাণের সহিত সদ্ভাবে মিলিয়া কার্য্য করে,—প্রাণের সহিত আড়াআড়ি করিয়া কোনো কার্য্যই করে না। জ্ঞান যখন ঈশনা খাটাইয়া প্রাণায়াম সাধন করে তখন প্রাণ জ্ঞানকে আপনার বাঁধা-পথের বেশী বাহিরে যাইতে দেয় না। প্রাণ যেমন কতকমাত্রা জ্ঞানের অভিপ্রায়ের সঙ্গে গোড় দিয়া চলে, আর, উভয়ের সেরূপে চলিবার কারণ শুদ্ধ-কেবল

পরস্পরের প্রতি মনের ভালবাসা ; কেননা মন জ্ঞানপ্রাণের মধ্যস্থস্বরূপ। জ্ঞান এবং প্রাণের মধ্যে কোনো সূত্রে দাম্পত্যকলহ বাধিলে মন মাঝে পড়িয়া বিবাদ মিটাইয়া দিতে চেষ্টা করে। ফলে, জ্ঞান এবং প্রাণের মধ্যে কলহ যাহা সময়ে-সময়ে বাধিতে দেখা যায়, তাহা হরগৌরীর কোন্দল বই আর কিছুই নহে। জ্ঞানবান্ জীবের জাগরিতাবস্থায় জ্ঞান এবং প্রাণ উভয়ে একজোট হইয়া ঘরসংসার করে—এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু নিদ্রাবস্থায় কি হয়, সেটাও দেখা চাই। সুব্যক্তচেতন যখন শ্রমক্রমে অবসন্ন হইয়া ঈশনা গুটাইয়া লইয়া অব্যক্ত হইতে ইচ্ছা করে, তখন সে প্রাণের হস্তে চাবির গোছা ফেলিয়া-দিয়া দিব্য আরামে নিদ্রা যায়। জ্ঞান যখন নিদ্রায় ঝাঁপ দিতে উদ্যত হয়, তখন মন জ্ঞানকে বলিতে পারে, যে, "তুমি হ'চ্চ ঘরের কর্ত্তা ; ঘরের কর্ত্তা ঘরে না থাকিলে ঘরের দশা হইবে কি ?" তা যদি বল, তবে জ্ঞান তাহার উত্তর দিবে এই যে, "কোনো চিন্তা নাই—ঘরে প্রাণ রহিলেন ; আমার থাকাও যা, আর, প্রাণের থাকাও তা, একই. গৃহিণী গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তুমি কি তা জানো না!" প্রাণের প্রতি জ্ঞানের কি অগাধ বিশ্বাস! এম্নি অগাধ বিশ্বাস যে, তুমি যদি বলো "প্রাণ অচেতন". তবে জ্ঞান তোমার সে কথায় কখনই সায় দিবে না ; জ্ঞান বলিবে যে, "প্রাণ আমার দ্বিতীয় আপ্নি—প্রাণকে অচেতন বলাও যা, আর আমাকে অচেতন বলাও তা', একই।" প্রকৃত কথা এই যে, প্রাণ অচেতন নহে ; প্রাণ অব্যক্ত-চেতন! চেতনের অব্যক্ত অবস্থার নামই নিদ্রাবস্থা ; অব্যক্ত-চেতনের নামই নিদ্রা, আর তাহারই আরেক নাম প্রাণ। নিদ্রা প্রাণই! ইংলণ্ডের ডুবুরী কবি কি বলিতেছেন, শ্রবণ কর:—

" * * * The innocent sleep,
Sleep that knits up the ravelled sleeve of care,
Death of each day's life, sore labour's bath,

Balm of hurt minds, great nature's second course,
Chief nourisher in life's feast.

নির্দ্দোষ নিদ্রা! ভারোদ্বিগ্ন কর্ম্মধন্দা'র গলিতস্খলিত বাহুচ্ছদ* সে নূতন করিয়া গাঁথিয়া তোলে! দৈনিক জীবনের দৈনিক মৃত্যু! শ্রমপীড়া'র শান্তিবারি! ব্যথিত চিত্তের ধন্বন্তরি! মহাপ্রকৃতির দ্বিতীয় গতিপর্য্যায়! জীবনের ভোগোৎসবের বলপুষ্টিপ্রদায়িনী সেরা-ভোগের সামগ্রী!"

শুনিলে কবিবাক্য! নিদ্রা দৈনিক মৃত্যু বটে, কিন্তু মৃত্যু সে সাক্ষাৎ প্রাণ! পূর্ণিমা-রজনী যেমন জ্যোৎস্নার গুণে জ্যোৎস্নাময়ী, অব্যক্তচেতনা নিদ্রা তেমনি প্রাণের গুণে প্রাণময়ী।

চেতনের ব্যক্তাব্যক্তরহস্য যাহা আমরা আমাদের আপনাদের মধ্যে দেখিতে পাই, তাহাই আমি এতক্ষণ ধরিয়া বিবৃত করিলাম।

আমরা দেখিলাম যে, আমাদের আপনাদের ভিতরে যে চেতন আছে, তাহা বস্তু একই; সেই একই চেতন যখন আপনার অব্যক্ত অবস্থায় সংস্কারভাবাপন্ন হইয়া ঘুমের ঘোরে বাঁধা-নিয়মে বাঁধা পথে চলিতে থাকে, তখন তাহার নাম হয় প্রাণ; তাহা যখন আপনার অর্দ্ধস্ফুট অবস্থায় বাসনায় ভর করিয়া কল্পনা-স্বপ্নের কাল্পনিক সত্তায় অবগাহন করে, তখন হয় মন; আবার, যখন তাহা আপনার সুব্যক্ত অবস্থায় ঈশনাতে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া বস্তুসকলের বাস্তবিক সত্তায় অবগাহন করে, তখন তাহার নাম হয় জ্ঞান।

---

* জামার আস্তিন। know এবং জ্ঞ (gan) যেমন একেরই সন্তান, knit এবং গাঁথা (=গ্রন্থন এ) দুই শব্দেরও বোধ হয় তেমনি এককুলে জন্ম। আস্তিন গাঁথিয়া তোলা, আর, আস্তিন সেলাই করিয়া তোলা, এ দুই কথার ভাবার্থ একই। কিন্তু মোজা প্রভৃতি যেরূপে তৈয়ারি করা হয়, তাহা এক প্রকার গ্রন্থন ক্রিয়া—সীবন-ক্রিয়া নহে (সেলাই নহে)। গেঞ্জিফ্রাকের আস্তিনও সেইভাবে গাঁথিয়া তোলা হয়।

এটাও দেখিলাম যে, জ্ঞানের সুব্যক্ত অবস্থার নামই জাগরিতাবস্থা; জ্ঞানের অর্দ্ধস্ফুট অবস্থার নামই স্বপ্নাবস্থা; জ্ঞানের অব্যক্ত অবস্থার নামই নিদ্রাবস্থা। চাহিয়া দেখ :—

চেতন	নাম	অবস্থা
সুব্যক্ত	জ্ঞান	জাগরণ
অর্দ্ধব্যক্ত	মন	স্বপ্ন
অব্যক্ত	প্রাণ	সুষুপ্তি

আর একটি রহস্য দেখিলাম এই যে, চেতনের সুব্যক্ত অবস্থায় (অর্থাৎ জ্ঞানবান্ জীবের জাগরিতাবস্থায়) তিন অবস্থার চেতনই একত্রে কার্য্য করে, উপরের স্তরে জ্ঞান কার্য্য করে, মাঝের স্তরে মন কার্য্য করে, নীচের স্তরে প্রাণ কার্য্য করে, সবাই একজোট হইয়া কার্য্য করে, কেহই স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করে না। তবেই হইতেছে যে, আমাদের জাগরিতবস্থার মধ্যেও সুষুপ্তি, স্বপ্ন এবং জাগরণ, তিনই রহিয়াছে; প্রাণাধিষ্ঠিত অব্যক্ত-সংস্কারের সুষুপ্তভাব রহিয়াছে; মনোধিষ্ঠিত বাসনার স্বপ্ন রহিয়াছে; জ্ঞানাধিষ্ঠিত ঈশনার জাগ্রতভাব রহিয়াছে।

ব্যক্তাব্যক্তরহস্য এ যাহা দেখা গেল, ইহার সঙ্গে আরেকটি রহস্য জড়ানো রহিয়াছে; সেটা হ'চেচ ত্রিগুণ রহস্য; এ রহস্যটিরও অন্ধিসন্ধি ভেদ করা আবশ্যক।

ত্রিগুণরহস্য।

পৃথিবীর দুই প্রদেশে দুই তত্ত্ব বিজ্ঞানের চূড়াস্থানীয় মহাতত্ত্ব বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ; পাশ্চাত্যপ্রদেশে মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব এবং প্রাচ্যপ্রদেশে ত্রিগুণতত্ত্ব। দোঁহার মধ্যে প্রামাণিক বলবত্তার কিরূপ ইতর বিশেষ, তাহা জানিতে পারা কঠিন নহে। একের গোটাদুই ললাটচিহ্নের সহিত অপরের গোটা-দুই ললাটচিহ্ন জোঁকা দিয়া মিলাইয়া দেখিলেই তাহা জিজ্ঞাসু ব্যক্তির জ্ঞানে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। অতএব দেখা যা'ক্।

মাধ্যাকর্ষণের বলবত্তা স্থূলভূতের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ। স্থূলভূতের গণ্ডির এক-পা বাহিরে যেখানে ঈথরসমুদ্র সূর্য্যচন্দ্রতারকার করাঘাতে মৃদঙ্গধ্বনীর ন্যায় তালে-তালে তরঙ্গিত হইতেছে, সেখানে (অর্থাৎ সূক্ষ্ম-ভূতের অধিকারক্ষেত্রে) মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব হালে পানি পায় না। পক্ষান্তরে, ত্রিগুণতত্ত্বের বলবত্তা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আপাদমস্তক এবং অন্তরবাহির জুড়িয়া সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান। আবার, কাঙালের কথা যেমন বাসী হইলেই ফলে, মনোন্মত্ত ব্যক্তির কথা তেমনি বাসী হইলেই কাঁচিয়া যায়। কোন্ দিন কোন্ আবিষ্কর্ত্তা মাধ্যাকর্ষণের পুরাতন মত উল্টাইয়া-দিয়া কোন্ অশ্রুতপূর্ব্ব নূতন মত বাহির করিবেন—তাহা কেহই জানে না; তখন হয় তো রাজ্য-শুদ্ধ* সবা'রই মুখ হইতে এরূপ এক নূতন বুলি বাহির হইতে থাকিবে যে, মাধ্যাকর্ষণ এক প্রকার চুম্বক আকর্ষণ, অথবা তাহা একপ্রকার তৈজস-ব্যাপার বা বৈদ্যুতিক-ব্যাপার বা ঐথরিক-ব্যাপার। পক্ষান্তরে, ত্রিগুণতত্ত্ব যদি উল্টাইবার হইত, তবে এতদিনে উল্টাইয়া গিয়া মৃত্তিকাগর্ভে বিলীন

* সংস্কৃত 'সার্দ্ধং' হইতে প্রাকৃত 'সুদ্ধ' জন্মলাভ করিয়াছে। "সার্দ্ধং" কিনা সহিত। "সর্ব্বসুদ্ধ" কিনা সর্ব্বসমেত। "শুদ্ধ-কেবল" বা "শুধু-কেবল"—এ শুদ্ধের শ তালব্য শ; এ-শুদ্ধের অর্থ বিশুদ্ধ বা অমিশ্র, ওসুদ্ধের অর্থ সমেত বা সহিত; প্রভেদদ্রষ্টব্য

হইয়া যাইত। তাহা হইতে পারে না এইজন্য—যেহেতু ত্রিগুণতত্ত্বের উপদেষ্ট্রী প্রকৃতিমাতা স্বয়ং; চন্দ্রসূর্য্য যতদিন না উল্টায়, ততদিন তাহা উল্টাইবে না—সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিও। মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব দুই নৌকায় পা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে—এক নৌকা পরীক্ষা, আর নৌকা কল্পনা। পক্ষান্তরে ত্রিগুণতত্ত্বের মধ্যে কোনোপ্রকার কল্পনার গোঁজামিলন নাই—কৃত্রিম কারীকুরি নাই; তাহা ঝর্‌ঝরে পরিষ্কার সাঁচ্চা সামগ্রী। ত্রিগুণতত্ত্বের ভিতরের খপর যাঁহারা জানেন না, তাঁহাদের চক্ষে তাহা কল্পনার স্বপ্ন বই আর কিছুই না। যাঁহাদের চক্ষে আপাতদর্শিতার ঘুমের ঘোর অষ্টপ্রহর লাগিয়া আছে, তাঁহাদের চক্ষে তাহা স্বপ্ন তো বটেই; কিন্তু আমি দেখাইব যে, অপরের পক্ষে তাহার ঠিক্ বিপরীত; দেখাইব যে, জাগ্রত জ্ঞানের চক্ষে তাহার একটা কড়াক্কড় নিক্তির ওজনের প্রামাণিক তত্ত্ব—খাঁটি বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব। অতএব প্রণিধান কর—

আমাদের দেশের একটী প্রাচীন বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধার সহিত মনোনিবেশ করিয়া তোমাকে আমি দেখিতে বলিতেছি এই যে, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সত্ত্ব, রজো এবং তমো §, এই তিন গুণের ক্রীড়াক্ষেত্র।

---

‡ বিষদাঁত ভাঙা সর্পের যেমন ফোঁস্-কাষ্য শোভা পায় না, বঙ্গভাষায় তেম্নি শব্দের অন্তস্থিত বিসর্গের উচ্চারণ শোভা পায় না। এ কথাটি পণ্ডিতেরা বোঝেন না যদি-চ কিন্তু আর সবাই বোঝে। কোনো দরিদ্রসন্তান যদি রাজার কৃপায় সহসা ধন-ঐশ্বর্য্যে স্ফীত হইয়া-উঠিয়া ধরাকে সরা-জ্ঞান করিতে থাকে, তবে লোক বলে "উঁহার তমো হইয়াছে।" বাল্যকালে আমি একজন অর্দ্ধকথকের মুখে শুনিয়াছিলাম "অশ্বত্থামা হতো গজো।" আসল সংস্কৃত হ'চ্চে "অশ্বত্থামা হতঃ—ইতি গজঃ"; আর, আসল উচ্চারণ হ'চ্চে "অশ্বত্থামা হতহ্—ইতিগজহ্।" "হত" অপেক্ষা হতো হতহ্ শব্দের সহিত বেশী মিল খায়, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। এরূপস্থলে পণ্ডিতানুমোদিত প্রথা অপেক্ষা লোকানুমোদিত প্রথা বেশী শুদ্ধ। আমি অশুদ্ধ পাণ্ডিত প্রথা অপেক্ষা বিশুদ্ধ লৌকিক-প্রথা বেশী পছন্দ করি, তাই বলিবার সময় বলি এবং লিখিবার সময় লিখি তমো, নভো, সরো ইত্যাদি।

প্রশ্ন। সত্ত্বগুণের সত্ত্ব শব্দটা গুণের কোটায় উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে, তাহা তো দেখিতেছি; কিন্তু কোথা হইতে যে তাহা আসিল তাহার বাষ্পও আমি বুদ্ধিতে হাৎড়াইয়া পাইতেছি না।

উত্তর। সত্ত্ব-শব্দ কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহা চক্ষু মেলিয়া দেখিলেই তো পারো; তবে কেন চক্ষু বুজিয়া এদিক্-ওদিক্ হাৎড়াইয়া বেড়াও? সত্ত্বশব্দ কোথা হইতে আসিয়াছে—তাহা তো আর তোমার অবিদিত নাই! মানুষের যেমন মনুষ্যত্ব, সতের তেমনি সত্ত্ব। এমন যদি কোনো গুণ থাকে যাহার বিদ্যমানতার বলেই মনুষ্য মনুষ্য, আর যাহার অবিদ্যমানে মনুষ্য মনুষ্য হইয়াও মনুষ্য নহে, তবে তাহারই নাম যে মনুষ্যত্ব—এটা অবশ্য তুমি জানো; এটাও তেমনি তোমার জানা উচিত যে, এমন যদি কোনো গুণ থাকে, যাহার বিদ্যমানতা'র বলেই সৎ সৎ, এবং যাহার অবিদ্যমানে সৎ সৎ হইয়াও সৎ নহে, তবে তাহারই নাম সত্ত্বগুণ। সৎ যদি মূলেই প্রকাশ না পা'ন; না তাঁহার আপনার নিকটে, না অন্যের নিকটে; কাহারো নিকটে, কস্মিন্‌কালেও যদি তাঁহার প্রকাশের সম্ভাবনা না থাকে, তবে তিনি থাকিয়াও নাই। সৎশব্দের মূলধাতু অস্‌ধাতু, অস্‌ধাতুর অর্থ থাকা; যিনি আছেন, তিনিই সৎ; আর, তিনিই সৎরূপে প্রকাশ পান; তিনি যদি মূলেই প্রকাশ না পা'ন তবে তিনি থাকিয়াও নাই—সৎ হইয়াও সৎ নহেন। তবেই হইতেছে যে, প্রকাশই সেই গুণ, যাহার বিদ্যমানতার বলে সৎ সৎ এবং যাহার অবিদ্যমানে সৎ সৎ হইয়াও সৎ নহেন। অতএব এটা স্থির যে সতের প্রকাশই সতের সত্ত্ব, প্রকাশগুণই সত্ত্বগুণ। শাস্ত্রে বলে তাই। সব শাস্ত্রই একবাক্যে বলে যে, প্রকাশই সত্ত্বগুণের বৈশেষিক পরিচয়লক্ষণ।

এই সঙ্গে আর-দুইটি কথা দ্রষ্টব্য;

প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, নৈশ অন্ধকারের প্রতিযোগে যেমন দীপালোক

পরিস্ফুট হয়, অপ্রকাশের প্রতিযোগে তেম্নি প্রকাশ পরিস্ফুট হয়; আবার রাত্রিকালের শয়নঘরের প্রদীপ নিভিয়া যাইবার সময় বিগত আলোকের প্রতিযোগে যেমন আগত অন্ধকার পরিস্ফুট হয়, তেম্নি প্রকাশের প্রতিযোগে অপ্রকাশও প্রকাশ পাইয়া উঠে। ঘনঘটাচ্ছন্ন দ্বিপ্রহর নিশীথে যেমন বিদ্যুৎস্ফুরণের সঙ্গে-সঙ্গে আলোক এবং অন্ধকার দোঁহে দোঁহার প্রতিযোগে অভিব্যক্ত হয়, আর সেই সময়ে যেমন ভেকধ্বনির উত্থান-পতনের সঙ্গে-সঙ্গে ধ্বনি এবং নিস্তব্ধতা দোঁহে দোঁহার প্রতিযোগে অভিব্যক্ত হয়, তেম্নি, প্রকাশ এবং অপ্রকাশ দোঁহে দোঁহার প্রতিযোগে অভিব্যক্ত হয়। পৃথিবীর যেমন একপিঠে আলোক, আর একপিঠে অপ্রকাশ; তা বই, ন্যূনাধিক অপ্রকাশের একেবারেই সম্পর্কশূন্য শুধু-প্রকাশ—অমিশ্রপ্রকাশ—অসম্ভব। তোমার নয়ন-মন যদি জন্মাবধি একাল পর্য্যন্ত নিদ্রা, তন্দ্রা, পলকপাত, আলস্য এবং অবসাদ কাহাকে বলে, তাহা না জানিত; তোমার চক্ষু যদি মীনচক্ষু'র ন্যায় চিরোন্মীলিত হইত, আর সেই সঙ্গে তোমার মন যদি রাজদ্বারের সিপাহীর ন্যায় অনবরত তোমার চক্ষুর দেউড়িতে দাঁড়াইয়া অপ্রমত্তভাবে পাহারা দিত; আর, যদি তোমার সেই চিরাবহিত নয়নের সম্মুখে জলস্থল-আকাশ অন্তরীক্ষ হইতে তথৈব স্থাবর-জঙ্গম, নির্জীব-সজীব, চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং বসনভূষণ হইতে ক্রমাগতই হ্রাসবৃদ্ধিবিহীন, ছায়া-বিহীন, বৈচিত্রবিহীন একরঙা আলোক বাহির হইত, তাহা হইলে তোমার এখন-কার এ অবস্থায় তুমি এই যে বলিতেছ—

"যেমন চোক তেম্নি আলো
জুড়ি মিলিয়াছে ভালো!"

তাহা তো তুমি বলিবেই; কিন্তু তোমার তখনকার সে অবস্থায় তুমি দেখতে যে কিরূপ দৃশ্য—সেইটিই জিজ্ঞাস্য। অন্ধের নিকটে যেন দিবা-

রাত্রি দুইই সমান, তোমার সে অবস্থায় তোমার নিকটে তেম্নি আলোক অন্ধকার দুইই সমান হইত। কোনো পাগল যদি চুনকাম-করা ধব্‌ধবে প্রাচারের গায়ে শাদা খড়ি দিয়া বাড়ীর নম্বর দাগে, তাহা হইলে যেমন শাদায় শাদা ডুবিয়া মরে, তেম্নি তোমার সে-অবস্থার চক্ষের সাম্‌নে আলোয় আলো ডুবিয়া মরিত—আলোকের কণামাত্রও তোমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ভোগে আসিত না। তাহা হইলে ফলে দাঁড়াইত এই যে, তুমি চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, আর জগৎসংসার আলোকের মাঝখানে থাকিয়াও অন্ধকার। অতএব এটা স্থির যে, প্রকাশের সঙ্গে কোনো-না কোনো অংশে অপ্রকাশের অঞ্জন বা বিপ্রকাশের রঞ্জন লাগিয়া থাকা চাই-ই চাই, তা নহিলে প্রকাশের প্রকাশত্ব রক্ষা পাইতে পারে না।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, বিহিত প্রকরণ-পদ্ধতির সোপান না মাড়াইয়া কোনো বিষয়ই অপ্রকাশ হইতে প্রকাশে সমুত্থান করিতে পারে না। তুমি যদি কিলাইয়া কাঁঠাল পাকাইতে যাও, তবে কিছুতেই তাহা পারিয়া উঠিবে না। কিরূপ প্রক্রিয়ার যোগ সাযোগে কাঁঠাল পাকাইতে হয়—কাঁঠালগাছই তাহা জানে, আর সেইজন্য তাহারই তাহা কাজ। সব গুণই যেমন ক্রিয়া'র ফল (সংক্ষেপে—কর্ম্মফল), প্রকাশ এবং অপ্রকাশ গুণও তাই। যাহা প্রকাশ হয়, তাহা ক্রিয়াযোগেই প্রকাশ হয়; যাহা অপ্রকাশ হয়, তাহা কর্ম্মোদ্যম গুটাইয়াই অপ্রকাশ হয়। প্রকাশিতব্য বিষয়ের আপাদমস্তক সব'টাই যদি এক উদ্যমেই প্রকাশ পাইয়া চোকে, তাহা হইলে অপ্রকাশ একা'ই যে কেবল ঘুচিয়া যায় তাহা নহে, অপ্রকাশের প্রতিযোগতার অভাবে প্রকাশের প্রকাশত্বও সেই সঙ্গে ঘুচিয়া যায়। ঘোড়সোয়ার যদি ঘোড়া'র রাস একেবারেই ছাড়িয়া দ্যায়, তবে ঘোড়া উচ্ছৃঙ্খলবেগে ছুটিতে আরম্ভ করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া ফেলিয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে; আবার ঘোড়সোয়ার যদি মাত্রাতীত বলের

সহিত রাশ টানিয়া ধরিয়া থাকে তাহা হইলে ঘোড়া চলৎশক্তিরহিত হইয়া যায়। এই জন্য ঘোড়সোয়ার পরিমাণসঙ্গত বলের সহিত রাশ টানিয়া-ধরিয়া উদ্যমের পিছনে সংযমের এবং সংযমের পিছনে উদ্যমের তার লাগাইতে থাকে; আর সেইরূপ যথাসঙ্গত উদ্যম এবং সংযমের পর্য্যাবর্ত্তনের প্রভাবে ঘোড়া ঠিক্‌পথে চলিতে থাকে। এইরূপ লাগ্‌মাফিক পর্য্যায়ক্রমে উদ্যম এবং সংযম খাটাইয়া প্রকাশকে অপ্রকাশের ব্যাড়া দিয়া নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে বাঁধিয়া রাখা চাই, তবেই প্রকাশের প্রকাশত্ব অকাল-মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। প্রকাশকে যখন যথাবিহিত সীমার মধ্যে আগ্‌লাইয়া-রাখিয়া তাল-মান-লয়-সঙ্গত শোভনভাবে চলিতে দেওয়া হয়, তখন প্রকাশের অভাবের (অর্থাৎ অপ্রকাশের) প্রতিযোগে প্রাকাশের ভাব প্রকাশ পায়; প্রকাশের সদ্‌ভাবের প্রতিযোগে প্রকাশের অভাব প্রকাশ পায়; আর, প্রকাশের ভাব এবং অভাব দুয়েতেই ক্রিয়াশক্তির প্রভাব প্রকাশ পায়;—প্রকাশের আবির্ভাবে ক্রিয়াশক্তির উদ্যম প্রকাশ পায়। আবির্ভাব-তিরোভাব ভাবাভাবেরই ওলোট্‌-পালট্‌; অভাব হইতে ভাবে উত্থান করার নাম আবির্ভাব; ভাব হইতে নাবিয়া-পড়িয়া অভাবে পরিসমাপ্ত হওয়ার নাম তিরোভাব। এই প্রসঙ্গে একটি উদ্ভট শ্লোক উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না; শ্লোকটি অতি চমৎকার; তাহা এই—

"মণিনা বলয়ং বলয়েন মণির্মণিনা বলয়েন বিভাতি করঃ।
পয়সা কমলং কমলেন পয়ঃ পয়সা কমলেন বিভাতি সরঃ॥
শশিনা চ নিশা নিশয়া চ শশী শশিনা নিশয়া চ বিভাতি নভঃ।
কবিনা চ বিভুর্বিভুনা চ কবিঃ কবিনা বিভুনা চ বিভাতি সভা॥

বলয়ে শোভয়ে মণি মণিতে বলয়।
বলয়ে মণিতে শোভে করকিশলয়॥
কমলে সলিল শোভে সলিলে কমল।

কমলে সলিলে শোভে সরো নিরমল ॥
সুধাকরে শোভে রাতি. রাত্রে সুধাকর।
নিশিতে শশিতে শোভে বিমল অম্বর ॥
নৃপপাশে শোভে কবি, কবিপাশে ভূপ।
কবি-নয়নাথে শোভা শোভে অপরূপ ॥"

শোভার সম্বন্ধে এ যেমন বলিলেন কবি, প্রকাশের সম্বন্ধে তেম্নি বলিতে পারে সত্যের সেবক—

ভাবে ভায় অভাব, অভাবে ভায় ভাব।
সর্ব্ব ভাবাভাবে ভায় সত্যের প্রভাব ॥

কিন্তু তুমি ডাক্তারমানুষ; তুমি কবিতা চাও না—তুমি চাও হাড়মাস-কাটা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ; বেশ্! আমার পাথেয়-সম্বলের বগ্‌লিত পথ-চল্‌তি গোচের বৈজ্ঞানিক প্রমাণও কতক-কতক সংগ্রহ করা আছে; তাহা দেখাইতেছি, প্রণিধান কর—

সমুদ্রের তরঙ্গ মাথা উঁচু করিয়া তটভূমিতে ঢু হানে, ঢু হানিয়াই অবনতমস্তকে পাছু হটে। ঢু প্রহারের সংরম্ভ-কালে গর্জ্জনধ্বনি উত্থিত হয়; ঢু প্রহারের বিরামকালে গর্জ্জনধ্বনি থামিয়া যায়; ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, একা কেবল গর্জ্জনধ্বনিও নহে—পরন্তু গর্জ্জনধ্বনিও যেমন, গর্জ্জনধ্বনির বিরামও তেম্নি, দুইই একজোট হইয়া পালাক্রমে মুহুর্মুহু কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, আর সেই গর্জ্জনধ্বনির ভাবাভাবের সমবেত কার্য্যকারিতায় গর্জ্জনধ্বনির অবিরত ধারা শ্রোতার শ্রবণগোচরে প্রকাশ পাইতে থাকে। বিজ্ঞানের এটা একটা ধ্রুবসিদ্ধান্ত যে, বায়ুর তরঙ্গ শ্রবণপটহে হিল্লোল হানিবার সময় ঠিক্ যেন সমুদ্রের তরঙ্গ ঢু হানিতেছে, আর ঢু হানিয়াই পাছু হঠিতেছে—এইভাবে একবার এগোয় এবং একবার পিছোয়; ইহাতেই স্পষ্ট বুঝিতে

পারা যাইতেছে যে, ধ্বনির প্রকাশ ধ্বনির ভাবাভাবের (অর্থাৎ হওয়া-যাওয়ার) মুহুর্মুহু পর্য্যাবর্ত্তনের উপরে (অর্থাৎ ওলোট্‌পালটের উপরে) ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। আলোকের প্রকাশও যে, ঐরূপ ভাবাভাবরূপী দুই নৌকায় ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ এই যে, বায়ুতরঙ্গের এগোনা পিছোনো'র ন্যায় ঈথরতরঙ্গের উত্থানপতনও ক্রিয়াশক্তির উদ্যম-সংযমের ওলোট্‌পালোট্। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, প্রকাশগুণের সঙ্গে আর-দুইটি গুণ অপরিহার্য্যরূপে জড়িত রহিয়াছে; একটি হ'চ্চে অপ্রকাশ অর্থাৎ প্রকাশের প্রতিবন্ধকরূপী জড়তাগুণ, * এবং আর-একটি হচ্চে শক্তির প্রভাব অর্থাৎ প্রকাশের সোপানরূপী ক্রিয়াগুণ। এই যে তিনগুণ, প্রকাশ, ক্রিয়া এবং জড়তা, ইহাই পাতঞ্জলের যোগ- শাস্ত্রে সত্ত্বরজস্তমোগুণ নামে সংজ্ঞিত হইয়াছে (সাধনপাদ ১৮শ সূত্র দেখ)।

এতক্ষণ ধরিয়া যাহা পর্য্যালোচনা করা গেল, তাহাতে এটা বেশ্ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, প্রকাশমাত্রই শাদা-কালো জুড়ি হাঁকাইয়া মনোদ্বারে উপনীত হয়; আর, সেই সময়ে সারথি একহাতে রাশ বাগাইয়া ধরিয়া থাকে এবং আর-এক হাতে চাবুক মুঠাইয়া-ধরিয়া তাহা মৃদুমন্দভাবে তালে-তালে হেলাইতে থাকে। জুড়িঘোড়া হ'চ্চে প্রকাশের ভাবাভাব, আর সারথি হ'চ্চে শক্তির প্রভাব; চাবুক এবং রাশ আর কিছু না—ক্রিয়ার উদ্যম এবং সংযম। মোট কথা এখানে যাহা দ্রষ্টব্য, তাহা এই যে, নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সত্ত্ব, রজো এবং তমোগুণের অর্থাৎ প্রকাশ, ক্রিয়া এবং জড়তা'র (inertia'র) যোগাযোগের ব্যাপার; আর, সেই সঙ্গে এটাও দ্রষ্টব্য যে,

* সংখ্যের মতে কার্য্য এবং কারণের মধ্যে বস্তুত কোনো প্রভেদ নাই; এইজন্য সাংখ্য-পাতঞ্জলের দৃষ্টিতে, অপ্রকাশরূপী অন্ধকার, এবং প্রকাশের প্রতিবন্ধকরূপী জড়তা যাহা সেই অপ্রকাশের কারণ, এ দুয়ের একটাও যা আর-একটাও তা, একই; অপ্রকাশও যা, জড়তাও তা, একই।

এক অদ্বিতীয় ধ্রুবসত্যের শক্তির প্রভাব সেই যোগাযোগের প্রবর্ত্তক এবং নিয়ামক। একই অদ্বিতীয় সত্যের শক্তির প্রভাব অনাদি ভূতকাল হইতে প্রত্যেক বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত একই নিয়মে কার্য্য করিয়া আসিতেছে, এবং সেই একই নিয়মে প্রত্যেক বর্ত্তমানকাল হইতে ভবিষ্যতে পদনিক্ষেপ করিয়া চলিতেছে। সেই যে একই নিয়ম, তাহা একই মহাজ্ঞানে স্থির-প্রতিষ্ঠিত, আর, প্রতি বর্ত্তমান হইতে সেই যে ভবিষ্যতে পদনিক্ষেপ, তাহা একই মহাশক্তির নিত্যক্রিয়া। পৌরাণিক ভাষায়—ধ্রুব-জ্ঞানরূপী শিবের বক্ষে বা অটল মহাকালের (Eternity'র) বক্ষে, কালতরঙ্গরূপিণী মহাশক্তি বা কালী নৃত্য করিতেছেন। ফলে, বর্ত্তমানমাত্রই হওয়া হইতে যাওয়াতে এবং যাওয়া হইতে হওয়াতে,—আবির্ভাব হইতে তিরোভাবে এবং তিরোভাব হইতে আবির্ভাবে—ক্রমাগতই ঘুরিয়া বেড়ায়; আর, ঘুরিয়া বেড়ায় বলিয়াই তাহার নাম হইয়াছে বর্ত্তমান। "বর্ত্তমান" কিনা বৃত্তমান্। বর্ত্তন, আবর্ত্তন, আবর্ত্ত (=vortex=বর্ত্তex), বৃত্তি, এ সমস্তই বৃৎধাতুর সন্তান-সন্ততি। বৃৎধাতুর মৌলিক অর্থ একপ্রকার চক্রবর্ত্তন অর্থাৎ চক্রবৎ ঘুরিয়া বেড়ানো, তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। বৃত্তিমাত্রই (ক্রিয়া-মাত্রই) উদ্যম হইতে অবসানে এবং অবসান হইতে উদ্যমে চক্রবৎ ঘুরিয়া বেড়ায়। বর্ত্তমানমাত্রই চল্‌তি-নৌকা! কোনো বর্ত্তমানই নোঙর করিয়া একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া নাই। এক বর্ত্তমান হইয়া যাইতেছে, আর এক বর্ত্তমান হইয়া দাঁড়াইতেছে, তৃতীয় বর্ত্তমান হ'ব-হ'ব করিতেছে। সব-বর্ত্তমানের মধ্যে যিনি এক-বর্ত্তমান তিনিই নিত্য-সত্য। বর্ত্তমানে বর্ত্তমানে যাহা যাহা প্রবর্ত্তিত হইতেছে, সেই নব নব ক্রিয়ার নব নব উদ্যম চিরবর্ত্ত-মান জ্ঞানের নিয়মে নিয়মিত হইতেছে। একই জ্ঞানের নিয়মে এবং একই শক্তির প্রভাবে প্রতি বর্ত্তমান প্রবর্ত্তিত হইতেছে; বর্ত্তমান ক্রিয়ার উদ্যম প্রতিক্ষণে জড়তাশৃঙ্খলদ্বারা বিহিত সীমার মধ্যে বাঁধিয়া রাখা হইতেছে।

ক্রিয়াশক্তি একবার উদ্যম প্রকাশ করিয়া বাধা অতিক্রম করিতেছে, এক বার উদ্যম সম্বরণ করিয়া বাধা'কে আপনার উপরে কার্য্য করিতে দিতেছে। এইরূপে সৎসমুদ্রে ক্রিয়াতরঙ্গের উত্থান-পতন হইতেছে ; আর, সেই ক্রিয়া-তরঙ্গের মস্তকের উপরে উত্থান-পতনের সন্ধিস্থলে প্রকাশরূপী ফেণরাজি উদ্বেল হইতেছে। একই অখণ্ড অনাদ্যন্ত জ্ঞানের সর্ব্বতঃপ্রসারিত বক্ষের উপরে একই মহাশক্তি সত্ত্বরজস্তমোগুণের ত্রিপদীছন্দে নৃত্য করিতেছেন। একদিকে অনাদ্যন্ত অখণ্ড মহাকাল, এবং আর একদিকে অচিন্ত্য আদি হইতে অচিন্ত্য অন্ত পর্য্যন্ত বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের তরঙ্গমালা, এ দুই বৃহৎব্যাপার দুই নহে, পরন্তু একই ; সাঙ্কেতিক ভাষায়—

অনাদ্যন্ত অখণ্ড মহাকাল = অচিন্ত্য আদি··· + মুহূর্ত্ত + মুহূর্ত্ত + ··· অচিন্ত্য অন্ত। দুয়ের অচিন্ত্য ভেদাভেদ্ অস্বীকার করিবারও উপায় নাই, ধারণার মধ্যে আঁকড়াইয়া পাইবারও উপায় নাই। এই অচিন্ত্য ভেদা-ভেদের সঙ্গমতীর্থে যোগী মহাপুরুষেরা আনন্দে ভোর হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া যান।

নদীনালার মৎস্যের পক্ষে অগাধসমুদ্রে সাঁতার খেলিয়া বেড়ানো বেশী-ক্ষণ চলে না ; এইজন্য, সেইরূপ সহজ প্রণালীতে একটি অতি যৎসামান্য ক্ষুদ্র বিষয়ের আদি অন্তমধ্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সত্ত্বরজস্তমোগুণের বিশ্বব্যাপী পর্য্যাবর্ত্তন-প্রণালীর ভাব বুঝিতে চেষ্টা করা যা'ক্।

এটা সকলেরই জানা কথা যে, অতি একটি ক্ষুদ্র বিষয়ও যখন আমা-দের ধারণাতে প্রকাশলাভ করে, তখন তাহা যথাবিহিত প্রকরণপদ্ধতির সোপান মাড়াইয়াই প্রকাশে উত্থান করে, তা বই, হড়ুৎ করিয়া প্রকাশে চড়িয়া বসে না।

প্রশ্ন। তোমার ও-কথাটিতে আমার মন সহসা সায় দিতে পারিতেছে না। একটি প্রত্যক্ষ ঘটনা তোমাকে কবে বলি ; পরের সাক্ষাতে যদি চ

তাহা প্রকাশ করিতে বারণ কিন্তু তুমি তো আর আমার পর নহ—তোমার সাক্ষাতে তাহা বলিতে দোষ নাই। আমার মনে পড়ে—যখন আমাদের কুলগুরু আমার কর্ণে হ্রীংমন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তখন হ্রীংশব্দটি একই অখণ্ড মুহূর্ত্তে আমার শ্রবণগোচরে প্রকাশলাভ করিয়াছিল, তা বই, কোনো-প্রকার প্রকরণপদ্ধতির সোপান মাড়াইয়া তাহা আমার ধারণাতে অধিরূঢ় হয় নাই।

উত্তর। আমাদের দেশের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রে একটি প্রসিদ্ধ ন্যায়ের উল্লেখ মাঝে-মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়: তাহার নাম "উৎপল-শতপত্র-ভেদ ন্যায়।" কথাটা এই;—একশত পদ্মপত্র গায়ে-গায়ে মিশাইয়া লপেটভাবে উপর্য্যুপরি বিছাইয়া-রাখিয়া সেই শতপত্রের গুচ্ছটাকে যদি একটা তীক্ষ্ণ লৌহশলাকা দিয়া এক মুহূর্ত্তে এফোঁড়-ওফোঁড় করিয়া বিঁধিয়া ফালা যায়, তাহা হইলে প্রশ্ন একটি উত্থাপিত হইতে পারে এই যে, ঐ পত্র শতকের মধ্যস্থিত পৃথক্ পৃথক্ এক একটি পত্রের দু ফোঁড় হইয়া যাইতে সময় লাগিয়াছিল কতটুক? এ কথা তুমি বলিতে পারো না যে, তাহাতে একটুও সময় লাগে নাই; অবশ্যই তাহাতে একটু না একটু সময় লাগিয়াছিল; তবে কি না, তাহা এত অল্পসময় যে, তাহা ধারণাতে উপলব্ধ করা তোমারও কর্ম্ম নহে, আমারও কর্ম্ম নহে; কিন্তু সেই ধারণাতীত অল্পসময়টুকুও যে কালাংশ, তাহা যে, একমুহূর্ত্তের শতাংশের একাংশ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ-মাত্র নাই। এখন দেখিতে হইবে এই যে, যেমন ১০০ পত্র=১+১+১+১+ইত্যাদি, তেমি হ্রীং=হ্+র্+ঈ+ং! এই সঙ্গে আরএকটি কথা দ্রষ্টব্য এই যে, দুই হ্রস্ব ই যেমন সান্ধসূত্রে গ্রথিত হইয়া এক দীর্ঘ ঈ হয়, তেমি দুই দ্রুত ই (অর্থাৎ গিট্‌কারি খেলা'বার সময় গায়ক যেরূপ দ্রুত-বেগে ই উচ্চারণ করে সেইরূপ দ্রুতবেগে উচ্চারিত দুই ই) সন্ধিসূত্রে গ্রথিত হইয়া এক হ্রস্ব ই হয়। দ্রুত ই খাটো লেখা যা'ক (ই) এইরূপ

করিয়া। এমতে দাঁড়াইতেছে ঈ = ই + ই + ই্ + ই্ + ই্ + ই্। তবেই হইতেছে যে, হ্রীং = হ্ + র্ + ই্ + ই্ + ই্ + ই্ + ং। হ্রীং-শব্দের ঐ সাতটি অবয়ব (হ্ র্, ই্ ই্, ই্, ই্, ং এই সাতটি অবয়ব) একটারপর আর-একটা তোমার কর্ণকুহরে পরে-পরে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা বুঝি-তেই পারা যাইতেছে। অতএব, তুমি এই যে মনে করিতেছ—হ্রীংশব্দ এক অখণ্ড মুহূর্ত্তে তোমার শ্রবণে প্রকাশলাভ করিয়াছিল, এটা তোমার ভ্রম বই আর কিছুই নহে। ঘটিয়াছিল যাহা, তাহা এই—

মন্ত্রগ্রহণের পূর্ব্বক্ষণে হ্ (অর্থাৎ হসন্ত হ) তোমার শ্রবণগোচরে উপ-স্থিত ছিল না। মন্ত্রোচ্চারণের প্রথম উপক্রমেই হ্ (হসন্ত হ) তোমার শ্রবণগোচরে আবির্ভূত হইল—আবির্ভূত হইয়াই তিরোভূত হইল। তিরো-ভূত তো হইল, কিন্তু তিরোভূত হইয়া—গেল কোথায়? সর্প যেমন সাপুড়িয়ার হস্ত হইতে সরিয়া-পলাইয়া চুব্‌ড়িতে ঢুকিয়া বিশ্রাম লভে, হসন্ত-হ তেমনি ধারণার হস্ত হইতে সরিয়া-পলাইয়া সংস্কার গহ্বরে ঢুকিয়া বিশ্রাম লভিল। এইরূপে হ্রীংশব্দের সাতটি ব্যষ্টি-অবয়ব একে একে আবির্ভূত-তিরোভূত হইয়া সংস্কার গহ্বরে নিলীন হইল; তাহাদের কোনো-টাই স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ লভিতে পারিল না; স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ লভিবে কেমন করিয়া? হ্, র্, ই্, বা, ং স্বতন্ত্ররূপে উচ্চারণ কর দেখি;—সহস্র চেষ্টা করিলেও কিছুতেই তাহা তুমি পারিয়া উঠিবে না। যাহা স্বতন্ত্ররূপে মুখে উচ্চারণই করা যায় না, তাহা স্বতন্ত্ররূপে ধারণাতে প্রকাশ পাইবে কেমন করিয়া? কেমন করিয়া তবে হ্রীংশব্দ ধারণাতে প্রকাশলাভ করিল? ইহার উত্তর এই যে, যেমন করিয়া ছোটো ছেলেরা পাঠ্যশব্দ বানান করিয়া পাঠ করে—তেমনি করিয়া! কালিদাসশব্দ পাঠ করিবার সময় ছেলেরা বলে—"ক'এ আকার কা, ল'এ ইকার লি, দ'এ আকার দা, দন্ত্য স কালিদাস।" পড়ুয়া-বালক যখন বলিতেছে "ল'এ ইকার লি", তখন

"ক'এ আকার কা" তাহার মন হইতে সরিয়া পলাইয়াছে ; যখন বলিতেছে "দ' এ আকার দা", তখন "ক'এ আকার কা, ল'এ ইকার লি" তাহার মন হইতে সরিয়া পলাইয়াছে ; যখন বলিতেছে "দন্ত্য স", তখন "ক'এ আকার কা, ল'এ ইকার লি, দ'এ আকার দা" তাহার মন হইতে সরিয়া পলাইয়াছে। এইরূপে যখন সব ক'টা অক্ষরই সংস্কার-গহ্বরে পলাইয়া বসিয়া রহিল, তখন বালকটি পিছন ফিরিয়া তাহাদিগকে সংস্কারের অন্ধ-কূপ হইতে টানিয়া-তুলিয়া সব-ক'টাকে যোগসূত্রে বাঁধিয়া একচোটে বলিল "কালিদাস।" কখনো-কখনো এমনও ঘটে যে, একটি অন্যমনস্ক ছেলে দন্ত্য স বলিয়াই খেই হারাইয়া-ফেলিয়া "কালিদাস" গড়িয়া তুলিতে পারি-তেছে না। তেমি, গুরু যখন তোমার কাণে মন্ত্র দিতেছিলেন, তখন যদি তোমার মন আর-এক দিকে থাকিত, তাহা হইলে তুমি তাহা শুনিয়াও শুনিতে পাইতে না। সমগ্র কালিদাসশব্দ যেমন করিয়া পড়ুয়া বালকের ধারণাতে অধিরূঢ় হয়, হ্রীংশব্দ ঠিক্ তেমি করিয়া তোমার ধারণাতে অধিরূঢ় হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। হ্রীংশব্দের ব্যষ্টি-অবয়বগুলা তোমার মন হইতে একে একে সরিয়া পলাইয়া তোমার প্রাণের (অর্থাৎ অব্যক্ত চেতনের) যে জায়গাটিতে মাথা গুঁজিয়া লুকাইয়া ছিল, সেই তমো-গুণপ্রধান সংস্কারগহ্বরে সত্ত্বগুণপ্রধান জ্ঞানের আলোক নিপতিত হইবামাত্র ঐ ব্যষ্টি-অবয়বগুলা একযোগে হ্রীংবেশে সাজিয়া বাহির হইয়া তোমার ধারণাতে সোয়ার হইয়া বসিল। সত্ত্বগুণের আলোক রশ্মিকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার কর্ত্তা কে? তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার কর্ত্তা সেই জ্ঞানঘঁ্যাসা মন—ইতিপূর্ব্বে যাহার নাম দেওয়া হইয়াছে ঈশনা। আনুপূর্ব্বিক তিনটি বিষয়ের সন্ধান পাওয়া গেল এইরূপ—

(১) প্রকাশিতব্য বিষয়ের ব্যষ্টি উপাদান গুলি প্রথমে প্রাণের অব্যক্ত-চেতনে তমোগুণের জড়তাশৃঙ্খলে বাঁধা থাকে। এ অবস্থায়, সেই ব্যষ্টি-

উপাদানগুলি অব্যক্ত সংস্কারমাত্র। তা'র সাক্ষী—হ্, ব্, ই, ং এই ব্যষ্টি-উপাদানগুলির কোনোটিও স্বতন্ত্র রূপ মুখে উচ্চারণ করাও যায় না শ্রবণে উপলব্ধি করাও যায় না।

(২) রজোগুণের ক্রিয়াচাপল্যে সেই অব্যক্ত ব্যষ্টি-উপাদানগুলি মনের অর্দ্ধস্ফুটচেতনে একে-একে আবির্ভূত-তিরোভূত হইয়া প্রকাশে উত্থান করিবার জন্য উড়্‌ উড়্‌ করিতে থাকে। তার সাক্ষী—হসন্ত হ (হ্) যখন আবির্ভূত হইয়াই তিরোভূত হইল, তাহা তখন প্রকাশে ওঠো ওঠো করিয়া উঠিতে পারিল না। একা কেবল হ্ না, হ্, ব্, ই্, ই্, ই্, ই্, ং এই সাত ব্যষ্টি-উপাদানের সব-ক'টাই ঐরূপ প্রকাশে ওঠো-ওঠো করিল; কিন্তু উহাদের স্থিরকালের ক্ষণিকত্ব এবং অস্থিরতা-গতিকে উহাদের কোন-টাই প্রকাশে আসন জমাইয়া বসিতে সময় পাইল না! প্রকাশে উঠিবার জন্য এই যে উড়্‌-উড়্‌ক্রিয়া—ইহা রজোগুণপ্রধান প্রাণঘ্যাঁসা মনের বাসনামাত্র।

(৩) রাজোগুণপ্রধান বা ক্রিয়াপ্রধান প্রাণঘ্যাঁসা মনের বাসনা উড়্‌-উড়্‌ করিতে করিতে যখন সত্বগুণের প্রকাশালোকের সংস্পর্শ লাভ করে, তখন তাহা জ্ঞানঘ্যাঁসা ঈশনামূর্ত্তি ধারণ করিয়া ব্যষ্টি-উপাদানগুলিকে সংযোগসূত্রে গাঁথিয়া-কেলিয়া জ্ঞানের সুব্যক্ত-চেতনে উঠাইয়া দ্যায়। তার সাক্ষী, হ্+র্+ই্+ই্+ই্+ই্+ং=হ্রীং। সুব্যক্ত, অর্দ্ধব্যক্ত এবং অব্যক্ত চেতনের সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা দেখানো হইয়াছে, আর, সত্ব রজো এবং তমোগুণের সম্বন্ধে এক্ষণে যাহা দেখানো হইল, তাহাতে এটা বেশ্‌ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সুব্যক্ত-চেতন ক্ষেত্রে সত্বগুণের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব, অর্দ্ধস্ফুট-চেতন ক্ষেত্রে তমোগুণের সবিশেষ প্রদুর্ভাব। ইহার একটি চুম্বক হস্তলিপি এইরূপ—

চেতন-ক্ষেত্র	গুণ	পরিচয়লক্ষণ
সুব্যক্তচেতন—জ্ঞান	সত্ত্ব	প্রকাশ
অর্দ্ধস্ফুটচেতন—মন	রজো	ক্রিয়া
অব্যক্তচেতন—প্রাণ	তমো	জড়তা

সত্ত্বরজস্তমোগুণের সম্বন্ধে তিনটি কথা সবিশেষ দ্রষ্টব্য।

প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, সত্ত্বগুণের প্রকাশ-ক্ষেত্রেও যেমন, রজোগুণের ক্রিয়াক্ষেত্রেও তেম্নি, আর তমোগুণের জড়তাক্ষেত্রেও তেম্নি, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনগুণ একসঙ্গে বাস করে এবং একসঙ্গে কাজ করে; প্রভেদ কেবল এই যে, সত্ত্বগুণের প্রকাশক্ষেত্রে সত্ত্বগুণ অপর দুই গুণকে মাথা তুলিতে না দিয়া আপনি তাহাদের মাথা হইয়া দাঁড়ায়। রজোগুণের ক্রিয়াক্ষেত্রে রজোগুণ অপর দুই গুণকে দাবিয়া রাখিয়া বল প্রকাশ করে তমোগুণের জড়তাক্ষেত্রে তমোগুণ অপর দুই গুণের উপরে প্রভু হইয়া দাঁড়ায়। একসঙ্গে থাকে সবাই সর্ব্বত্র; তবে কিনা, কোথাও বা কেহ সঙ্গি-দোঁহার মাথার উপরে, কোথাও বা কেহ সঙ্গি-দোঁহার মাঝের জায়গায় আসন পাড়িয়া বসিয়া যায়। যেথানে যে গুণ সর্ব্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠান করে, সেথানে সেই গুণেরই নাম কীর্ত্তিত হয়, অপর দুই গুণ গণনার মধ্য হইতে বহিষ্কৃত হয়। এমতে দাঁড়াইতেছে এই যে, সত্ত্বপ্রধান ত্রিগুণই সত্ত্বগুণশব্দের বাচ্য, রজঃপ্রধান ত্রিগুণই রজোগুণশব্দের বাচ্য, তমঃপ্রধান ত্রিগুণই তমোগুণশব্দের বাচ্য। ব্যক্তাব্যক্ত চেতনের সম্বন্ধেও তেম্নি বলা যাইতে পারে যে, মনোবৃত্তিমাত্রেই জ্ঞান, মন এবং প্রাণ, তিনই একসঙ্গে বর্ত্তমান থাকে; প্রভেদ কেবল এই যে, কোথাও বা জ্ঞানের সবিশেষ

প্রাদুর্ভাব, কোথাও বা মনের সবিশেষ প্রদুর্ভাব, কোথাও বা প্রাণের সবিশেষ প্রদুর্ভাব। যেখানে জ্ঞানের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব, সেখানে সেই জ্ঞানপ্রধান অন্তঃকরণবৃত্তিই মোটামুটি জ্ঞানশব্দের বাচ্য; যেখানে ইচ্ছার বা মনের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব, সেখানে সেই মনঃপ্রধান অন্তঃকরণবৃত্তিই মোটামুটি মনঃশব্দের বাচ্য; যেখানে প্রাণের বা অব্যক্ত সংস্কারের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব সেখানে সেই প্রাণপ্রধান অন্তঃকরণবৃত্তিই মোটামুটি প্রাণশব্দের বাচ্য। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে—চক্ষু জ্ঞানপ্রধান বা সত্ত্বগুণপ্রধান, কর্ণ মনঃপ্রধান বা রজোগুণপ্রধান, রসনাদি প্রাণপ্রধান বা তমোগুণপ্রধান।* কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে—বাক্ জ্ঞানপ্রধান, হস্তপদ মনঃপ্রধান (যেহেতু হস্তপদ কর্ম্মপ্রধান, আর, কর্ম্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রজোগুণপ্রধান ইচ্ছা বা মন); উদরাদি প্রাণপ্রধান। সর্ব্বেন্দ্রিয়ের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয় জ্ঞানপ্রধান, কর্ম্মেন্দ্রিয় মনঃপ্রধান, শ্বাসাদির পরিচালক প্রাণেন্দ্রিয় প্রাণপ্রধান। ভৌতিকরাজ্যে, তেমি; আলোক, অন্ধকার এবং গতিক্রিয়া, এ তিনের মধ্যে আলোক সত্ত্ব-প্রধান, অন্ধকার তমোগুণপ্রধান, গতিক্রিয়া রজোগুণপ্রধান। কোনো আলোক অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল, কোনো আলোক অপেক্ষাকৃত মলিন; পীত-বর্ণের আলোক অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল, নীলবর্ণের আলোক অপেক্ষাকৃত মলিন; আবার, কোনো আলোকে গতিক্রিয়ার মাত্রা অপেক্ষাকৃত বেশী, কোনো আলোকে তাহা অপেক্ষাকৃত কম। তেমি আবার, কোনো অন্ধকার অপে-ক্ষাকৃত বেশী নিবিড়, কোনো অন্ধকার অপেক্ষাকৃত কম নিবিড়। এইরূপ

* দেখা যে জ্ঞানপ্রধান তাহার প্রমাণ এই যে, "দেখ্‌চ না, তোমাকে উনি সৎপথে বাগাইয়া আনিতে চেষ্টা করিতেছেন" এ কথার অর্থ—বুঝিতেছ না ইত্যাদি। "গুরু যাহা তোমাকে বলেন, তাহা তোমার শোনা উচিত"—অর্থাৎ তাহাতে মন দেওয়া উচিত; ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে—শ্রবণ মনঃপ্রধান বা ইচ্ছাপ্রধান। রসনা অর্থাৎ স্বাদেন্দ্রিয় প্রাণপোষক অন্নাদির রসজ্ঞ সুতরাং প্রাণপ্রধান

দেখা যাইতেছে যে, আলোকের মধ্যেও মাত্রাবিশেষে অন্ধকার এবং গতি রহিয়াছে ; তথৈব অন্ধকারের মধ্যেও আলোক রহিয়াছে, আর, আলোক যখন রহিয়াছে, তখন গতিও রহিয়াছে। গতিক্রিয়া আবার জড়বস্তুর আশ্রয় ছাড়িয়া একমুহূর্ত্তও স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না কাজেই বলিতে হয় যে, গতিক্রিয়ার মধ্যেও ন্যূনাধিকপরিমাণে জড়তা বর্ত্তমান। উত্তাপও আবার গতিক্রিয়ার সঙ্গের সঙ্গী। শৈত্য যেমন বস্তুসকলের জড়তার নিদান, উত্তাপ তেম্নি বস্তুসকলের জড়তার প্রতিহন্তা। তা ছাড়া, উত্তাপ আলোকের কনিষ্ঠ-সহোদর। আলোক এবং উত্তাপ, দুইই প্রকাশধর্ম্মী প্রভেদ কেবল এই যে, আলোক দৃষ্টিক্ষেত্রে প্রকাশলাভ করে, উত্তাপ স্পর্শক্ষেত্রে প্রকাশলাভ করে। ফলে, গতির সঙ্গে জড়তা এবং জড়বিরোধিতা, শৈত্য এবং উত্তাপ, দুইই ন্যূনাধিকপরিমাণে জড়িত থাকে।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, প্রকাশগুণের প্রাদুর্ভাবকালে প্রকাশ গুণ নিজেও প্রকাশ পায়, আর সেই সঙ্গে ক্রিয়াগুণ এবং বাধাগুণ, যাহা পূর্ব্বে অপ্রকাশ ছিল তাহাও প্রকাশ পায় ; প্রকাশের হ্যাঁপায় পড়িয়া অপ্রকাশও প্রকাশ পায়। তার সাক্ষী—জাগরণকালে, জাগরণ যে কিরূপ, তাহাও প্রকাশ পায় আর সেই সঙ্গে সুপ্তি যে কিরূপ, তাহাও প্রকাশ পায়; পক্ষান্তরে সুপ্তিকালে জাগরণও প্রকাশ পায় না, সুপ্তিও প্রকাশ পায় না। এইজন্য, ত্রিগুণের সমবেত কার্য্যকারিতা যে কিরূপ, তাহার সন্ধান পাইতে হইলে সত্ত্বগুণের প্রকাশ-ক্ষেত্রেই অনুসন্ধান চালনা করা কর্ত্তব্য।

তৃতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা যাহাকে বলেন Force, তাহা তমঃপ্রধান রজোগুণ মাত্র ; তা বই, তাহা সর্ব্বাঙ্গীন ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি নহে। এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত আছেন—যাঁহারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে একটা ঘড়ির কল করিয়া গড়িয়া তুলিতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন ; ইঁহাদের এইরূপ ধারণা যে মূলপ্রকৃতি একপ্রকার Physical Force—

জড়ধর্ম্মী ক্রিয়াশক্তি—তমঃপ্রধান রজোগুণ; প্রাণও তথৈব চ। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রাণ অচেতন নহে, পরন্তু অব্যক্ত-চেতন। আমার মুখ্য মন্তব্য কথা এই যে, এক অদ্বিতীয় নিত্যসিদ্ধ অজরামর বাস্তবিক সত্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এপারেও যেমন—ওপারেও তেমনি—সর্ব্বত্রই পরিপূর্ণ। সেই একমাত্র অদ্বিতীয় বাস্তবিক সত্যের—অর্থাৎ বস্তুগত সত্যের—সত্তা প্রাণরূপী, প্রকাশ জ্ঞানরূপী, এবং প্রকাশাপ্রকাশের তরঙ্গলহরী আনন্দরূপী; এক কথায়—বাস্তবিক সত্য অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা! যে শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের কথা আমি বলিতেছি তাঁহাদের মতে নিছক অপ্রকাশ —তমোগুণ—অন্ধশক্তি—Physical Force—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গোড়ার কথা এবং ভিতরের কথা। তাঁহারা এত যে mental force (মানসিক শক্তি) ব্যয় করিয়া তাঁহাদের ঐ স্বাভিমত সিদ্ধান্তটিকে শোভন বেশে সাজাইয়া দাড় করাইয়াছেন—স্নেহান্ধ মাতা যেমন আদুরে ছেলেকে সাজায় সেইরূপে সাজাইয়া দাড় করাইয়াছেন, তাঁহাদের সেই mental force তবে পদার্থটা কি? তাহা কি শুধুই কেবল Physical force মাত্র—গায়ের জোর মাত্র? গায়ের জোরই বটে! তাঁহারা এই যে একটি কথা বলেন যে, vital force (জীবনী শক্তি বা প্রাণ) এক প্রকার compound (মিশ্র) physical force, এটা তাঁহারা বলেন গায়ের জোরে—তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। তাঁহারা বেস্ জানেন যে, hydrogen এর সঙ্গে hydrogen মিশিলে hydrogenই থাকিয়া যায়, তা বই তাহাতে করিয়া কোনো compound বস্তু ফলিত হয় না—হাইড্রোজেনের সহিত অক্সিজেন মিশিলে তবেই তাহার ফল হয় একটা compound-বস্তু যাহার নাম জল। এটা তাঁহারা খুবই জানেন যে, স্বজাতীয় বস্তুর সঙ্গে বিজাতীয় বস্তু মিলিলেই compound বস্তু ফলিত হয়, তা বই স্বজাতীয় বস্তুর সহিত স্বজাতীয় বস্তু মিলিলে compound বস্তু ফলিত হয় না—স্বজাতীয় পদার্থের

যোগে একসের হাইড্রোজেন দুই সের হইলে তাহা কিছু আর compound বস্তু হয় না ;—ইহা জানিয়াও ঐ শ্রেণীর পণ্ডিতেরা গায়ের জোরে বলেন যে, Physical force এর সঙ্গে Physical force মিলিত হওয়া গতিকে সময়ে সময়ে নূতন এক প্রকার compound force উৎপন্ন হয়—তোমার আমার ন্যায় অনভিজ্ঞ লোকেরা যাহাকে বলে vital force (জীবনীশক্তি বা প্রাণ)। এই শ্রেণীর পণ্ডিতেরা vital forceকেই বাঘ দেখেন—কিন্তু chemical forceকে (রাসায়ণিক পাত্র নির্ব্বাচনী শক্তিকে) ঘরের ছেলে ভাবিয়া কোলে করিয়া আদর করেন। এটা তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না যে, vital forceও যেমন, chemical force'ও তেমনি, দুয়ের কোনটিই নিছক Physical force নহে—অমিশ্র Physical force নহে। এটা তো তাঁহারা মানেন যে, জলের ভিতরে oxygen এবং hydrogen দুইই মাথামাখিভাবে একত্রে মিলিয়া মিশিয়া অবস্থিতি করে। জল-পরমাণুর ভিতরে oxygen এবং hydrogen শুধুই যদি কেবল গা-ঘ্যাঁসাঘেঁসি করিয়া থাকিত তাহা হইলে বটে বলিতে পারিতাম যে, জলের অন্তর্নিগূঢ় রসায়নী শক্তি (chemical force) Physical force এরই প্রকারান্তর ; কিন্তু তাহা তো আর নহে—জলপরমাণুর ভিতরে oxygen এবং hydrogen শুধুই তো আর গা-ঘ্যাঁসাঘেঁসি করিয়া অবস্থিতি করে না ;—স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, জলের অন্তর্ভূত oxygen এবং hydrogen এর মধ্যে অসংক্রম্যতা (impenetrability) বলিয়া একটা physical প্রাচীরের ব্যবধান নাই ;—কাজেই বলিতে হয় যে, জল পরমাণুর মধ্যে oxygen এবং hydrogen অভৌতিক-ভাবে (vital ভাবে) প্রাণে প্রাণে মিশিয়া রহিয়াছে ; তবে আর vital-force এর বাকি রহিল কি ? আবার, জল বলিয়া যে একটা অবভাস (phenomenon) তাহা দর্শকের প্রত্যক্ষগোচরেই জল, আর,

প্রত্যক্ষ-ক্রিয়া একপ্রকার মানসিক অবভাস (mental phenomenon), তা বই, তাহা physical phenomenon নহে! তবেই হইতেছে যে, জল একদিকে যেমন physical phenomenon, আর এক দিকে তেমনি তাহা mental phenomenon। এইরূপে দাঁড়াইতেছে যে, জল physical, vital এবং mental তিনই একাধারে। ফল কথা এই যে, জলের উৎপাদিকা শক্তি compound physical force নহে—পরন্তু তাহা compound ত্রিগুণ ;—তাহা সত্ত্বরজস্তমোগুণের সংঘাত। তবে কি না "বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক বস্তু ত্রিগুণের সংঘাত" এ কথাটা প্রাচীন কাঙালের কথা—এইজন্য এখন তাহা প্রতীচীন পণ্ডিতগণের মূলেই গ্রাহ্যযোগ্য নহে ; তাহা বাসী হউক—তখন দেখা যাইবে তাহা ফলে কি না। আমাদের দেশী শাস্ত্রমতে মূলপ্রকৃতি সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থা এবং বৈকারিক প্রকৃতি বা বিকৃতি সত্ত্বরজস্তমোগুণের বৈষম্যাবস্থা। ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাও যা', আর, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাম্যাবস্থাও তা—একই ; আর, "সাম্যে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিতং" এই শাস্ত্রবচনটি যদি সত্য হয়, তবে, মূলপ্রকৃতি ঈশ্বরাধিষ্ঠিতা ব্রহ্মময়ী ঐশীশক্তি। মূলপ্রকৃতিকে অজ্ঞান বলিতে চাও বলো—যেহেতু তোমার আমার মুখের কথায় প্রকৃত সত্যের কিছুই আইসে যায় না—কিন্তু এটা অবশ্য তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, সে যে অজ্ঞান তাহা জ্ঞানভরা অজ্ঞান। তার সাক্ষী, পশুপক্ষীরা যখন প্রকৃতির নিয়মে পরিচালিত হয়। বলিতে পারো যে, মৌমাছিরা স্ব স্ব প্রকৃতির অন্ধ উত্তেজনায় শুদ্ধ কেবল আপনার আপনার উদরপূর্ত্তি করিবার জন্য মধু সঞ্চয় করে ; কিন্তু এটাও তো তোমার দেখা উচিত যে, তাহাদের সেই নিজের নিজের অন্ধ প্রকৃতির ভিতরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলপ্রকৃতি চাপা দেওয়া রহিয়াছে. সেই বিশ্বব্যাপিনী মূল প্রকৃতি মৌমাছির মধুসঞ্চয়ের ছদ্মবেশে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে রেণু চালা-চালি করিতে থাকে—আর সেই গতিকে ফুলের

গর্ত্তসঞ্চার হইয়া পুষ্পবৃক্ষের বংশ যুগযুগান্তর ধরিয়া নিরবচ্ছেদে প্রবাহিত হইয়া চলিতে থাকে। মৌমাছির নিজের অন্ধ প্রকৃতির সহিত ফুলের মধুর শুদ্ধ কেবল ভক্ষ্যভক্ষক সম্বন্ধ ; মূলপ্রকৃতির স্পর্শমণির সংস্পর্শে সেই ভক্ষ্য-ভক্ষক সম্বন্ধ রক্ষ্যরক্ষক-সম্বন্ধরূপে পরিণত হইতেছে—ইহা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের দেখা কথা। মৌমাছি সচেতন জীব, আর, পুষ্পবৃক্ষ অচেতন উদ্ভিদ্‌ এরূপ অবস্থায়—পুষ্পবৃক্ষের বংশরক্ষার জন্য মৌমাছির এত মাথা-ব্যথা কেন? ফল কথা এই যে, মাথাব্যথা মৌমাছির নহে—মাথাব্যথা মূল-প্রকৃতির। উদ্ভিদ্‌প্রকৃতি এবং জীবপ্রকৃতির মধ্যে যে একটা বৈষম্য আছে—মূলপ্রকৃতির কাছে সে বৈষম্য মূলেই নাই। মূলপ্রকৃতি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাম্যাবস্থা; সাম্যই (equilibrium এবং harmonyই) মূলপ্রকৃতির বৈশেষিক পরিচয় লক্ষণ; আর, একটু পূর্ব্বে যেমন ইঙ্গিত করিয়াছি—"সাম্যে ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠিতং"—মূলপ্রকৃতি ঈশ্বরাধিষ্ঠিতা ঐশী-শক্তি সুতরাং জ্ঞানময়ী। মূলা প্রকৃতির পথে চলা এবং ব্রহ্মজ্ঞানের পথে চলা একই; প্রকৃতিস্থ শরীরের নামই সুস্থশরীর; প্রকৃতিস্থ মনের নামই নিষ্পাপ অন্তঃকরণ; প্রকৃতিপুরুষ গোড়ায় একই অভিন্ন। এটাও কিন্তু দেখা চাই যে, মূলপ্রকৃতি হইতে পরে পরে যাহা উৎপন্ন হয় তাহা নীচের নীচের ধাপে সরিয়া দাড়াইয়া স্ব স্ব প্রধান হইয়া বৈষম্যে আক্রান্ত হয়। মূলপ্রকৃতি সাম্যস্বরূপা—বৈকারিক প্রকৃতি বা বিকৃতি বৈষম্যস্বরূপা। প্রত্যেক জীবের স্ব-স্ব প্রধান বৈকারিক প্রকৃতি অহঙ্কার-গর্ত্ত। বৈকারিক প্রকৃতির হাড়ে হাড়ে এইরূপ একটা স্বভাবসিদ্ধ অজ্ঞান লাগিয়া থাকে—যেন তাহার মাথার উপরে কেহ অধ্যক্ষ বা নিয়ামক নাই—যেন হাতির মাথার উপরে মাহুত বসিয়া নাই। কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যতই বিকৃতি এবং বৈষম্য থাকুক না কেন—মূলপ্রকৃতির অধিষ্ঠানের প্রভাব ভিতরে ভিতরে কার্য্য করিয়া সে সমস্ত বিকৃতি এবং বৈষম্যের দোল-ক্রীড়াকে যথাসময়ে

সাম্যের পথে এবং প্রকৃতির পথে বাগাইয়া আনে। সত্ত্বরজস্তমোগুণের বিকৃতিমূলক বৈষম্যকে প্রকৃতিমূলক সাম্যে পরিণত করা, আর, অন্তঃকরণে পরমাত্মার আসন পাতা—একই। যেহেতু "সাম্যে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিতং"। মূল-প্রকৃতির জ্যোতির্ম্ময় আসন নিখিল আকাশে বিছানো রহিয়াছে; মনুষ্য-মণ্ডলীর অন্তঃকরণেও সেই আসন বিছানো চাই—তাহা হইলেই পরমাত্মার অধিষ্ঠানের মঙ্গলজ্যোতি জীবাত্মার ভোগে আসিবে—নচেৎ তাহা থাকিয়াও নাই।

ব্যক্তাব্যক্তরহস্য এবং ত্রিগুণরহস্যের সঙ্গে বোঝাসুঝি করিয়া যে জায়-গাটি তোমার ধারণার আয়ত্তাধীনে আনিবার জন্য এতক্ষণ ধরিয়া চেষ্টা করিলাম, তাহার একটা মানচিত্র দেখাইতেছি, প্রণিধান কর—

অন্তঃকরণ	চেতন	অবস্থা	গুণ	গুণের পরিচয়লক্ষণ
জ্ঞান	সুব্যক্ত	জাগ্রত	সত্ত্ব	প্রকাশ
মন	অর্দ্ধব্যক্ত	স্বপ্ন	রজো	ক্রিয়া
প্রাণ	অব্যক্ত	সুষুপ্তি	তমো	জড়তা

ইহার পরে আসিতেছে দ্বন্দ্বরহস্য অর্থাৎ প্রাণের চাওয়া এবং জ্ঞানের পাওয়ার—প্রকৃতি এবং পুরুষের—লুকাচুরি খ্যালা বা দোলোৎসব।

দ্বন্দ্বরহস্য।

॥ ১ ॥ ও সব তর্ক বিতর্ক এখন থাক্! সন্ধ্যার চন্দ্রমা দেখা দিতেই কুহু কুহু কালো কোয়েলিয়া বেসুর স্বরে জাগিয়া উঠিল। তোমার সেদিনকার

সেই বসন্তবাহারটি গাও—শুনিয়া প্রাণটা ঠাণ্ডা হো'ক্। বলিতেছ "গাই, গাই"—গাহিতেছ কই?

॥ ২ ॥ রোসো! গান'টাকে মনে আনি।

॥ ১ ॥ গা'নটা তবে কি তোমার মনে নাই? মনে যদি নাই, তবে আছে তাহা কোথায়? গানটাকে তুমি যে স্থান হইতে উঠাইয়া আনিয়া তোমার মনের সম্মুখে দাঁড় করাইতে ইচ্ছা করিতেছে—না জানি সেটা কোন্ স্থান! বুঝিয়াছি! গানটি তোমার প্রাণের (অর্থাৎ অব্যক্ত চেতনের) আঁধার ঘরে অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকা দিয়া শুইয়া পড়িয়া আছে। অবগুণ্ঠন সে আর কিছু না—তমোগুণ বা জড়তা, ইংরাজিশাস্ত্রে যাহাকে বলে inertia। তমোগুণে অবগুণ্ঠিত হ'য়া দিনরাত্রি শুইয়া পড়িয়া থাকা একপ্রকার রোগ আলস্যের রোগ। ও-রোগের একমাত্র ঔষধ রজোগুণ কিনা কর্ম্মোদ্যম। অতএব, আর বিলম্ব ভাল না—গা'টাকে ঝট্‌পট্ চেতাইয়া তোলো।

॥ ২ ॥ তোমার মত ব্যস্তবাগীশ ভূ-ভারতে নাই! তোমার জানা উচিত যে, গীতাঙ্গনাটি লজ্জাবতী লতা। তাড়াহুড়া করিয়া আমি যদি তাহাকে "ওঠ্ তোর বিয়ে" বলিয়া চেতাইতে যাই, তাহা হইলে বালকাটি লজ্জায় জড়সড় হইয়া ঘরে কপাট বন্ধ করিয়া পালাইয়া বসিয়া থাকিবে; সন্ধ্যার অবশিষ্ট সময়টুকুর মধ্যে সে আর আমার এদিক্‌মুখো হবে না।

॥ ১ ॥ অত করিয়া আমাকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না—এক ইঙ্গিতেই আমি বুঝিয়াছি সমস্ত! আমি ঘড়ি'র মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম - দেখি তোমার গীতাঙ্গনাটির কতক্ষণে ঘুমভাঙে।

॥ ১ ॥ এ এ-এ এ···!

॥ ১ ॥ গীতটি বেরো'ব বেরো'ব করিতেছে—তা' তো দেখিতেছি; কিন্তু বেরোচ্ছে কই? দেখিতেছি বটে যে, রজোগুণের উত্তেজনায় গীতটি

তোমার অব্যক্ত চেতনের আঁধার ঘর হইতে অর্দ্ধস্ফুট চেতনের ঝাপ্‌সা আলোকে বাহির হইয়াছে—সংস্কারাত্মক প্রাণের শয়নমন্দির হইতে বাসনাত্মক মনের সাজঘরে বাহির হইয়াছে; কিন্তু তবুও সে এখনো পর্য্যন্ত তোমার সুব্যক্ত চেতনের পরিষ্কার আলোকে বাহির হইতে পারিতেছে না—সত্ত্বগুণের দীপালোকিত ঈশনাত্মক জ্ঞানের সভামন্দিরে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না।

গান।

॥ ২ ॥ বসন্ত আগত ভয়ী সখীরী– ইত্যাদি।

॥ ১ ॥ বলিহারি! সত্ত্বগুণ সাক্ষাৎ মা সরস্বতী! তাহার আবির্ভাবে গীতাঙ্গনাটির অবগুণ্ঠন অপসারিত হইয়া গিয়া যে মাত্র তাহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মধুর মূর্ত্তি দেখা দিল, আর-অমি তৎক্ষণাৎ তোমার কণ্ঠের ফোয়ারা খুলিয়া গেল।

জ্ঞানের সুব্যক্ত চেতনের সঙ্গে সত্ত্বগুণের অর্থাৎ ঈশনাত্মক প্রকাশ-জ্যোতির—মনের অর্দ্ধস্ফুট চেতনের সঙ্গে রজোগুণের অর্থাৎ বাসনাত্মক ক্রিয়াচাপল্যের—প্রাণের অব্যক্ত চেতনের সঙ্গে তমোগুণের অর্থাৎ জড়তা-গর্ত্ত অপ্রকাশের—দেখিলে কেমন মর্ম্মান্তিক মিল! জ্ঞান-প্রাণ মন এই যে তিন বস্তু চেতনাচেতন-অর্দ্ধচেতন, আর, সত্ত্ব-তমো-রজো এই যে তিনগুণ প্রকাশা-প্রকাশ-অর্দ্ধপ্রকাশ—দোঁহের মধ্যে ভেদ আছে বলিয়া কি তোমার মনে হয়? আমার তো তাহা মনে হয় না! কিন্তু তোমার কণ্ঠের ফোয়ারা খুলিয়া গিয়াছে—এখন তাহার উচ্ছ্বাস থামানো ভার। তোমার ভিতরে আমি একটি যুগল মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি। আমি তোমার গানের শুধুই কেবল শ্রোতা—কিন্তু তুমি তোমার গানের শ্রোতা এবং প্রবর্ত্তন-কর্ত্তা দুইই একসঙ্গে। যে অংশে তুমি তোমার আপনার

কণ্ঠনিঃসৃত গানের আপনি শ্রোতা এবং রসগ্রাহী, সেই অংশে তোমার প্রাণের চাওয়া বা বাসনা পরিতৃপ্ত হইতেছে; তেমি আবার, যে অংশে তুমি তোমার আপনার গানের আপনি প্রবর্ত্তন-কর্ত্তা, সেই অংশে তোমার জ্ঞানের পাওয়া বা ঈশনা কিনা কর্ত্তৃত্বশক্তি ফলবতী হইতেছে। তোমার মনের মধ্যে শ্রোতা এবং গায়কের, সমজ্‌দার এবং গুণীর, ভোক্তা এবং কর্ত্তা'র, বাসনা এবং ঈশনা'র, চাওয়া এবং পাওয়ার শুভ-সম্মিলনে দোঁহার দ্বন্দ্ব মিটিয়া গিয়াছে; তোমার সঙ্গীতজ্ঞান এবং সঙ্গীতাসক্ত প্রাণ হরগৌরীর ন্যায় দুয়ে এক একে দুই হইয়াছে; তাই তোমার এত আনন্দ। তোমার গান শুনিয়া আমার কি আনন্দ হইতেছে না? আমার খুবই আনন্দ হইতেছে; কিন্তু আমার আনন্দ একগুণ—তোমার আনন্দ তিনগুণ। তার সাক্ষী—আমি কেবল গান শুনিয়া আনন্দ লাভ করিতেছি; তুমি কিন্তু—কি আর বলিব—তোমার ভাগ্যকে বলিহারি—

(১) গান গাইয়া আনন্দ লাভ করিতেছ;

(২) গান শুনিয়া আনন্দ লাভ করিতেছ;

(২) গান শুনাইয়া আনন্দ লাভ করিতেছ;

ওঁ বিষ্ণু! মানস সরোবরের মাঝখানে একটি উপদ্বীপ আছে—সে কথাটা তোমাকে বলিতে ভুলিয়াছি! তোমার আনন্দ দেখিয়া সেই উপদ্বীপটির কথা মনে পড়িতেছে। সে উপদ্বীপটির নাম সমাধিউপদ্বীপ মনঃসমাধান বলিলে যাহা বুঝায় তাহারই সংক্ষিপ্ত নাম সমাধি। মানস-সরোবরের দুইপার ঘাঁসা দুই কিনারা হ'চ্চে বাসনা এবং ঈশনা, আর, দুয়ের মধ্যিখানে যে একটি উপদ্বীপ আছে সেইটির নাম সমাধি-উপদ্বীপ। সমাধি-উপদ্বীপের মাঝখানে একটা ফোয়ারা আছে, আর, সেই ফোয়ারার চারিধারে একটি পদ্মবন-শোভিতা পুষ্করিণী আছে। ফোয়ারার এবং পুষ্করিণীর মধ্যে জলের আদান প্রদান চলিতেছে ক্রমাগতই! পুষ্করিণী

বরাবর ফোয়ারাতে জলসঞ্চার করিয়া ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে, এবং বারান্তরে বারান্তরে ফোয়ারার জলে ভরাট্ হইয়া ফাঁপিয়া উঠিতেছে। পুষ্করিণীটির নাম হৃৎপদ্মিনী এবং ফোয়ারাটির নাম আনন্দ-উৎস। ব্যাপারটা তবে তোমাকে খুলিয়া বলি ;—

জ্ঞানের পাওয়া এবং প্রাণের চাওয়া মানসসরোবরের চথাচথী। বিচ্ছেদের সময় চথী এপার হইতে (প্রাণের কূল হইতে) ডাকাডাকি করে, চথা ওপার হইতে (জ্ঞানের কূল হইতে) সাড়া দ্যায়। মিলনের সময় চথী এপার হইতে প্রাণের সম্বল লইয়া এবং চথা ওপার হইতে জ্ঞানের সম্বল লইয়া সমাধি উপদ্বীপে হৃৎপদ্মিনীর ধারে একত্রে মিলিত হয় আর-অম্নি আনন্দের ফোয়ারা খুলিয়া যায়। চাওয়া এবং পাওয়ার (অর্থাৎ বাসনা এবং ঈশনার) বিচ্ছেদমিলনের এই যে রহস্য, ইহারই নাম দ্বন্দ্ব রহস্য :

ক্ষেত্র দেখ—

এতদ্ব্যতীত, দ্বৈতাদ্বৈত রহস্য বলিয়া যে একটি বিশ্বব্যাপী রহস্য আছে তাহা এই দ্বন্দ্বরহস্যেরই বিরাট মূর্ত্তি। তোমার এক্ষণকার এই গীতোচ্ছ্বাসে কতগুলা দ্বৈত অদ্বৈতে পরিণত হইয়াছে—শুনিবে? তোমাতে গায়ক এবং শ্রোতা দুই নহে কিন্তু এক ; যে জন গান শুনিতেছে এবং যে জন গান শুনাইতেছে, সে দোঁহে দুই নহে কিন্তু এক ; গান কার্য্যের কর্ত্তা এবং গান

রসের ভোক্তা দুই নহে কিন্তু এক ; গান গাহিবার ইচ্ছা এবং গান গাহিবার শক্তি দুই নহে কিন্তু এক ; প্রাণের চাওয়া এবং জ্ঞানের পাওয়া দুই নহে কিন্তু এক ; বাসনা এবং ঈশনা দুই নহে কিন্তু এক ; প্রকৃতির প্রবৃত্তি এবং পুরুষকারের প্রবর্ত্তনা দুই নহে কিন্তু এক , গান শুনিবার আনন্দ এবং গান শুনাইবার আনন্দ দুই নহে এক ।

এই দ্বন্দ্বরহস্যের মধ্য হইতে অতীব একটি নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে এই যে, এক হাতে তালি বাজে না ; ফাঁকা একত্ব বা ইংরাজিতে যাহাকে বলে ছিন্ন সত্তা (abstract entity) তাহা কোনো কার্য্যেরই নহে ; তার সাক্ষী তোমার এই যে গানকার্য্য এ কার্য্যের কারণ কে ? গায়ক না শ্রোতা ? কারণ যে কে—তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে । ফলেন পরিচীয়তে। তোমার কাণে যদি তালা লাগিয়া যায় তাহা হইলে শ্রোতার অভাবে তোমার গানকার্য্য তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া যাইবে ; আবার, শ্লেষ্মার আক্রমনে তোমার যদি গলা বুজিয়া যায়, তাহা হইলে গায়কের অভাবে তোমার গানকার্য্যের বিপত্তি ঘটিবে তেম্নিই বা ততোধিক। তবেই হইতেছে যে, তোমার গানকার্য্যের কারণ অ্যাকা কেবল গায়ক না—অ্যাকা কেবল শ্রোতা না—পরন্তু গায়ক এবং শ্রোতার হরিহরাত্মা-ভাবই তোমার গানকার্য্যের কারণ। জগৎকার্য্যের কারণ তেম্নি পুরুষনিরপেক্ষ উদাসিনী প্রকৃতিও না এবং প্রকৃতিনিরপেক্ষ উদাসীন পুরুষও না ; পরন্তু প্রকৃতিপুরুষের এক স্বভাবের আনন্দই জগৎকার্য্যের কারণ, আর, সেই আনন্দই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মূলাধার। বেদোপনিষদে স্পষ্টই লেখা আছে যে, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। আনন্দ হইতেই ভূত সকল উৎপন্ন হইতেছে, উৎপন্ন হইয়া আনন্দেরই গুণে বাঁচিয়া থাকিতেছে ; এবং জীবনাবসানে আনন্দেরই মধ্যে প্রবেশ করিতেছে ।

॥ ২ ॥ আমার এইরূপ ধারণা যে, জগৎকার্য্যের গোড়া'র কথা বুদ্ধি-মনের অগোচর।

॥ ১ ॥ তুমি যাহা বলিতেছ—উপনিষদের ঐ বচনটির পরছত্রেই তাহা লেখা আছে; তাহা এই যে, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" সে তত্ত্ব এরূপ মহানিগূঢ় এবং অনির্ব্বচনীয় যে, মনের সহিত বাক্য তাহার নাগাল না পাইয়া সেখান হইতে ফিরিয়া আসে। কিন্তু আবার, তাহার অব্যবহিত পরেই লেখা আছে "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন তিনি কোথা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হ'ন না।" তা শুধু না, উহার দুই এক পংক্তি পূর্ব্বে এ কথাও লেখা আছে যে, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের মূলাধার সেই-যে-আনন্দ তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর তিনিই ব্রহ্ম। একটা ছোটো খাটো কথা ধরা যা'ক্।

জগদ্বিখ্যাত কবিদিগের কাব্যরচনার গোড়ার কথা তোমার কিরূপ মনে হয়? তাহা বুদ্ধিমনের গোচর না অগোচর? একব্যক্তি বলিতে পারে যে, কবির প্রকৃতি হইতে কবিতা আপনা আপনি উচ্ছ্বসিত হইতেছে; আর এক ব্যক্তি বলিতে পারে যে, কবির পুরুষকারের কর্তৃত্ব প্রভাবে কবিতা ফলাইয়া তোলা হইতেছে; দুই কথাই সত্য—তবে কিনা আধা সত্য। সব চেয়ে বেশী সত্য তৃতীয় ব্যক্তির কথা; সে কথা এই যে, কবির প্রকৃতি এবং পুরুষকার, বাসনা এবং ঈশনা একসঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া যাওয়া'র আনন্দ হইতে কবিতা উচ্ছ্বসিত হইতেছে। এ না যে, কবি'র প্রকৃতি হইতে কবিতা-রচনা আপনা-আপনি হইয়া যাইতেছে, যেন—কবি নিজে শুধুই কেবল সাক্ষীগোপাল; এও না যে, কবিতারচনাতে নিজে কবির প্রকৃতির বা প্রাণের কোনো হস্ত নাই—সবই কবির ঈশনাত্মক জ্ঞানের বলে ঘট ইয়া তোলা হইতেছে। "অনির্ব্বচনীয়" তো আর গাছে

ফলে না—ইহারই নাম অনির্ব্বচনীয়। অনির্ব্বচনীয় বটে! ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপকের জ্ঞান জ্ঞানই কেবল; ভোগাসক্ত বিলাসীর প্রাণ প্রাণই কেবল; এ দুটা তাই সুনির্ব্বচনীয়। পরন্তু প্রতিভাশালী মহাত্মাদিগের প্রাণই জ্ঞান, জ্ঞানই প্রাণ; শক্তিই ইচ্ছা, ইচ্ছাই শক্তি; বাসনাই ঈশনা, ঈশনাই বাসনা চাওয়াই পাওয়া; পাওয়াই চাওয়া; কাজেই অনির্ব্বচনীয়। কবির কবিতা বাহির হয় কোথা হইতে কখন্ তাহা বলিব শুনিবে? মানসসরোবরের সমাধি-উপদ্বীপে হৃৎপদ্মিনীর ধারে যখন কবির বাসনা এবং ঈশনা, প্রকৃতি এবং পুরুষকার, প্রাণের চাওয়া এবং জ্ঞানের পাওয়া, একত্রে মিলিয়া দুয়ে-এক-একেদুই হয়, তখনই আনন্দের ফোয়ারা খুলিয়া যায়, আর, সেই আনন্দের ফোয়ারা হইতে কবিতা উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে। কবির চিদাকাশে এ-যেমন দেখিতে পাওয়া গেল, সার্ব্বভৌমিক মহাকাশে তেমনি আনন্দের উৎস আছে। সে আনন্দ বুদ্ধিমনের অগোচর অনির্ব্বচনীয়; তাহা মহাপ্রকৃতি এবং মহান্ পুরুষের একাত্মভাবের অটল গম্ভীর এবং মহান্ আনন্দ। সেই মহানন্দের উৎস হইতে নিখিল বিশ্বভুবন উচ্ছ্বসিত হইতেছে। পলকে পলকে, নিশ্বাসেপ্রশ্বাসে অহোরাত্রে পক্ষে পক্ষে, অব্দে অব্দে, যুগে যুগে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় হইতেছে।

॥ ২ ॥ এ যেন বুঝিলাম যে, সৃষ্টিস্থিতি আনন্দেরই ব্যাপার। কিন্তু প্রলয় কিরূপ? প্রলয়ও কি তাই—প্রলয়ও কি আনন্দের ব্যাপার?

॥ ১ ॥ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় তিনেএক-একেতিন। যাহাকে তুমি বলিতেছ শরীরের কান্তি পুষ্টি এবং স্থিতি, তাহার মধ্য হইতে সৃষ্টি এবং প্রলয়ের ব্যাপার দুটাকে (দৈহিক উপকরণ সামগ্রীর উপচয় এবং অপচয়ের ব্যাপার দুটা'কে) বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া কতক্ষণ তুমি স্থিতিটাকে স্বপদে দণ্ডায়মান রাখিতে পারো তাহা আমি দেখিতে চাই। তোমার মুখে যে রা নাই।

তবেই হইতেছে যে, স্থিতির নামই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়। মোট কথাটা যাহা এখানে দ্রষ্টব্য তাহা এই :—

সুব্যক্ত জ্ঞানে বাস্তবিক সত্তা যাহা সর্বত্র প্রকাশ পায়, যাহা তোমাতে প্রকাশ পায়, আমাতে প্রকাশ পায়, জীবজন্তুতে প্রকাশ পায়, তরুলতা উদ্ভিদে প্রকাশ পায়, কাষ্ঠলোষ্ট্রপাষাণে প্রকাশ পায়, স্বর্ণ রৌপ্য মণিমাণিক্যে প্রকাশ পায়, তাহা কিরূপ পদার্থ? তাহা মোহের নিদ্রা নহে, কল্পনার স্বপ্ন নহে : পরন্তু তাহা সাক্ষাৎ সত্য—তাহা জাগ্রত জীবন্ত সত্য। তবে এটা সত্য যে, যাহা কিছু আমরা দেখিতেছি শুনিতেছি সমস্তই ঘড়ি ঘড়ি রূপান্তরিত হইতেছে। হউক না রূপান্তরিত : তুষার রূপান্তরিত হইয়া হউক্ না জল : জল রূপান্তরিত হইয়া হউক না বাষ্প ; বাষ্প রূপান্তরিত হইয়া হউক না মেঘ : মেঘ রূপান্তরিত হইয়া আবার হউক্ না জল ; জল রূপান্তরিত হইয়া আবার হউক না তুষার ; যাহা যাহা রূপান্তরিত হউক্ না কেন। সবই সত্য, সকলেরই সত্তা বাস্তবিক সত্তা, কাহারো সত্তা আমাদের মনগড়া কাল্পনিক সত্তা নহে। এমন কি, যাহা কিছু আমরা মনে করি আমাদের মনগড়ামাত্র—যেমন স্বপ্নের হাতি ঘোড়া, তাহারও ভিতরে বাস্তবিক সত্তা জাগিতেছে ; কেন না প্রতিধ্বনি যেমন রূপান্তরিত ধ্বনি, কাল্পনিক সত্তা তেমি রূপান্তরিত বাস্তবিক সত্তা। সৎশব্দের অর্থ স্বতঃসিদ্ধ নিত্যবস্তু :—সত্তামাত্রই সত্যেরই সত্তা—বস্তুরই সত্তা—বাস্তবিক সত্তা। সবই সত্য জাগ্রত জীবন্ত সত্য—অদ্বিতীয় সত্য। সত্য এক, সত্যের প্রকাশ এবং অপ্রকাশ দুই। অপ্রকাশের প্রতিযোগে প্রকাশ আত্ম সমর্থন করে। স্থলের অপ্রকাশ জলে, জলের অপ্রকাশ স্থলে; দুয়ের এই দুই অপ্রকাশের প্রতিযোগে দুয়ের প্রকাশ ফুটিয়া উঠে। জলের প্রতিযোগে স্থল পরিস্ফুট হয়, স্থলের প্রতিযোগে জল পরিস্ফুট হয়, রৌদ্রতাপের প্রতিযোগে বটচ্ছায়ার শৈত্য পরিস্ফুট হয়, বটচ্ছায়ার শৈত্যের প্রতিযোগে রৌদ্র-

তাপ পরিস্ফুট হয়; বিদ্যুতের প্রতিযোগে ঘনান্ধকার পরিস্ফুট হয়, ঘনান্ধকারের প্রতিযোগে বিদ্যুৎ পরিস্ফুট হয়। ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই যে অপরিমেয় বিরাট্ লক্ষণাক্রান্ত তিন তিনের প্রতিযোগে তিন পরিস্ফুট হইয়াছে। এটা কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে, যাঁহার প্রকাশ, তাঁহারই অপ্রকাশ; সত্যেরই প্রকাশ, সত্যেরই অপ্রকাশ; সত্যকে ছাড়িয়া প্রকাশও কিছুই নহে, অপ্রকাশও কিছুই নহে; নিখিল জগতের সমস্ত দ্বন্দ্ব-বৈচিত্র্য একই সত্যের নিশ্বাস প্রশ্বাস।

আর একটি কথা মনে রাখা চাই এই যে ক্রমবিকাশের সোপান মাড়াইয়া অপ্রকাশের শয্যা হইতে প্রকাশ মাথা তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, তথৈব, ক্রমাবগুণ্ঠনের সোপান মাড়াইয়া, প্রকাশ, অপ্রকাশের সুখশয্যায় শুইয়া পড়ে। এদিকে প্রাতঃসন্ধ্যার মধ্য দিয়া ঊষার মুখাবরণ অপসারিত হয়; আর এক দিকে সায়ংসন্ধ্যার মধ্য দিয়া দিবা'র মুখে অবগুণ্ঠন পড়িয়া যায়। একদিকে শরতের মধ্য দিয়া গ্রীষ্মঋতু শীতে পরিণত হয়, আর এক দিকে বসন্তের মধ্য দিয়া শীতঋতু গ্রীষ্মে পরিণত হয়। প্রাতঃসন্ধ্যা, সায়ংসন্ধ্যা, শরৎ, বসন্ত এইসব মাঝের-মাঝের সন্ধিস্থান দ্বন্দ্বের জোড়স্থান। মনের আনন্দ তেমি-একটি দ্বন্দ্বের জোড়স্থান—জ্ঞানের পাওয়া এবং প্রাণের চাওয়ার শুভ সঙ্গমস্থান। আর একটি রহস্য দেখিতে পাওয়া যায় এই যে, মিলনও আবার দুইরূপ; জ্ঞান যখন প্রাণকে প্রাধান্য ছায়, তখনকার মিলন একরূপ। আবার, প্রাণ যখন জ্ঞানকে প্রাধান্য ছায়, তখনকার মিলন আর একরূপ। দুইরূপ মিলনের আনন্দও দুইরূপ। জ্ঞানপ্রধান মিলনের আনন্দ সায়ংসন্ধ্যার আনন্দ। প্রত্যূষে যখন তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, তখন তোমার প্রাণের চাওয়া কোন্দিকে দৌড়ায় তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। তখন তুমি বিছানা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া প্রকাশক্ষেত্রে বাহির হইতে পারিলে বাঁচো; তখন তোমার

প্রাণের চাওয়া যায় জ্ঞানোদয়ের প্রতি, কর্ম্মোদ্যমের প্রতি ; আর সেইজন্য তখন তোমার আনন্দ হয় জ্ঞানের প্রকাশ-জ্যোতিকে পাইয়া—কর্ম্মের উদ্যমস্ফূর্ত্তিকে পাইয়া। কিন্তু এখন রাত্রি আগত প্রায় ; তোমার চক্ষু বুজিয়া আসিতেছে এবং মুখে হাঁই উঠিতেছে। এখন তুমি জ্ঞানোদয়ের আনন্দও চাও না ; এখন তুমি বিছানায় পড়িতে পারিলেই বাঁচ ! তোমার এখনকার এ অবস্থার নিকটে অপ্রকাশের আনন্দই আনন্দ, বিশ্রামের আনন্দই আনন্দ, নির্ভাবনার আনন্দই আনন্দ; নিশ্চেষ্টতার আনন্দই আনন্দ। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে যেমন চাওয়া এবং পাওয়ার দুইরূপ মিলনের দুই রূপ আনন্দ হইতে জীবের নিদ্রাজাগরণ হয়, বৃহৎব্রহ্মাণ্ডে তেমনি প্রকৃতি পুরুষের আনন্দ হইতে দিনরাত্রি হয়, শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ হয়, উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ণ হয়, ইত্যাদি ; এ সমস্তই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের আর এক নাম : আবার ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে যেমন প্রাণ মন এবং জ্ঞান তিনে এক একে তিন, বৃহৎব্রহ্মাণ্ডে তেমনি অস্তি ভাতি এবং আনন্দ তিনে এক একে-তিন ; অর্থাৎ জীবাত্মা প্রাণবুদ্ধিমনস্বরূপ, পরমাত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ। অস্তি'র সঙ্গে প্রাণের, ভাতি'র সঙ্গে জ্ঞানের, এবং আনন্দের সঙ্গে মনের বা ইচ্ছা'র মিল যে কিরূপ তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে ; অতএব প্রণিধান কর :—

(১) যাহার গুণে যাহা বর্ত্তিয়া থাকে তাহাই তাহার জীবনীশক্তি বা প্রাণ। অস্তিত্ব রক্ষা করাই প্রাণের একমাত্র কার্য্য। বর্ত্তিয়া থাকার নামই বাঁচিয়া থাকা, বর্ত্তমানতাই—অস্তিই—প্রাণ। কাষ্ঠপাষাণের ভিতরেও তড়িৎ উত্তাপ এবং আলোক অনবরত তরঙ্গিত হইতেছে—বস্তুমাত্রেরই বুকের ভিতরে প্রাণ ধুক্‌ধুক্ করিতেছে।

(২) যাহার গুণে সত্তা প্রকাশ লাভ করে তাহারই নাম জ্ঞান। প্রকাশের নামই জ্ঞান—ভাতিই জ্ঞান।

(৩) মনের বা ইচ্ছার মাঝের সমাধির স্থানটিই যে, আনন্দের স্থান তাহা একটু পূর্ব্বে বলিয়াছি ; বলিয়াছি যে, মনের দুই অঙ্গ—(১) প্রাণ-ঘঁ্যাসা বাসনা এবং (২) জ্ঞানঘঁ্যাসা ঈশনা। তাহার মধ্যে, প্রকাশাপ্রকাশ চাওয়া বাসনার কার্য্য, প্রকাশাপ্রকাশ ঘটাইয়া তোলা ঈশনার কার্য্য। মনের যে জায়গাটি এই দুই মানসাঙ্গের সমাধিস্থান অর্থাৎ যে স্থানটিতে বাসনা এবং ঈশনা দুয়ে একে একে দুই হয়, সেই স্থানটিতেই আনন্দের প্রস্রবন উন্মুক্ত হয়। ফলে, মানসসরোবর একপ্রকার ত্রিবেণী-সঙ্গম।

দ্বন্দরহস্যের ভিতরে আর একটি যে রহস্য চাপা দেওয়া আছে—সেইটিই চরম রহস্য। সে রহস্য এই :—

আনন্দ শুধু যে কেবল তোমার আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞানের ঈশনা এবং প্রাণের বাসনার মিলন-ক্ষেত্র বা সমাধিকেন্দ্র তাহা নহে। একদিকে যেমন তাহা তোমার আমার ন্যায় পৃথক পৃথক জীবাত্মার জ্ঞানের ঈশনা এবং প্রাণের বাসনার সমাধিকেন্দ্র, আর একদিকে তেমি তাহা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড এবং বৃহৎব্রহ্মাণ্ডের সমাধিকেন্দ্র। যোগী মহাপুরুষদিগের তো কথাই নাই—উচ্চশ্রেণীর কবিদিগের মনে যখন ঈশনা এবং বাসনা এক হইয়া যায়, তখন দুই ব্রহ্মাণ্ডের সেই সন্ধিস্থানটিতেই আনন্দের ফেয়ারা খুলিয়া যায়! কাব্যের উচ্ছ্বাসকালে কবির জ্ঞান এবং প্রাণ হয় যে, এক, তা তো জানাই আছে, কিন্তু এক যে হয়—কিসের গুণে হয়? কবির নিজের গুণে হয়—না আর কোন কিছুর গুণে হয়? বৃহৎব্রহ্মাণ্ডের সহিত কবির ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড একীভূত হইলে—তবেই কবির জ্ঞান এবং প্রাণ একীভূত হইতে পারে—তা ভিন্ন অন্য কোনো প্রকারেই তাহা হইতে পারে না। কোনো কবিই বৃহৎব্রহ্মাণ্ড হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া আপনার নিজগুণে কবি হইতে পারেন না। কবির প্রাণ জ্ঞান এবং মন

একরকমের সৎচিৎ এবং আনন্দ, আর, সেই জন্য কবি একরকমের স্বাধীন পুরুষ, এ কথা সত্য ; কিন্তু কবি কি রকমের সচ্চিদানন্দ—কি রকমেরই বা স্বাধীন পুরুষ—সেইটিই জিজ্ঞাস্য। প্রজাবর্গ যখন রাজপুত্রকে রাজা সম্বোধন করিয়া বলে যে, এ সমস্ত রাজ-ঐশ্বর্য্য তোমারই, তখন রাজপুত্র যে-রকমের রাজা হয়, কবি সেই রকমের সচ্চিদানন্দ স্বাধীন পুরুষ। পিতা-মাতার গুণ যে পুত্রকন্যাতে বর্ত্তিবে তাহাও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, আর, মর্ত্ত্য-বাসী কবির প্রাণ জ্ঞান এবং মন যে দেবারাধ্য সৎচিৎ আনন্দ হইবে তাহাও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আশ্চর্য্য এই যে, প্রজাবর্গের কথার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া রাজপুত্র মনে করে যে, আমিই রাজাধিরাজ মহারাজ—পিতা কেহই নহে। রাজপুত্র যদি সৎপুত্র হয় তবে সে অবশ্য বলিতে পারে যে, পিতার রাজ্যই আমার রাজ্য, পিতার মহিমাই আমার মহিমা ; কিন্তু তাহার অর্থ এ নহে যে, পিতা হইতে স্বতন্ত্ররূপে আমিই এ রাজ্যের রাজা। ফলকথা এই যে, প্রকৃতি পুরুষের অভেদস্বরূপ সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা সমস্ত জীবাত্মা লইয়া একমাত্র অদ্বিতীয় অখণ্ড পরিপূর্ণ সত্য ; তাঁহা হইতে স্বতন্ত্ররূপে কোনো কিছু সত্য হইতে পারা দূরে থাকুক—তাঁহা ছাড়া স্বতন্ত্র কোন পদার্থ মূলেই নাই। সেই অখণ্ড পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ পুরুষের প্রকাশাপ্রকাশরূপিণী যে প্রকৃতি তাহাও তিনিই স্বয়ং। কবি-মহকবি হইলেও তাঁহার জ্ঞানপ্রাণের সমাধিস্থান হইতে আনন্দের উৎস উৎসারিত হইতে পারে না—যদি না বৃহৎব্রহ্মাণ্ডের সচ্চিদানন্দপ্রকৃতিপুরুষ মাতাপিতা কবির জ্ঞানপ্রাণকে আপনার সহিত এক করিয়া প্রকাশিত না করেন। যিনি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আনন্দের প্রস্রবণ—তিনিই মহাপুরুষদিগের মনের আনন্দ-প্রস্রবণ। সত্যও দুই নহে, আনন্দের উৎসও দুই নহে। প্রকৃতি-পুরুষের অভেদরূপী অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাই একমাত্র আনন্দের উৎস। কিন্তু আনন্দ বলিতে অনেকে অনেকরূপ বোঝেন আর, তা ছাড়া, কবি-

দিগের আনন্দ সব সময়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছে না। এক অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ অখণ্ড সত্য ভিন্ন আর কিছুতেই মনুষ্যের সমগ্র জ্ঞানমন প্রাণ চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে না। সেই এক অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ সত্যে সবই আছে —আনন্দ আছে, জ্ঞান আছে, প্রাণ আছে, শক্তি আছে—"নাই" শব্দই সেখানে নাই। তাঁহারই একতমা শক্তি যাহা আমাদের স্বশক্তিরূপিণী, সেই অহমাত্মিকা অপরা শক্তির বশতাপন্ন হইয়া আমরা মণিহারা ফণীর ন্যায় মণি অন্বেষণ করিয়া সারা হইতেছি এবং আর-যে শক্তি—সেই দিব্যা পরা শক্তি—আমাদের মন হইতে যাহা ভ্রমপ্রমাদ মোহের নিবিড় অন্ধকার সরাইয়া দিবে, সে শক্তিও তাঁহারই শক্তি। সে শক্তি তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে, সে শক্তি তিনিই স্বয়ং। সে শক্তি জগতের সর্ব্বত্র কার্য্য করিতেছে; ভূগর্ভে অগ্নিরূপে কার্য্য করিতেছে, জীবের হৃদয়ে প্রাণরূপে কার্য্য করিতেছে, মস্তকে বুদ্ধিরূপে কার্য্য করিতেছে, আকাশে জ্যোতিরূপে দীপ্তি পাইতেছে। আমাদের পূর্ব্বতন পিতৃপুরুষেরা সেই শক্তিকে ত্রিসন্ধ্যা ধ্যান করিতেন; তাঁহাদের ধ্যানের মন্ত্র ছিল শুধু এই যে, সেই জগৎপ্রসবিতা দেবতার বরণীয় তেজ যাহা ভূর্ভুবস্ব-রূপী বিশ্বভুবনের সার সর্ব্বস্ব—সেই বরণীয় তেজ ধ্যান করি—তিনি আমাদিগকে জ্ঞানদান করুন। তাঁহার মঙ্গলময়ী শক্তিতে আমাদের জ্ঞানের সম্মুখ হইতে মোহের আড়াল সরিয়া গেলে—সে আড়ালে আর কিছুই না কেবল আমাদের চিরাভ্যস্ত সংস্কারের ঘুমের ঘোর এবং বাসনার স্বপ্ন—তাহা সরিয়া গেলে—সাক্ষাৎ সত্যকে পাইয়া আমরা প্রাণ জ্ঞান আনন্দ শক্তি এবং আর যাহা কিছু আমাদের চাই সবই পাইব একাধারে—আমাদের কিছুরই আর অভাব থাকিবে না। তখন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিব যে, হারামণি আমাদের অন্তরতম আমি তোমার-আমার—চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তরতম আমি; তাহা হারাইবার জিনিষই নহে। তখন দেখিয়া আমাদের আনন্দ ধরিবে না—যে, যাহার

জন্য আমরা বৎসহারা গাভীর ন্যায় সারারাজ্যে কাঁদিয়া বেড়াইতেছিলাম, তাহা কোথাও যায় নাই, তাহা আমাদের নিকট হইতে নিকটে—হাতের মুঠার মধ্যে; আত্মা তিনি, প্রাণ তিনি, জ্ঞান তিনি, আনন্দ তিনি!

সার সত্যের আলোচনা।

সত্য জগৎ এবং ভাব জগৎ

ব্রহ্মাণ্ড আশ্চর্য্য এবং তাহার আদি, অন্ত এবং মধ্য সকলই আশ্চর্য্য। ব্রহ্মাণ্ড এক বই দুই নহে; অথচ তাহাই, এক ব্রহ্মাণ্ডই, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড। একই সূর্য্য যাহা উদিতও হয় না অস্তমিতও হয় না, তাহা একই সময়ে পৃথিবীর একস্থলে নবোদিত প্রাতঃসূর্য্য আর এক স্থলে মধ্যাহ্ন সূর্য্য আর এক স্থলে অস্তোন্মুখ দিনান্ত সূর্য্য। মূলে যাহা একই অভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড ফলে তাহা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড। একই ব্রহ্মাণ্ড সুখী ব্যক্তির সুখের পুষ্পোদ্যান, দুঃখী ব্যক্তির দুঃখের কণ্টক বন; কর্ম্মীর কর্ম্মক্ষেত্র, জ্ঞানীর আলোচনা ক্ষেত্র; কবির নাট্যশালা, উদাসীনের পান্থশালা, শুষ্ক তার্কিকের মরুভূমি, দুরাকাঙ্ক্ষের মৃগতৃষ্ণা; সাধকের গুরুগৃহ, ভক্তের পিতৃগৃহ, সাধু সজ্জনের পুণ্যতীর্থ মুক্ত পুরুষের ব্রহ্মধাম। গোড়া'র সেই যে এক অভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড, তাহাই সত্য জগৎ; আর ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ঐ যে ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড তাহা ভিন্ন ভিন্ন ভাব জগৎ।

ভাব কি? একদিক দিয়া দেখিলে তাহা ভাবনার বীজ আর এক দিক দিয়া দেখিলে তাহা ভাবনার ফল। ভাবনা শব্দ ভূধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ভবন শব্দের অর্থ হওন; আর ভাবন শব্দের অর্থ হওয়ানো। আমি যদি আমার মনের মধ্যে একটা আম্রফল হওয়াই

তবে আমার সেই মানসিক হওয়ানো ক্রিয়ার নাম আম্র বিষয়ক ভাবন-ক্রিয়া সংক্ষেপে আম্র-ভাবনা আর আম্রের যে একটা আদর্শ লিপি বা নক্‌সা* আমার মনের মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই সংগ্রহ করিয়া গুছাইয়া রাখা আছে অর্থাৎ প্রলম্ব-গোলাকৃতি পাণ্ডুরচ্ছবি উদ্ভিজ্জ পদার্থ এইরূপ যে-একটি নক্‌সা পূর্ব্ব হইতেই সংগ্রহ করিয়া গুছাইয়া রাখা আছে তাহাই আম্র-ভাবনার বীজ তাহারই নাম আম্রের ভাব। কিন্তু একটু পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি, এক দিক দিয়া দেখিলে যাহা ভাবনার বীজ আর এক দিক দিয়া দেখিলে তাহা ভাবনার ফল। মনে কর, দেবদত্ত নামক এক ব্যক্তিকে অনেকদিন পূর্ব্বে আমি জাদু-ঘরে দেখিয়াছিলাম, সেই দিন হইতে তাহার মূর্ত্তির একটা নক্‌সা আমার মনোমধ্যে জাগিতেছে। মাঝে মাঝে সেই নক্‌সা দৃষ্টে তাহার সেই মূর্ত্তিটি আমি আমার মনের মধ্যে উদ্‌-ভাবনা করি অর্থাৎ ভাবনা করি। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি তাহাকে রাস্তার ধারে একটা অট্টালিকায় প্রবেশ করিতে দেখিলাম; কিন্তু চেনো-চেনা করিয়াও চিনিতে পারিলাম না। গতকল্য আমি তাহাকে একটা সভার মাঝখানে দেখিতে পাইয়া কিয়ৎকাল তাহার মুখের প্রতি ঠাহর করিয়া দেখিয়া চিনিতে পারিলাম যে ইনি দেবদত্ত। দেবদত্তের সেই পুরাতন নকসা যাহা এ-যাবৎকাল ভাবনার বীজ রূপে আমার অন্তঃকরণের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল তাহা এক্ষণে ফলরূপে আমার বুদ্ধিতে আরূঢ় হইল। সে ফলের দার্শনিক নাম প্রত্যভিজ্ঞান অর্থাৎ দোমেটে রকমের জ্ঞান—ইংরেজিতে যাহাকে বলে Recognition। প্রত্যভিজ্ঞানই Recognitionই বীজজ্ঞানের cognitionএর ফলাভিব্যক্তি। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে ভাবনার গোড়া'র সূত্র বা আদর্শলিপি বা নক্‌সা যাহার নাম দেওয়া হইয়া থাকে ভাব তাহা বস্তু একই—কেবল অবস্থা-ভেদে কখনও বা বীজরূপে লুক্কায়িত থাকে কখনো বা ফলরূপে অবির্ভূত হয়।

* নক্‌সা স্বতন্ত্র ছবি স্বতন্ত্র, এটা যেন মনে থাকে বাহীরনক্সা বাড়ীর ছবি নহে।

এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, যাহাকে আমরা বলি ভাব তাহা বিবিক্ত (abstract) অবস্থায় ভাবনার বীজ এবং 'মূর্ত্তিমান' (conerete) অবস্থায় ভাবনার ফল।

আমরা যাহাকে যে ভাবে দেখি সে প্রকৃত পক্ষে সেভাবের মনুষ্য না হইলেও আমরা তাহাকে আমাদের মনোমধ্যে সেই ভাবের মত করিয়া ভাবন করি অর্থাৎ হওয়াই। দেবদত্ত আমার পরমবন্ধু তাই আমি তাহাকে সদ্-ভাবে দেখি ; তোমার সহিত তাহার বিষয়-ঘটিত বিবাদ চলিতেছে, তাই তুমি তাহাকে অসদ্-ভাবে দেখ। দেবদত্তের উকিল ধনঞ্জয় দেবদত্তের সোনার কাটি রূপার কাটি। ধনঞ্জয় যখন দেবদত্তকে সাধুবাদ দিয়া স্বর্গে তোলে তখন দেবদত্ত আপনাকে নরোত্তম মনে করে, যখন ধিক্কার দিয়া পাতালে নাবায় তখন দেবদত্ত আপনাকে নরাধম মনে করে। দেবদত্ত তোমার নিকট দেবতাবিশেষ আমার নিকটে দৈত্যবিশেষ এবং তাহার আপনার নিকটে কখনও বা নরোত্তম কখনও বা নরাধম—ধনঞ্জয় যখন স্বর্গে তোলে তখন নরোত্তম আর যখন পাতালে নাবায় তখন নরাধম। দেবদত্ত কিন্তু তুমি তাহাকে দৈত্য বলিলেও দৈত্য হয় না দেবতা বলিলেও দেবতা হয়না—আপনি আপনাকে নরোত্তম মনে করিলেও নরোত্তম হয়না নরাধম মনে করিলেও নরাধম হয় না ; দেবদত্ত যাহা আছে তাহাই আছে। দেবদত্ত তোমার আমার এবং তাহার আপনার নিকটে হওয়া দাঁড়াইতেছে ইহা, উহা, তাহা ; সাত সতেরো। আছে কিন্তু যে দেবদত্ত সেই দেবদত্ত। হওয়ার মূলে 'আছে' রহিয়াছে ভাবের মূলে 'সত্য' রহিয়াছে। সত্যই ভাবের ভিত্তি মূল এবং সর্ব্বস্ব।

সত্য কি ? না যাহা আমাদের কাহারো ভাবন ক্রিয়ার অর্থাৎ হওয়ানো ক্রিয়ার—ভাবনার—অপেক্ষা না করিয়া পূর্ব্ব হইতেই আছে। সত্যসমুদ্র ভাব সমুদ্রের দৃশ্যমান উপরিতল। ভাবনা সমুদ্রের তরঙ্গলীলা। সত্য-শব্দ

সৎশব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যাহা আজও আছে কালও আছে চির-কালই আছে, তাহাই সৎশব্দের বাচ্য; আর যাহা সত্যের অন্তঃপাতী অর্থাৎ সৎসম্পর্কীয়, তাহাই সত্য শব্দের বাচ্য। যাহা সত্য, তাহা আমি ভাবিলেও আছে না ভাবিলেও আছে, পক্ষান্তরে যাহা শুধু কেবল আমার একটা মনের ভাব, তাহা আমি ভাবিলেই আছে, না ভাবিলেই নাই। দুয়ের এইরূপ আভিধানিক প্রভেদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া গোড়ার সেই এক অভিন্ন জগৎ যাহা আমি ভাবিলেও আছে—না ভাবিলেওআছে, তাহার নাম দেওয়া হইল সত্য-জগৎ। আর সেই একই সত্য জগতের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিরূপ যাহা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মনোদর্পণে প্রতিফলিত হইতেছে তাহার নাম দেওয়া হইল ভিন্ন ভিন্ন ভাব জগৎ।

জীবাত্মা এবং পরমাত্মা

ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভাব জগতের অধিষ্ঠাতা যে রাজা, চাষা, পণ্ডিত, মূর্খ, বণিক্, কারীকর প্রভৃতি সেই সেই জীবাত্মা তা তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। জিজ্ঞাস্য এখন এই যে, ভাবজগতেরই কি কেবল অধিষ্ঠাতা আত্মা আছে? সত্যজগতের অধিষ্ঠাতা কেহ কি নাই? সত্যজগতের অধিষ্ঠাতা অবশ্যই কেহ আছেন। কেননা এক অদ্বিতীয় সত্য জগতে যদি এক অদ্বিতীয় আত্মা না থাকেন তবে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিরূপজগতে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা আসিবে কোথা হইতে? যদি কোনো এক রাজসভার চতুস্পার্শস্থিত শুভ্র, মলিন, ভিন্নভিন্ন দর্পণের মধ্যগত ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্ব-সভায় স্পষ্টাস্পষ্ট ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রাজমূর্ত্তি বিরাজমান দেখিতে পাওয়া যায়, তবে তাহাতেই যেমন প্রমান হয় যে একই রাজসভায় একই রাজা অধিষ্ঠান করিতেছেন; তেমনি এটা যখন সুনিশ্চিত যে ভিন্ন ভিন্ন ভাব-জগতে বা প্রতিরূপ জগতে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা অধিষ্ঠান করিতেছে তখন

তাহাতেই প্রমান হইতেছে যে একই অদ্বিতীয় সত্যজগতে একই অদ্বিতীয় আত্মা অধিষ্ঠান করিতেছেন। ভাবিয়া দেখিলে সত্যজগৎ এবং ভাব জগৎ দুই জগৎ নহে প্রত্যুত একই জগৎ।

একই জগৎ একদিকে সৎস্বরূপের অধিষ্ঠানে সনাথ এবং তাঁহার শক্তিতে সত্তাবান, সুতরাং সত্য অর্থাৎ সৎসম্পর্কীয়, আর একদিকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকটে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত—সুতরাং ভিন্ন-ভিন্ন ব্যক্তিগত ভাব।

ভোগ, কর্ম্ম এবং জ্ঞান।

একই সত্য-জগৎ এক ব্যক্তির নিকটে সুখের সংসার সাজিয়া উপস্থিত হয়, আর এক ব্যক্তির নিকটে দুঃখের অরণ্য সাজিয়া উপস্থিত হয়। সত্য-জগৎ যাহার নিকটে যে-সময়ে যে বেশে উপস্থিত হয়, সে আপনিও আপনার নিকটে সেই সময়ে সেই বেশেরই অনুরূপ বেশে উপস্থিত হয়। সত্য-জগৎ যাহার নিকটে সুখের সংসার সাজিয়া উপস্থিত হয়, সে আপনার নিকটে আপনি সুখী সাজিয়া উপস্থিত হয় অর্থাৎ মনে ভাবে যে, আমি সুখী; সত্য-জগৎ যাহার নিকটে দুঃখের অরণ্য সাজিয়া উপস্থিত হয়, সে আপনার নিকটে আপনি দুঃখী সাজিয়া উপস্থিত হয় অর্থাৎ মনে ভাবে যে, আমি দুঃখী। প্রত্যহ প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের সময় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি আপনার আপনার নিকটে ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন সাজ সাজিয়া উপস্থিত হয়। তাহার পরে চিরাভ্যস্ত সংস্কারের রঙ্গশালাটীকে কল্পনার বিচিত্র চিত্রসজ্জায় এবং সদসৎ-বিবেচনার তাড়িত প্রদীপে সজ্জিত করিয়া আপনার আপনার নির্দ্দিষ্ট পালা আপনার আপনার নিকটে অভিনয় করিতে আরম্ভ করে; আরম্ভ করিয়া কখনো বা আপনাকে হাসায়, কখনো বা কাঁদায়, কখনো বা আপনাকে নাচাইয়া তোলে, কখনো বা দমাইয়া দ্যায়, কখনো বা আপ-

নার নিকট হইতে বাহবা পাইয়া ফুলিয়া দ্বিগুণ হয়, কখনো বা ধিক্কার খাইয়া কুঁকড়িয়া অর্দ্ধেক হয়। তাহার পরে বিশ্রামের যবনিকা-পতনের সময় হইলে, দিনের সঙ্গে যখন দিনগত পাপ ক্রমে ক্রমে অলক্ষিত ভাবে সরিয়া পড়ে, আর সেই সঙ্গে যখন অভিনেতৃগণের রঙ্গের বেশ-ভূষা স্ব স্ব গাত্র হইতে খসিয়া শিথিল হইয়া পড়ে, তখন রাজা অরাজা হয়, দীন অদীন হয়, বিদ্বান অবিদ্বান হয়, মূর্খ অমূর্খ হয় ইত্যাদি; তখন সকলেই একই অভিন্ন বেশে—সর্ব্বপ্রথমে যে বেশে মাতৃগর্ভে লুক্কায়িত ছিল সেই আদিম তমসাচ্ছন্ন বেশে—অগাধ সুষুপ্তির গর্ভে নিলীন হইয়া যায়।

প্রত্যহ প্রাতঃকালে যখন আমরা সুখনিদ্রার মাতৃগর্ভ হইতে পূর্ব্ব পরিচিত ধরাধামে ভূমিষ্ঠ হই, তখন আমরা আপনাকে আপনাকে কর্ত্তা এবং ভোক্তা বলিয়া স্ব স্ব জ্ঞানে উপলব্ধি করি। রাত্রিকালের শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বেশ্ আমি বুঝিতে পারি যে, আমি আপনিই নিশ্বাস টানিতেছি, প্রশ্বাস বিসর্জ্জন করিতেছি; ওদুই কার্য্যের আমি আপনিই কর্ত্তা। এটাও তখন বুঝিতে পারি যে, আমার আপনারই ঐ দুই কার্য্যের গুণে আমি আপনিই প্রাণ পাইয়া সুখী হইতেছি; আমার আপনার স্বাস্থ্য-সুখের আমি আপনিই ভোক্তা। জাগ্রৎকালে যখন আমি আপনাকে কর্ত্তা এবং ভোক্তা বলিয়া জ্ঞানে উপলব্ধি করি, তখন আপনাকে আপনি ঐরূপে জ্ঞানে উপলব্ধি করা সূত্রে (কর্ত্তা এবং ভোক্তা ত আছিই—অধিকন্তু) জ্ঞাতা হইয়া দাঁড়াই। আর, তখন আমি সেই কর্ত্তা, ভোক্তা এবং জ্ঞাতা পুরুষের নাম দিই আত্মা। এটা কিন্তু ভুলিলে চলিবেনা যে, কি জাগ্রৎকালে, কি সুষুপ্তি কালে, উভয় কালেই আমি একই কর্ত্তা—একই ভোক্তা। তার সাক্ষী সুষুপ্তি কালের অচেতন অবস্থাতেও আমি যথাক্রমে নিশ্বাস প্রশ্বাস আকর্ষণ এবং বিসর্জ্জন করি, সুতরাং তখনও আমি নিশ্বাস-প্রশ্বাস আকর্ষণ বিসর্জ্জনের কর্ত্তা; তা ছাড়া, আমার মন বলিতেছে

যে, তখনও আমি আরাম উপভোগ করি—তখনো আমি আরামের ভোক্তা।

অতএব এটা স্থির যে, কি জাগ্রৎকালে, কি সুষুপ্তিকালে, উভয়কালেই আত্মা কর্ত্তা এবং ভোক্তা। নিশ্বাসের আকর্ষণ তথৈব প্রশ্বাসের বিসর্জ্জন, এই দুই কার্য্যের কর্ত্তা; এবং তজ্জনিত স্বাস্থ্য-সুখের অর্থাৎ প্রাণগত আরামের ভোক্তা। তা ছাড়া—জাগ্রৎকালে একদিকে আমি যেমন কর্ত্তা ভোক্তা, আর একদিকে তেমনি আমি জানিতে পারি যে, আমি কর্ত্তা এবং ভোক্তা; জানিতে যখন পারি তখন কাজেই তৎকালে আমি জ্ঞাতা। কেহ যদি বলেন যে, সুষুপ্তিকালে আমি জানিতে পারি না যে, আমি কর্ত্তা বা ভোক্তা; জানিতে যখন পারি না—তখন সে সময় আমি যে সত্য সত্যই কর্ত্তা বা ভোক্তা, তাহার প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে আমি বলি এই যে, সুষুপ্তি-কালেও নিদ্রিত-ব্যক্তির জ্ঞান তলে তলে কার্য্য করে—সুষুপ্তিকালেও আত্মা জ্ঞাতা-পুরুষ। যদি বল যে, তাহার প্রমাণ কি? তবে বেদান্ত দর্শন তাহার যেরূপ প্রমাণ দর্শাইয়াছেন, তাহা বলিতেছি—তাহা একে আমাদের দেশের ঘরের সামগ্রী, তাহাতে এমনি নিখুঁত পরিষ্কার এবং সুসঙ্গত যে, তাহার উপরে কাহারো কোনো দ্বিরুক্তি হইতে পার না।

সৌষুপ্ত জ্ঞানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বৈদান্তিক প্রমাণ

(১) মূল কথা অর্থাৎ Major Premise

যে-কোনো বিষয় হউক না কেন, তাহার উপস্থিতি কালে তাহা যে ব্যক্তির সাক্ষাৎ জ্ঞানে প্রতিভাত না হয়, তাহার অনুপস্থিতি কালে তাহা সে-ব্যক্তির স্মরণে আবির্ভূত হইতে পারে না। তা'র সাক্ষী ;— শনিবারে যে দর্শক নাট্যাভিনয়-দৃষ্টে সাক্ষাৎ জ্ঞানে আনন্দ উপলব্ধি না করে, পর দিন

রবিবারে সে-দর্শকের স্মরণে "আমি গতকল্য নাট্যাভিনয় দর্শন করিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছি", এ কথাটি আবির্ভূত হইতে পারে না।

(২) দেখা কথা অর্থাৎ Minor Premise।

সুখ-নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিবার সময়, "আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম" এ-বৃত্তান্তটি সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির স্মরণে আবির্ভূত হয়।

(৩) ফল কথা অর্থাৎ Conclusion

অতএব প্রমাণ হইল যে, সুষুপ্তি সুখের উপস্থিতি-কালে সে সুখ সুষুপ্ত-ব্যক্তির সাক্ষাৎ-জ্ঞানে প্রতিভাত হয়।

ইতিপূর্ব্বে আমরা প্রমাণ করিয়াছিলাম যে, সুষুপ্তি-কালেও আত্মা কর্ত্তা এবং ভোক্তা দুইই; বেদান্ত দর্শনের উপরি-উক্ত যুক্তি অনুসারে অধিকন্তু প্রমাণ হইল এই যে, সে সময়ে আত্মা ভোক্তা তো আছেই, তা ছাড়া সে জানিতেছে যে, আমি ভোক্তা—জানিতেছে যে, আমি সুখ-ভোগে নিমগ্ন আছি। কেননা, সুখের ভোগের সময় যে ব্যক্তি জানে না যে আমি সুখ-ভোগ করিতেছি, সুখ-ভোগের পর্য্যবসান-কালে সে ব্যক্তির স্মরণ হইতে পারেনা যে, আমি সুখ-ভোগে নিমগ্ন ছিলাম। অতএব এটা স্থির যে, সুষুপ্তি কালে আত্মা জানিতেছে যে, "আমি ভোক্তা"। তবেই হইতেছে যে, সুষুপ্তি-কালেও আত্মা শুধু কেবল কর্ত্তা এবং ভোক্তা হইয়াই ক্ষান্ত নহে, অধিকন্তু আত্মা জ্ঞাতা।

এই তো দেখা গেল যে, সুষুপ্তি কালেও আত্মার জ্ঞান সমূলে বিলুপ্ত হয় না—সুষুপ্তি কালেও আত্মা জ্ঞাতা। এই সঙ্গে এটাও কিন্তু দেখা উচিত যে, জাগ্রৎ কালের জ্ঞান, স্বপ্নকালের জ্ঞান এবং সুষুপ্তি কালের জ্ঞান, তিন কালের জ্ঞান তিন প্রকার লক্ষণাক্রান্ত। সে তিন প্রকার জ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ কি; সে প্রভেদের গো'ড়ার কথাই বা কি অর্থাৎ সে প্রভেদের

কিসের উপরে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, এবং তাহার দৌড় কতদূর পর্য্যন্ত সে বিষয়ে আলোচনা করিয়া দেখা যাক্।

জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি।

জাগ্রৎ- কালে আমরা বিজ্ঞান-রাজ্যে বাস করি, স্বপ্ন-কালে মনোরাজ্যে বাস করি। বিজ্ঞান-রাজ্যের প্রদীপ বুদ্ধি ;—মনোরাজ্যের প্রদীপ কামনা। জ্ঞান কিন্তু এক বই দুই নহে। একই জ্ঞান বিজ্ঞান-রাজ্যের বুদ্ধি-প্রদীপ হইয়া বস্তু-সকলের ব্যাবহারিক সত্তায় আলোক প্রদান করে, এবং মনো-রাজ্যের কাম-প্রদীপ হইয়া বস্তু-সকলের প্রাতিভাসিক সত্তায় আলোক প্রদান করে। মনোরাজ্যের কাম-প্রদীপ এক প্রকার কাম-ধেনু। মনোরাজ্যে, তাই, যে যাহা অজ্ঞাতসারে কামনা করে, সেই অযাচিত সামগ্রী চক্ষু মুদিত করিয়া করতলে প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু কামনা-কামিনীটিকে সব সময়ে চেনা ভার। এক প্রকার কামনা আছে যাহা আশঙ্কার কনিষ্ঠা ভগিনী। তার সাক্ষী ;—একজন পথিক যদি পর্ব্বতের সানুমঞ্চের কিনারায় দাঁড়াইয়া গভীর নিম্নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তবে তাহার মনোমধ্যে পতনের আশঙ্কা তো জাগিয়া ওঠেই ; কিন্তু আশঙ্কা যেমন জাগিয়া ওঠে, তেমনি তাহার পিছন দিক হইতে পতনের জন্য এক প্রকার ব্যগ্রতা এক প্রকার অধীর কামনা "ঝাঁপ দিয়া পড়" বলিয়া বিভ্রান্ত পথিকটিকে যমালয়ের সোজা রাস্তা দেখাইয়া ত্যায়। এই প্রকার শঙ্কানুজা কামনা হইতে দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা জন্ম-গ্রহণ করে তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। স্বাপ্নিক বস্তু সকলও জ্ঞানের বিষয় —একথা সত্য ; কিন্তু তাহার গোড়ায় গলদ্—তাহা অবাস্তবিক। মোটা-মুটি বলিলাম "অবাস্তবিক ;" কিন্তু যদি কোন না-ছোড়-বন্দ সত্য-জিজ্ঞাসু আমাকে শক্ত-শক্তি করিয়া ধরেন, তবে আমার মুখ দিয়া প্রকৃত সত্য

কথাটি বাহির হইয়া পড়িবে। সে কথা এই যে, স্বপ্নের বস্তু-সকল দুই হিসাবে দুইরূপ ;—এক হিসাবে তাহা বাস্তবিক ; আর এক হিসাবে অবাস্তবিক। স্বাপ্নিক বস্তুর সত্তা যদি সর্ব্বাংশে অবাস্তবিক হইত, তবে তাহাকে "অবাস্তবিক" বলিলেই এক কথায় চুকিয়া যাইত। কিন্তু অত সহজে মামলা চুকিবার নহে। একথা কাহারো অবিদিত নাই যে, অন্ধ মিলটন আলোকের জাগ্রত স্বপ্নে পুলকিত হইয়া উল্লাস-ভরে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "Hail holy Light offspring of heaven first born" —অভিবাদন করি তোমায় পবিত্র আলোক ঈশ্বরের প্রথম-জাত সন্তান! মিল্টন যখন নিমীলিত-চক্ষে আলোকের এইরূপ সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছেন, তখন বুঝিতেই পারা যাইতেছে যে, সেই যে স্বাপ্নিক আলোক, যাহা তাঁহার মনশ্চক্ষুতে দেখা দিতেছে, তাহার বাস্তবিক সত্তা তাঁহার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দৃষ্টি-ক্ষেত্রে নাই ; আছে তাঁহার স্মৃতিক্ষেত্রে যদিচ অদৃশ্য ভাবে। যে ক্ষেত্রে যে ভাবে থাকুক না কেন—আছে তো? তবেই হইতেছে যে, স্বপ্নের দৃষ্ট বস্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অবাস্তবিক হইলেও, তাহা পরোক্ষ সম্বন্ধে বাস্তবিক—যে অংশে তাহা বাস্তবিক পদার্থের স্মৃতিগর্ভ, সে অংশে অবশ্যই তাহা বাস্তবিক। এইজন্য বলিতেছি যে স্বাপ্নিক বস্তু-সকলের সত্তাকে অবাস্তবিক না বলিয়া বলা উচিত প্রাতিভাসিক—দার্শনিক পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেনও তাই।

স্বপ্ন-কালের মনোরাজ্যে যেমন কামনা-মাতৃক, জাগ্রৎকালের বিজ্ঞান-রাজ্য তেমনি বুদ্ধি-মাতৃক ; আর, সেই বিজ্ঞান-রাজ্যের বস্তু-সকলের সত্তা ব্যাবহারিক সত্তা। সে সত্তার—অর্থাৎ দ্বৈতগর্ভা ব্যাবহারিক সত্তার—দুই পৃষ্ঠে অপর দুইবিধ সত্তার সংশ্লেষ রহিয়াছে স্পষ্ট। বিজ্ঞান-রাজ্যের বস্তু-সকলের এ পৃষ্ঠের সত্তা প্রাতিভাসিক সত্তা, ও-পৃষ্ঠের সত্তা বাস্তবিক সত্তা এবং সমগ্র অবয়বের সত্তা ব্যাবহারিক সত্তা। সাবধানী পোদ্দার যেমন

পরীক্ষিতব্য টাকার দুই পিট উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখে এখানে তেমনি বিজ্ঞান-রাজ্যের বস্তু-সকলের ব্যাবহারিক সত্তার দুই পিঠ এবং তাহার পরে তাহার সমগ্র অবয়ব একে একে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা বিধেয়; তাহারই এক্ষণে চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

(১) ব্যাবহারিক সত্তার

এ পিট

আমি যখন আমার সম্মুখে ঐ থামটা দেখিতেছি, তখন দেখিতেছি আর কিছু না—ঐ থামটার মধ্য হইতে উহার বাস্তবিক সত্তা বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই দেখিতেছি—উহার শ্বেতবর্ণ উন্নত স্থূল আকৃতি মাত্র দেখিতেছি। মনে কর, আমি ঐ থামটার বাস্তবিক সত্তা একেবারেই অগ্রাহ্য করিয়া শুদ্ধ কেবল উহার শ্বেতবর্ণ উন্নত স্থূল আকৃতির প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছি; একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে, মনে কর, আমার চক্ষে একপ্রকার তন্দ্রার ঘোর আসিল, আর, সেই গতিকে ঐ থামটা স্বপ্নের ন্যায় একটা প্রাতিভাসিক দৃশ্যমাত্রে পর্য্যবসিত হইল। এখন দেখিতে হইবে এই যে, ঐ থামটার সত্তা যদি সত্য সত্যই সেইরূপ একটা প্রাতিভাসিক সত্তা মাত্র হইত, তাহা হইলে, উহা যে এক মুহূর্ত্তে হাউই বাজি হইয়া হুস্ করিয়া উড়িয়া যাইবে না, অথবা বাঘ হইয়া গাঁ গাঁ করিয়া খাইতে আসিবে না, তাহার কোনো স্থিরতা থাকিত না। তা'র সাক্ষী—স্বপ্নের প্রাতিভাসিক রাজ্যে সবই বে-আইন বে-কানুন। সে রাজ্যে যে যাহা, সে তাহা নহে। সে রাজ্যে এই দেখিতেছি ভারাবনত মুমূর্ষ গর্দ্দভ, পরক্ষণেই দেখি যে, তাহা গর্দ্দভ নহে তাহা তেজঃস্ফীত অশ্ব; এই দেখিতেছি মাটি ঘেঁসা শূকর পরক্ষণেই দেখি যে, তাহা শূকর নহে—তাহা বর্ম্মাবৃত খড়্গায়ুধ গণ্ডার; এই দেখিতেছি মিউ-মিউকারী বিড়ালছানা, পরক্ষণেই দেখি যে তাহা

বিড়াল ছানা নহে তাহা ভীষণ ব্যাঘ্র। স্বপ্নের মুলুকে এই সকল অঘটন-ঘটনা কেমন অবলীলাক্রমে আমাদের নয়ন সমক্ষে হওয়া-যাওয়া করে! তখন তাহাদের বাস্তবিকতা সম্বন্ধে সংশয়ের বিন্দু-বিসর্গও আমাদের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে না। বুদ্ধি তখন কোথায়?—যে, তাহাকে বিভ্রান্ত করিবে? বুদ্ধি তখন অগাধ নিদ্রায় নিমগ্ন! প্রকৃত কথা এই যে, যে সময়ে আমরা স্বপ্নের মনোরাজ্যে বাস করি, সে সময়ে বাস্তবিক-অবাস্তবিকের কথা আমাদের মনেই আসে না। তার সাক্ষী;—আমি যদি কোন সময়ে আমার কোনো মৃত বন্ধুকে স্বপ্ন দেখি, তবে সে সময়ে আমার সে বন্ধু বাস্তবিকই জীবিত আছেন, কি না আছেন, একথা জিজ্ঞাসার বিষয় বলিয়াই মনে হয় না। কিন্তু তথাপি দুয়ের মধ্যে বিশেষ একটি প্রভেদ আছে; সে প্রভেদ এই যে, প্রকৃত স্বপ্নের অবস্থায় স্বপ্ন যে স্বপ্ন, তাহা জানিতে পারিবার কোনো উপায় নাই; পক্ষান্তরে জাগ্রৎ-স্বপ্নের অবস্থায় স্বপ্নের স্বপ্নত্ব বোদ্ধার নিকটে ধরা পড়িতে বিলম্ব হয় না।

(২) ব্যাবহারিক সত্তার ওপিট

আমি বেশ্ বুঝিতে পারিতেছি যে, ঐ থামটার ব্যাবহারিক সত্তা উহার বাস্তবিক সত্তাকে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আমার ইন্দ্রিয়ক্ষেত্রে প্রাতিভাসিক সত্তা ছড়াইতেছে; তার সাক্ষী, উহা আমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ে শ্বেতবর্ণ স্থূলাকৃতি এবং স্পর্শেন্দ্রিয়ে সংঘাত কাঠিন্য, দুই ইন্দ্রিয়ে এই যে দুই প্রকার ভোগ-সামগ্রী বাঁটিয়া দিতেছে, দুয়েরই সত্তা ঐ থামটার প্রাতিভাসিক সত্তা। এখানে থামটার বাস্তবিক-সত্তার সহিত তাহার ঐ দুই প্রকার প্রাতিভাসিক সত্তার সম্বন্ধ যাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা বস্তু-গুণের সম্বন্ধ। এই গেল একটা কথা—আর একটা কথা এই যে, কালে ঐ থামটার

গাত্রে শেয়ালা জমিয়া উহার শুভ্র গাত্র মলিন হইয়া যাইতে পারে, উহা জরা-জীর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া খসিয়া পড়িতে পারে, উহা জলে গলিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইতে পারে ; সবই হইতে পারে—কিন্তু কিছুই হইতে পারেনা বিনা কারণে। বিনা কারণে অতবড় ঐ থামটার একটি ক্ষুদ্রাৎক্ষুদ্র বালুকণাও পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। অতএব এটা স্থির যে ঐ থামটার বাস্তবিক সত্তা একদিকে যেমন উহার ভিতরে বস্তুরূপে স্থির হইয়াছে, আর একদিকে তেমনি কারণ-রূপে কার্য্য করিতেছে। এই গেল দ্বিতীয় কথা। তৃতীয় আর-একটি কথা এই যে, এক-একটি কারণের অগ্র পশ্চাতে অসংখ্য কার্য্য কারণের তরঙ্গমালা নিয়মের বাঁধে আট্‌কানো রহিয়াছে। এইজন্য, একদিক্ দিয়া যেমন কারণের ক্রিয়া কার্য্য-পরম্পরায় ভাঁটাইয়া চলিতে থাকে, আর একদিক্ দিয়া তেমনি কার্য্যের প্রতিক্রিয়া কারণ-পরম্পরায় বাহিয়া উঠিতে থাকে। তার সাক্ষী ; একদিকে, অনিল-হিল্লোল সরোবর-জলে তরঙ্গ-হিল্লোল উৎপাদন করে; আর এক দিকে পদ্মবন তরঙ্গ হিল্লোলকে প্রত্যাঘাত করে, তরঙ্গ হিল্লোল অনিল-হিল্লোলকে প্রত্যা-ঘাত করে। একদিকে যেমন ঐ থামটার উপরের চতুর্দ্দিক্ হইতে জল বায়ু প্রভৃতির ক্রিয়ার পশ্চাতে ক্রিয়া আসিয়া পড়িতেছে, আর একদিকে তেমনি থামটার স্বশক্তি হইতে প্রতিক্রিয়ার পশ্চাতে প্রতিক্রিয়া অদ্ভুত হইয়া জল-বায়ু প্রভৃতির ঘেরের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়া চলিতেছে। ফল কথা এই যে, একদিকে যেমন থামটার বাস্তবিক সত্তাকে লইয়া সমস্ত জগতের একই অখণ্ড বাস্তবিক সত্তা স্থির হইয়া আছে, আর একদিকে তেমনি থামটার বাস্ত-বিক সত্তা এবং অপরাপর সমস্ত বস্তুর বাস্তবিক সত্তা, এই দুই খণ্ড সত্তার পরস্পর বাধ্য-বাধকতা-সূত্রে দুয়ের মধ্যে ক্রমাগতই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলি-তেছে। ফলকথা এই যে, বিশ্বভুবনের মূলীভূত একই অখণ্ড বাস্তবিক সত্তা স্থির রহিয়াছে বস্তুরূপে ; ধাবমান হইতেছে কার্য্য কারণের প্রবাহরূপে রাশ

টানিয়া নিয়মে বাঁধিয়া রাখিয়াছে নিয়তিরূপে। নিয়তি আর কিছু না—বিধাতা পুরুষের নিয়ম। এমন অনেক রাজ-নিয়ম আছে, যাহা নিছক বলগর্ব্ব; যাহা নিয়ম-কর্ত্তার গায়ের জোর মাত্র; যাহার ভিতরে কোনো পদার্থ নাই—না আছে প্রেম; না আছে জ্ঞান, না আছে কিছু। কিন্তু বিধাতা-পুরুষের নিয়ম সে শ্রেণীর নিয়ম নহে। বিধাতা-পুরুষের অভ্রান্ত এবং অব্যর্থ নিয়মের ভিতরে বাহিরে তাঁহার ত্রৈকালিক জ্ঞানের অনিরুদ্ধ দৃষ্টি এবং বিশ্বব্যাপী প্রেমের অপরাজিত বল এক সঙ্গে জাগিতেছে; এক কথায়—তিনি আপনি জাগিতেছেন। আর একটি কথা এই যে, বিধাতা-পুরুষ আপনার সেই নিয়মের প্রবল প্রতাপান্বিত শক্তিকে আপনার অসীম করুণার আচ্ছাদনে এরূপ সুসংবৃত করিয়া রাখিয়াছেন যে, কেহই তাহা চর্ম্ম-চক্ষে দেখিতে পায় না; আর, জগতের লোক তাহা চর্ম্ম-চক্ষে দেখিতে পায় না বলিয়া তাহার নাম অদৃষ্ট। এখানকার যাহা প্রকৃত মন্তব্য কথা তাহা এই :—

প্রথমত নিখিল জগতের কার্য্যকারণ-প্রবাহ নিয়তির বাঁধে আট্‌কানো রহিয়াছে। দ্বিতীয় নিয়তির বাঁধ এবং কার্য্যকারণের প্রবাহ, দুই-ই বিশ্বভুবনের মূলীভূত একই অখণ্ড বাস্তবিক-সত্তার উপরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এখন দেখিতে হইবে এই যে, সেই যে একই অখণ্ড বাস্তবিক সত্তা, যাহা বিশ্বভুবনে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ওতপ্রোত রহিয়াছে, তাহাই জাগ্রৎ-কালের বুদ্ধি-বিজ্ঞানের প্রধানতম ভরসা এবং অবলম্বন-যষ্টি। বিশ্ব ভুবনে যদি বাস্তবিক-সত্তার গোড়া-বাঁধুনি না থাকিত, তাহা হইলে তর্কচ্ছলে যদি স্বীকারও করা যায় যে, সে অবস্থায় জগতের একপ্রকার স্বপ্নবৎ প্রাতি-ভাসিক সত্তা সম্ভাবনীয়, তথাপি এটা স্থির যে, সেরূপ অরাজক স্বপ্ন-রাজ্যে বুদ্ধি-বিজ্ঞান মুহূর্ত্তকালের জন্যও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিত না। তার সাক্ষী;—ঐ থামটা যদি সত্যসত্যই স্বপ্নের ন্যায় শুদ্ধ কেবল প্রাতিভাসিক

দৃশ্য মাত্র হয়, অর্থাৎ এরূপ যদি হয় যে, ঐ থামটার ভিতরে বাস্তবিক-সত্তা নাই—উহার গুণের ভিতরে বস্তু নাই—উহার সহিত অপর কোন বস্তুর কোনো প্রকার বাধা-বাধকতা নাই ; তাহা হইলে এখন যেন তুমি উহাকে থাম বলিতেছ—কিন্তু পর-মুহূর্ত্তে বিনা কারণে উহা যখন হাউই বাজি হইয়া হুস্ করিয়া উড়িয়া যাইবে, তখন উহার থামত্ব কোথায় রহিবে ? একটু পরেই আমরা দেখিতে পাইব যে, বুদ্ধির কার্য্যই হ'চ্চে বাস্তবিক-সত্তার সহিত প্রাতিভাসিক-সত্তার যোগ-সংঘটন। বাস্তবিক-সত্তাই যদি নাই তবে বুদ্ধি কাহার সহিত কাহার যোগ-সংঘটন করিবে ? পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বুদ্ধির বিষয়ীভূত বিজ্ঞান-রাজ্যের সত্তা ব্যাবহারিক-সত্তা, আর সেই ব্যাবহারিক-সত্তার এ পিটে প্রাতিভাসিক-সত্তা এবং ও পিটে বাস্তবিক-সত্তা, দুই পিটে দুই রূপ সত্তা সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। অতঃপব দ্রষ্টব্য এই যে, বুদ্ধির কার্য্যই হ'চ্চে দুয়ের যোগ-সংঘটন। দেখা যা'ক্ কিরূপ সে যোগ-সংঘটন।

(৬) ব্যাবহারিক সত্তার দুই পিটের যোগ-সংঘটন

"জাগ্রৎ-কাল আমাদের বুদ্ধির প্রাদুর্ভাব-কাল" এই কথাটি জন-সাধারণকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য অভিধানে জাগরিতাবস্থার আর-এক নাম দেওয়া হইয়াছে প্রবুদ্ধ অবস্থা এবং জাগ্রৎ-কালের আর এক নাম দেওয়া হইয়াছে প্রবোধ-কাল। ফল কথা এই যে; জাগ্রৎ-কালের বিজ্ঞান-রাজ্যেই বুদ্ধি নিজমূর্ত্তি ধারণ করে। স্বপ্নকালের মনোরাজ্যে বুদ্ধির খেলা যত কিছু দেখা যায়, সমস্তই খেলা-মাত্র, অভিনয় মাত্র ; এক প্রকার ছায়া বাজি ! তা বই, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে বুদ্ধির খেলা নহে। বুদ্ধির মুখ্যতম কার্য্য হ'চ্চে বস্তু চেনা। পণ্ডিতি ভাষায়—তাহারই নাম প্রত্যভিজ্ঞান (recognition) বেদান্তদর্শনের "সোহং দেবদত্তঃ" প্রত্যভিজ্ঞানের একটি

গোড়া ঘেঁ্যাসা উদাহরণ ; তা ছাড়া ইউরোপীয় দর্শনরাজ্যের গোড়ার কথা একটি এই যে, All cognition is recognition অর্থাৎ জ্ঞান-নামাই প্রত্যভিজ্ঞান। এখন, বুদ্ধির এই যে মুখ্য কার্য্য প্রত্যভিজ্ঞান, তাহার মুখের প্রতি একটু স্থিরচিত্তে ঠাহর করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ঐ যে প্রত্যভিজ্ঞান, ও টি বুদ্ধি-মাতার একপ্রকার শ্যাম-দেশীয় (Siamese) যমক-সন্তান। প্রত্যভিজ্ঞানের সমগ্র শরীরে—বাস্তবিক এবং প্রাতিভাসিক—এই দুই প্রকার সত্তা পিঠাপিঠি-ভাবে সংলগ্ন রহিয়াছে। মনে কর, পুষ্করিণীতে একটা হংস খেলিয়া বেড়াইতে দেখিয়া আমি বলিলাম "ও-টা রাজহংস" অর্থাৎ "ঐ হংস রাজহংস"। "ঐ হংস রাজহংস" এ কথাটি একটি মাত্র কথা—কিন্তু দুইখণ্ডে বিভক্ত। সে দুই খণ্ড হ'চ্চে— (১) ঐ হংস এবং (২) রাজহংস। এখন দেখিতে হইবে এই যে, যাহাকে আমি "ঐ হংস" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি, সেই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান হংসটির সত্তা বাস্তবিক সত্তা ; আর, রাজহংসের একটা ভাব বা আদর্শ, যাহা অনেকদিন হইতে আমার মনের মধ্যে জিয়ানো রহিয়াছে এবং এক্ষণে যাহা আমি প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বাস্তরিক হংসটার উপরে উপাধিচ্ছলে চাপাইয়া দিতেছি, তাহা আমার মানস-সরোবরের রাজহংস ; সুতরাং তাহার সত্তা প্রাতিভাসিক। এই যে আমি হংসের একবিধ সত্তার সঙ্গে আর একবিধ সত্তা জুড়িয়া দিলাম—বাস্তবিক সত্তার সঙ্গে প্রাতিভাসিক সত্তা জুড়িয়া দিলাম—ইহারই নাম বুদ্ধির খেলা। গুলি-ডাণ্ডা খেলা'তে যেমন গুলি এবং ডাণ্ডার সংস্পর্শ-সংঘটন আবশ্যক হয়, বুদ্ধির খেলা'তে তেমনি বিচার্য্য বস্তুর বাস্তবিক সত্তা এবং বিচারকের মনোগত আদর্শের প্রাতিভাসিক সত্তা, এই দুই প্রকার সত্তার যোগ সংঘটন আবশ্যক হয়। উপমাচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, বাস্তবিক সত্তা দক্ষিণ হস্ত, প্রাতিভাসিক সত্তা বাম হস্ত ; বুদ্ধির খেলা করতালি প্রদান। জাগ্রৎ-

কালের বিজ্ঞান রাজ্যে দুই হস্ত অনুক্ষণ একযোগে কার্য্য করিতে থাকে—কাজেই তালি বাজিতে থাকে অর্থাৎ বুদ্ধির খেলা চলিতে থাকে। আমি যদি আমার কটুরী-ঘরে চৌকি হেলান দিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া ইংলণ্ড ভাবি, তবে সেরূপ ভাবনা স্বপ্নের অনেকটা কাছাকাছি যায়, ইহা খুবই সত্য; কিন্তু আমি তখন সত্য সত্যই নিদ্রিত নহি, আমি তখন দিব্য সজাগ! আমি তখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি, যে, আমার শরীরের বাস্তবিক সত্তার সঙ্গে আমার আশ্রয়-চৌকির বাস্তবিক সত্তার যোগ রহিয়াছে; আশ্রয়-চৌকির বাস্তবিক সত্তার সঙ্গে কুটুরী-ঘরের বাস্তবিক সত্তার যোগ রহিয়াছে; কুটুরী-ঘরের বাস্তবিক সত্তার সঙ্গে বাড়ির ভিত্তিমূলের বাস্তবিক সত্তার যোগ রহিয়াছে; বাড়ীর ভিত্তিমূলের বাস্তবিক সত্তার সহিত কলিকাতা-পুরীর বাস্তবিক সত্তার যোগ রহিয়াছে; কলিকাতা পুরীর বাস্তবিক সত্তার সঙ্গে পূর্ব্ব-সমুদ্রের বাস্তবিক সত্তার যোগ রহিয়াছে; পূর্ব্ব-সমুদ্রের বাস্তবিক সত্তার সঙ্গে মহাসমুদ্রের বাস্তবিক সত্তার যোগ রহিয়াছে; মহাসমুদ্রের বাস্তবিক সত্তার সঙ্গে ইংলণ্ডের বাস্তবিক সত্তার যোগ রহিয়াছে। কিন্তু এই যে বাস্তবিক সত্তার অসংখ্য শ্রেণী পরম্পরা, ইহার গোড়ার কাহিনী অতীব স্বল্পায়ত ক্ষুদ্র বস্তু; তাহা আর কিছু না—আমার আপনাকে শুদ্ধ ধরিয়া এই কুটুরী-ঘরটির বাস্তবিক সত্তা; কেননা, তাহাই কেবল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছে। তদ্ব্যতীত আর যাহা কিছু আমার চিন্তার স্রোতে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, সমস্তেরই সত্তা প্রাতিভাসিক সত্তা। এখন কথা হ'চ্চে এই যে, সেই সকল চিন্তাগত বস্তু-সকলের প্রাতিভাসিক সত্তার সহিত আমার এই কুটুরী-ঘরটির বাস্তবিক সত্তার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশেষ কোনো প্রকার সম্পর্ক দৃষ্ট হইতেছে না বটে, কিন্তু তা বলিয়া আমার বুদ্ধি পরোক্ষ-সম্বন্ধে দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক পাতানো-কার্য্যের ঘটকতা করিতে ক্ষান্ত থাকিতে পারে না, আমার বুদ্ধির

নিকটে একথা অবিদিত নাই যে, আমার চিত্ত-গত প্রাতিভাসিক ইংলণ্ডের গোড়ার কথা হ'চ্চে বাস্তবিক ইংলণ্ড, আর সেই বাস্তবিক ইংলণ্ড হইতে আমার এই ক্ষুদ্র কুটুরী-ঘর পর্য্যন্ত বাস্তবিক সত্তার যোগ-সূত্র নিরবচ্ছেদে চলিয়া আসিয়াছে। আমার বুদ্ধি এটা বেশ্ জানে যে, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান কুটুরী-ঘরের বাস্তবিক সত্তা এবং সমস্ত জগতের বাস্তবিক সত্তা, মূলে একই বাস্তবিক সত্তা। ইহা জানিয়া আমার বুদ্ধি করিতেছে কি? না, প্রথমত আমার এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান কুটুরী- ঘরের বাস্তবিক সত্তাতেই সর্ব্বজগতের অখণ্ড এবং নিরবচ্ছিন্ন বাস্তবিক সত্তা উপলব্ধি করিতেছে; দ্বিতীয়ত আমার এই ক্ষুদ্র কুটুরীর বাস্তবিক সত্তাতেই বিশ্ব-ভুবনের বাস্তবিক সত্তা হস্তে পাইয়া সেই নিরবচ্ছিন্ন অখণ্ড বাস্তবিক সত্তার যোগে আমার চিত্ত-গত ইংলণ্ডের প্রাতিভাসিক সত্তার সহিত বাস্তবিক সত্তা জুড়িয়া দিতেছে। অতএব জাগ্রৎকালে আমি আমার মনোরথ-বিমানকে প্রাতিভাসিক সত্তার আকাশ-মার্গে যতই উচ্চে উড্ডীয়মান করাই না কেন—তাহার খুঁটি বাঁধা রহিয়াছে বাস্তবিক সত্তার সুদৃঢ় ভিত্তিমূলে—যদিচ সে ভিত্তিমূল দেখিতে অতি যৎসামান্য ক্ষুদ্র। সে ভিত্তিমূল কি? না, আমার আপনার এবং আমার সন্নিধানবর্ত্তী-প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিষয়-সকলের বাস্তবিক সত্তা। এইটি কেবল এখানে দেখা উচিত যে বাস্তবিক সত্তার সাক্ষ্যাকার-লাভ আমি যে কোনো স্থানেই করি না কেন—তিল-পরিমাণ স্থানেই তাহার সাক্ষাৎ লাভ করি, আর পর্ব্বত-পরিমাণ স্থানেই তাহার সাক্ষাৎ লাভ করি, যে-কোনো স্থানেই তাহার সাক্ষাৎ লাভ করি না কেন, সেই স্থান হইতেই তাহা নিখিল বিশ্বময় নিরবচ্ছেদে পরিব্যাপ্ত।

অনতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, জাগ্রৎ কালে বাস্তবিক এবং প্রাতিভাসিক দুইরূপ সত্তা এক যোগে কার্য্য করে বলিয়া বুদ্ধি রীতিমত

খেলিতে পায়। স্বপ্নকালে মনেরই কেবল দুয়ার খোলা থাকে—বুদ্ধির দ্বারে কপাট পড়িয়া যায়। স্বপ্নের মনোরাজ্যে যাহার যাহা কিছু সত্তা, সমস্তই প্রাতিভাসিক সত্তা। পূর্ব্বে একস্থানে উপমাচ্ছলে বলিয়াছি যে, বাস্তবিক সত্তা দক্ষিণ হস্ত; প্রাতিভাসিক সত্তা বামহস্ত এবং বুদ্ধির খেলা—করতালি-প্রদান। স্বপ্নের অর্দ্ধাঙ্গ-হীন শরীরে একাকী কেবল বাম হস্তই কার্য্য করে—প্রাতিভাসিক সত্তাই কার্য্য করে—কাজেই তালি বাজে না অর্থাৎ বুদ্ধি খেলে না। স্বপ্নাবস্থায় সিরাজুদ্দৌল্লার আমলের মৃতব্যক্তি জীবিতের অভিনয় করিয়া দর্শকের চক্ষের সম্মুখ দিয়া অনায়াসে পার পাইয়া যায়; দর্শক ভ্রমক্রমেও একবার আপনার মনকে জিজ্ঞাসা করে না যে, এ যাহা দেখিতেছি, ইহা বাস্তবিক কি অবাস্তবিক। অতএব পূর্ব্বে যে কথা বলিয়াছি, তাহাই ঠিক; সে কথা এই যে, স্বপ্ন-কালে বুদ্ধির খেলা যত কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা খেলা-মাত্র, অভিনয়-মাত্র;—এক প্রকার ছায়া-বাজি; তা বই, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে বুদ্ধির খেলা নহে। তবেই হইতেছে যে, বুদ্ধি জাগ্রৎকালের বিজ্ঞান রাজ্যেরই অধিপতি। স্বপ্ন-কালের মনোরাজ্যের অধিপতি নন। অতঃপর জিজ্ঞাস্য এই যে, সুষুপ্তি-কালের নিস্তব্ধতা রাজ্যের* অধিপতি কে? ইহার উত্তর এই যে, প্রাণ। সুষুপ্তিকালের নিস্তব্ধতা-রাজ্যে কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে দেখা যায় দুইটি মাত্র; কি দুইটি? না, প্রাণক্রিয়ার ব্যতিক্রম সংশোধন এবং শরীরের স্বাস্থ্য-সাধন।

অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, স্বপ্ন-কালের নকল-বুদ্ধি-ক্রিয়াতে যেমন জাগ্রৎ-কালের আসল-বুদ্ধি ক্রিয়ার প্রতিভাস বা ছায়া বা গন্ধ সংসক্ত থাকে, সুষুপ্তিকালের প্রাণ ক্রিয়াতে মনের ছায়া পড়াতে সুপ্ত ব্যক্তির নিদ্রা-সুখের উপভোগ হয়; আর, সেই নিদ্রা-সুখের উপরে বুদ্ধির ছায়া পড়া'তে সুষুপ্ত ব্যক্তির জ্ঞানে নিদ্রাসুখের অনুভব হয়। যাহাই হউক না কেন,

সুষুপ্তি কালের জ্ঞান জাগ্রৎকালের বুদ্ধির ন্যায় জাগ্রত জীবন্ত জ্ঞান নহে, ইহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। সে জ্ঞান তবে কিরূপ জ্ঞান? সে জ্ঞান যে কিরূপ জ্ঞান, তাহা বলিতেছি—শ্রবণ কর;—

এরূপ ঘটনা কিছুই বিচিত্র নহে যে, একজন কবি গড়েরমাঠের তরু-তলে বসিয়া কবিতা-রচনা-কার্য্যে এরূপ তন্মন-ভাবে লিপ্ত রহিয়াছেন এবং স্বরচিত কবিতা-রস মাধুর্য্যে এরূপ প্রগাঢ় নিমগ্ন রহিয়াছেন যে, তাহার সম্মুখ দিয়া একদল সিপাহী সৈন্য রণবাদ্য করিতে করিতে চলিয়া গেল—তাহা তিনি জানিতেও পারিলেন না। এরূপ অবস্থায় কবির জ্ঞান কবিতা-রচনা-কার্য্যে ভরপূর নিমগ্ন থাকাতে কোনো দিকেই যে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই, তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। কবিতা-রচনা-কালে কবির জ্ঞান যেমন অনন্য মানসে সেই কার্য্যেই নিমগ্ন থাকে—অথবা যেমন দুর্ব্বাসা ঋষির শাপ প্রদানের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে শকুন্তলার জ্ঞান দুষ্যন্ত রাজার ধ্যানে নিমগ্ন ছিল—সুষুপ্তি-কালে নিদ্রিত ব্যক্তির জ্ঞান তেমনি অতীব একটি সরস কার্য্যে নিমগ্ন থাকে; এমন ভরপূর নিমগ্ন থাকে যে, আর কোনো দিকেই তাহার দৃষ্টিপাত করিবার সামর্থ্য থাকে না। সে কার্য্য কি? না, প্রাণের ব্যতিক্রম সংশোধন করিয়া ঠিক পথে পরিচালনা কার্য্য। শকুন্তলা যেমন দুষ্যন্ত রাজাকে ভালবাসিতেন, বুদ্ধি তেমনি প্রাণকে ভালবাসে। সুষুপ্তি-কালে তাই নিদ্রিত ব্যক্তির বুদ্ধি প্রাণের স্বাস্থ্য সাধন কার্য্যে একান্তঃকরণে নিমগ্ন থাকে। ঐ কার্য্যটি যতক্ষণ পর্য্যন্ত চলে ততক্ষণ সুষুপ্তির আরাম অটুট থাকে। ঐ কার্য্যটি সাঙ্গ হইলেই নিদ্রাসুখের ভোগ-মাত্রা পর্য্যাপ্ত লাভ করে; ভোগ-মাত্রা পূর্ণ হইলেই নিদ্রা ভঙ্গ হয়।

এতক্ষণ ধরিয়া যে বিষয়ের আলোচনা করা হইল, তাহাতে জীবাত্মার জ্ঞানের তিন কালের তিন অবস্থার প্রভেদ বুঝিতে পারিবার পথ অনেকটা

পরিষ্কৃত হইয়াছে, এরূপ ভরসা হয়। এখন আমরা এটা অন্তত বুঝিতে পারিতেছি যে,—

(১) সুষুপ্তি-কালের জ্ঞান প্রাণ-ক্রিয়ার ব্যতিক্রম-সংশোধন-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে এবং তজ্জনিত আনন্দ-ভোগে নিমগ্ন থাকে।

(২) স্বপ্নকালের জ্ঞান মনোরাজ্যের প্রাতিভাসিক সত্তাতে ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকে।

(৩) জাগ্রৎকালের জ্ঞান, বিজ্ঞান-রাজ্যের ব্যাবহারিক সত্তার দুই পৃষ্ঠের অপর দুইরূপ সত্তার, ইহার সঙ্গে উহার যোগ-সংঘটন-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে।

অতঃপর তিন কালের জ্ঞানের তিন অবস্থা একসঙ্গে স্ফূর্ত্তি পাইবার সময় কোথায় কি ভাবে স্ফূর্ত্তি পায়, এবং পৃথক্ পৃথক ভাবে স্ফূর্ত্তি পাইবার সময় কোথায় কোথায় কি-কি ভাবে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া ছড়াইয়া পড়ে ইত্যাদি কতকগুলি বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে। আজিকের মত এই অবধিই ভাল।

জাগরিত অবস্থার বিশেষত্ব।

জীবাত্মার অবস্থা অনেক; তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গোড়া-ঘাঁসা অবস্থা তিনটি—(১) জাগ্রৎ, (২) স্বপ্ন এবং (৩) সুষুপ্তি। অবস্থা শব্দের মুখ্য অর্থ অবস্থিতি। অবস্থিতি দুইরূপ—(১) দেশে অবস্থিতি, (২) কালে অবস্থিতি, অবস্থা—শব্দের প্রচলিত ভাবার্থ—কালে অবস্থিত। যাহা আবির্ভূত হইয়া কিয়ৎকাল অবস্থিতি করে এবং তৎপরে তিরোহিত হয়, তাহারই নাম অবস্থা। সাধারণত অর্থাৎ মোটামুটি হিসাবে মনুষ্যের জাগরিত অবস্থার স্থিতিকাল পূর্ব্ব রাত্রি এবং শেষ রাত্রি; সুষুপ্ত অবস্থার স্থিতিকাল মধ্যরাত্রি। ঐ তিনটি মৌলিক অবস্থা একদিকে যেমন তিন

বিভিন্ন কালের তিন বিভিন্ন অবস্থা, আর এক দিকে তেমনি উহা একই অভিন্ন জীবাত্মার তিন বিভিন্ন অবস্থা। এটা যখন সুনিশ্চিত যে, ও-তিন অবস্থা একই জীবাত্মার তিনকালের তিন অবস্থা, তখন তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ও তিন অবস্থা পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্য যোগ-সূত্রে সংগ্রথিত। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে. জাগরিতাবস্থার কর্ম্মোত্তম ক্রমে ক্রমে অবসান প্রাপ্ত হইয়া নিদ্রার দিকে অল্পে অল্পে পা বাড়ায়; নিদ্রার আরামের মাত্রা ক্রমে ক্রমে অবসান প্রাপ্ত হইয়া জাগরণের দিকে অল্পে অল্পে পা বাড়ায়; পূর্ব্বরাত্রের স্বপ্ন সুষুপ্তির দিকে, এবং শেষরাত্রের স্বপ্ন জাগরণের দিকে অল্পে অল্পে পা বাড়ায়। জাগরণ এবং নিদ্রা এরূপ গায়ে গায়ে সংলগ্ন রহিয়াছে যে, নিদ্রার হ'ব হ'ব অবস্থার নামই জাগরণের যা'ব যা'ব অবস্থা, আর, জাগরণের যা'ব যা'ব অবস্থার নামই নিদ্রার হ'ব হ'ব অবস্থা। পূর্ব্ব রাত্রের জাগরন এবং নিদ্রার সন্ধিস্থান দেখ—দেখিবে যে, তাহা জাগরণের অন্ত এবং নিদ্রার আদি; শেষরাত্রের নিদ্রা এবং জাগরণের সন্ধি স্থান দেখ—দেখিবে যে, তাহা নিদ্রার অন্ত এবং জাগরণের আদি। দুই সন্ধিস্থানই না জাগরণ না নিদ্রা, অথবা জাগরণ এবং নিদ্রা দুইই একসঙ্গে। উভয়ের সন্ধিস্থান যখন না জাগরণ না নিদ্রা, তখন তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, নিদ্রা এবং জাগরণ স্বত কিছুই নহে—তাহা একই অভিন্ন জীবাত্মার বিভিন্ন রূপান্তর ঘটনা মাত্র। তা ছাড়া, তিন কালের তিন অবস্থার প্রত্যেকেরই গাত্রে একই অধিষ্ঠাতার নাম লেখা রহিরাছে স্পষ্ট;—তোমার তিন অবস্থার গাত্রেতোমার নাম লেখা রহিয়াছে, আমার তিন অবস্থার গাত্রে আমার নাম লেখা রহিয়াছে, দেবদত্তের তিন অবস্থার গাত্রে দেবদত্তর নাম লেখা রহিয়াছে। তবে কিনা—নীলবর্ণ আলেখ্য-পটে যেমন সোণার অক্ষর বেশী ফোটে, রূপার অক্ষর ফোটে কিন্তু তত না, লোহার অক্ষর আদবেই ফোটেনা; (রূপকচ্ছলে বলা যাইতে

পারে যে) সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির অন্তঃকরণ-পটে যখন তাহার নাম সূর্য্যরশ্মির সুবর্ণ লেখনী দিয়া সোণার অক্ষরে লিখিত হয়, তখন তাহা জল্-জল্ করিতে থাকে; অর্দ্ধসুপ্ত ব্যক্তির অন্তঃকরণ-পটে যখন তাহার নাম চান্দ্রমসী রজত-লেখনী দিয়া রূপার অক্ষরে লিখিত হয়, তখন তাহা ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা দ্যাখায়; সুষুপ্ত ব্যক্তির অন্তকরণ-পটে—তখন তাহার নাম নৈশ অন্ধকারের লৌহ-লেখনী দিয়া লোহার অক্ষরে লিখিত হয়, তখন তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। তার সাক্ষী—সজাগ ব্যক্তি স্পষ্ট বুঝিতে পারে যে "এ জাগরিত অবস্থা আমারই জাগরিত অবস্থা"। অর্দ্ধসুপ্ত ব্যক্তি এটা যদিচ বুঝিতে পারে যে, "এ যাহা আমি দেখিতেছি তাহা আমিই দেখিতেছি," কিন্তু তা বই এটা সে বুঝিতে পারে না যে, "আমি স্বপ্ন দেখিতেছি।" সুষুপ্ত ব্যক্তির জ্ঞান নিস্তব্ধতার ক্রোড়ে নিলীন হইয়া প্রাণের আরাম, মনের শান্তি এবং শরীরের আরোগ্য অনুভব করে, কিন্তু তথাপি এটা সে বুঝিতে পারে না যে, "আমি নিদ্রা যাইতেছি"। অতএব এটা যেমন সুনিশ্চিত যে, তিন অবস্থা একেরই তিন অবস্থা এটাও তেমনি সুনিশ্চিত যে, তিন অবস্থা যে একেরই তিন অবস্থা তাহা সুব্যক্ত হয় কেবল এক অবস্থায়; অপর দুই অবস্থায় তাহা অব্যক্ত থাকে। সুব্যক্ত হয় কোন্ অবস্থায়? না জাগরিত অবস্থায়। জাগরিত অবস্থাতে—কাহাকে বলে জাগরিতাবস্থা, কাহাকে বলে স্বপ্নাবস্থা, কাহাকে বলে সুষুপ্তাবস্থ, জ্ঞাতা পুরুষের নিকটে সুব্যক্ত হয়। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, জাগরিতাবস্থার মধ্যেই অপর দুই অবস্থা তলে তলে জানান দিতেছে; কেন না, জাগরিতাবস্থার মধ্যে যদি অপর দুই অবস্থার কোনো নিদর্শনই বিদ্যমান, না থাকিত তাহা হইলে জাগ্রৎকালে সে দুই অবস্থান সম্বন্ধে কোনো কথা চালিতে পারা দূরে থাকুক, কোনো কথা উঠিতেই পারিত না।

জাগ্রতকালের স্বপ্ন।

দৃশ্য-বীক্ষণ যন্ত্রের অভ্যন্তরে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলে এক প্রকার প্রাতিভাসিক দৃশ্য দর্শকের চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়। সে দৃশ্যের। ভিতরের ব্যাপারটা যে কি, তাহা বিজ্ঞানের কৃপায় অনেকেই আমরা বুঝি। কিন্তু আমরা বুঝিলে কি হইবে—আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয় বোঝে না। আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়কে আমরা যতই বুঝাইয়া বলি না কেন—যে, "তুমি যাহা দেখিতেছ, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা"—সে কিন্তু কিছুতেই আপনার গোঁ ছাড়ে না; সে বলে, "বাঃ! স্পষ্ট আমি দেখিতেছি অভ্রভেদী পর্ব্বত, স্রোতস্বতী নদী, পুষ্পিত উদ্যান-কানন, হংস-কারণ্ডবাকীর্ণ সরোবর, সুব্যবস্থিত রাস্তা-ঘাট-দেবালয়-প্রসাদ-উদ্যান-পুষ্করিণী-পরিশোভিত লোকালয়—তুমি বলিতেছ কি না 'সর্ব্বৈব মিথ্যা'! তোমার চক্ষুদুটিকে তুমি কোথায় রাখিয়া আসিয়াছ!" ইহার প্রত্যুত্তরে বুদ্ধি বলে যে, "তুমি দেখিতেছ এটা সত্য, কিন্তু যাহা দেখিতেছ তাহা মিথ্যা।" ইহারই নাম হর-পার্ব্বতীর কন্দল। হাজার হো'ক বুদ্ধি অবলা স্ত্রী, মন যণ্ডামার্ক গোঁয়ার। মনের গায়ের জোরের কাছে বুদ্ধি আঁটিয়া উঠিতে পারে না। বুদ্ধি বেচারী নিতান্তই দায়ে পড়িয়া, মন যাহা বলিতেছে তাহাই ঘাড় পাতিয়া লয়। বুদ্ধিমতী বুদ্ধি বলে, "সত্যি! কেমন দেখ বাগান! দিব্যি সোনালী রঙের চাঁপাফুল ফুটে' র'য়েচে! ঐ ফুলটি এনে দিয়ে আমাকে বাঁচাও! আমার বড্ড সাধ গিয়েছে—ঐ ফুলটিকে তুল্ ক'রে কানে পরি!" মন ফুল তুলিতে গিয়া দেখে যে, সে ফুলও নাই, সে উদ্যান ও নাই, সবই ভোঁ ভাঁ! মন তখন মনের খেদে বলে—"সাধে কি শাস্ত্রে লেখে স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী'! তাহার দৌড়কে বলিহারি! কঠোর পরীক্ষার নিকট হইতে কাণমলা খাইয়া সবেমাত্র এখন

আমার এইরূপ ধারণা হইতেছে যে, বুঝি বা সর্ব্বৈব মিথ্যা ; বুদ্ধির কিন্তু এক মুহূর্ত্তও ত্বর সহিল না—প্রথম উদ্যমেই বলিয়া বসিল 'সর্ব্বৈব মিথ্যা-' ! কালিদাস ঠিক্‌ই বলিয়াছেন যে, স্ত্রীজাতি অশিক্ষিত পটু অর্থাৎ না পড়িয়া পণ্ডিত !" প্রকৃত কথা এই যে, বুদ্ধি প্রথম উদ্যমেই ও-কথা বলে নাই ; বুদ্ধি গবাক্ষের দ্বারে উঁকি দিয়া মনকে অনেকবার ঐরূপ প্রতারিত হইতে দেখিয়াছে ; আর সেই ভূয়োদর্শনের ফলেই জানিতে পারিয়াছে যে, মন যাহা দেখিতেছে—সবই ফাঁকি। মনের ভ্রান্তিও একপ্রকার ভূয়োদর্শনের ফল। কিন্তু মনের ভূয়োদর্শন প্রকৃতপ্রস্তাবে ভূয়োদর্শন নহে, তাহা একপ্রকার অন্ধসংস্কার। এসম্বন্ধে পরে অনেক কথা বলিবার আছে ; এখানে এ যাহা স্বল্প ইঙ্গিত করিলাম—এই অবধিই ভাল। বর্ত্তমান স্থলে অন্ধ ভূয়োদর্শনের চক্রে পড়িয়া মন কিরূপে বিভ্রান্ত হয়, তাহার একটি নমুনা দেখাই—তাহা হইলেই মনের বিভ্রান্তি কোন্ পথ দিয়া যাতায়াত করে, তাহার কতকটা ঠিকানা পাওয়া যাইতে পারিবে।

দর্শক যখন সম্মুখবর্ত্তী দৃষ্টিক্ষেত্রে চক্ষু নিবিষ্ট করে, তখন সেই দৃষ্টি-ক্ষেত্রের ঈষৎ বিভিন্ন দুই দিকের ঈষৎ বিভিন্ন দুইখানি ছবি দর্শকের দুই নেত্রে নিপতিত হয়। ঐ-প্রকার ছবি-যুগলের ঈষৎ আকার-ভেদ, উভয়ের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন বস্তু-সকলের হ্রস্বদীর্ঘতার আপেক্ষিক পরিমাণ, এবং তাহাদের সঙ্গাশ্রিত ছায়াতাপের প্রতিযোগিতা, ইত্যাদি-ঘটিত কতক-গুলি চিহ্নের সহিত উক্ত বস্তুসকলের দূরত্ব-নৈকট্যের ভান ভূয়োদর্শনের সংস্কার-সূত্রে দর্শকের মনোমধ্যে ক্রমাগতই দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর রূপে বাঁধা পড়িয়া যাইতে থাকে। ঐ সকল সাঙ্কেতিক চিহ্নের কোন্-কোন্-গুলি কোন্ কোন্ বস্তুর গাত্রে কি-কি-ভাবে কি-কি পরিমাণে বিন্যস্ত রহিয়াছে, তাহা দর্শকের চক্ষে পড়িবামাত্রই দর্শকের মনে ধ্রুব প্রতীতি হয় যে,

অমুক বস্তু বেশী দূরে রহিয়াছে, অমুক বস্তু কম দূরে রহিয়াছে অমুক বস্তু খুব নিকটে রহিয়াছে ; আর, দর্শকের মনে ঐ যাহা প্রতীত হয়, দর্শক তাহাই চক্ষে প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করে। দৃশ্য-দর্শনকালে একই দৃশ্যের ঈষৎ বিভিন্ন দুই দিকের যেরূপ দুইখানি ছবি দর্শকের দুই চক্ষে সচরাচর নিপাতিত হয়, দৃশ্য-বীক্ষণ যন্ত্রের ছবি ঠিক তেমনিতর দুইখানি ছবি ; এইজন্য দর্শক সেই দুই ছবির ঈষৎ আকার-ভেদ, উভয়ের অন্তর্গত চিত্রিত বস্তুসকলের হ্রস্বদীর্ঘতার আপেক্ষিক পরিমাণ, এবং তাহাদের সঙ্গাশ্রিত ছায়াতাপের প্রতিযোগিতা, ইত্যাদি-ঘটিত বিশেষ বিশেষ সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখিবামাত্র তদনুসারে সেই সকল বস্তুর বিশেষ বিশেষ দূরত্ব-নৈকট্য অবধারণ করিতে অগত্যা বাধ্য হয় ; আর, সেইরূপে বাধ্য হইয়া আপনার চক্ষের সম্মুখে একটা বৃহৎ দৃশ্য-ব্যাপার উদ্ভাবন করে— আপনিই উদ্ভাবন করে, অথচ এটা সে ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে না যে, “আমি উদ্ভাবন করিতেছি।” এই কারণ-বশত দর্শকের মনোমধ্যে এই-রূপ একটা ভুরপনেয় ভ্রম জন্মে যে, যে যে বস্তু চক্ষের সম্মুখে যে যে স্থানে প্রতিভাত হইতেছে, বাস্তবিকই যেন সেই সেই বস্তু সেই সেই স্থানে অবস্থিতি করিতেছে। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে এই যে, স্বপ্নাবস্থায় দর্শকের মনের চিরাভ্যস্ত সংস্কার যেমন বুদ্ধির অসাক্ষাতে কার্য্য করিয়া নানাপ্রকার দৃশ্য উদ্ভাবন করে, জাগরিতাবস্থাতেও অবিকল তাহাই করে ; প্রভেদ কেবল এই যে, স্বপ্নাবস্থায় চিরাভ্যস্ত সংস্কার অবিতর্কিত-ভাবে যাহা প্রাণ চায়, তাহাই উদ্ভাবন করে, (এ একপ্রকার দিনে ডাকাতি ;) জাগরিতাবস্থায় মনোরাজ্যের স্বপ্ন বিজ্ঞানরাজ্যের প্রাচীরের আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া পুরবাসীদিগের চক্ষে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকে।

জাগ্রতকালের-সুষুপ্তি

নিদ্রাকালে আমরা যেরূপ আমাদের জ্ঞানের অসাক্ষাতে নিশ্বাস প্রশ্বাস আকর্ষণ-বিসর্জ্জন করি, এবং তজ্জনিত স্বাস্থ্যসুখ উপভোগ করি, জাগ্রৎ-কালেও সেইরূপ করিয়া থাকি। জাগ্রৎকালে দৈবাৎ কখনো নিশ্বাস-প্রশ্বাসের পরিচালনা-পথে কফাদির বিঘ্ন উপস্থিত হইলে, তবেই বা সে-দুই কার্য্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি পড়ে, নহিলে নিদ্রাকালেও যেমন—জাগ্রৎ-কালেও তেমনি—সে-দুই কার্য্য আমাদের জ্ঞানের অসাক্ষাতে স্বভাব-গুণে আপনা আপনিই চলিতে থাকে। ঘুমানো আর কিছুই না—প্রকৃতির অব্যক্ত সত্তাতে হাত পা ছড়াইয়া গা ভাসাইয়া দেওয়া। যখন নৌকা পা'ল পাইয়াছে—এবং অনুকূল স্রোত বহিতেছে—দাঁড়ি তখন ঘুমন্ত-ভাবে দাঁড় টানে। নৌকা যখন বেশ্ পা'ল পাইয়াছে, কিন্তু স্রোতের প্রতিকূলে চলিতেছে, দাঁড়ি তখন অর্দ্ধসুপ্ত-ভাবে দাঁড় টানে। যখন বায়ু এবং স্রোত দুইই প্রতিকূলে বহিতেছে, তখনই দাঁড়ি পূরামাত্রা জাগ্রৎভাবে দাঁড় টানে। তেমনি সচরাচর আমরা ঘুমন্ত-ভাবে নিশ্বাস-প্রশ্বাস আকর্ষণ-বিসর্জ্জন করি; তা বই, যখন আমরা মাত্রাতীত শারীরিক পরিশ্রম করিয়া হাঁপাইতে থাকি, তখনই কেবল আমরা জাগ্রত-ভাবে নিশ্বাস-প্রশ্বাস আকর্ষন-বিসর্জ্জন করিতে থাকি। সচরাচর আমাদের প্রাণ আমাদের জ্ঞানের অসাক্ষাতে আমাদের-হইয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাস আকর্ষণ-বিসর্জ্জন করে;—প্রাণের এইরূপ অব্যক্ত স্ফুর্ত্তির নামই (অর্থাৎ অচেতন স্ফূর্ত্তির নামই) সুপ্তি। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের পথে বিঘ্ন উপস্থিত হইলেই জ্ঞান প্রাণের হাতের কাজ আপনার হাতে টানিয়া লয়; তাহা যখন করে, তখন নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সুপ্তি ভাঙিয়া যায়। তবেই হইতেছে যে, জাগরিতাবস্থার মধ্যেও সুষুপ্তি তলে তলে আপনার রাজ্য চালায়; কোন্ রাজ্য? না প্রাণরাজ্য। ইতিপূর্ব্বে

আমরা দেখিয়াছি যে, জাগ্রৎকালে মনোরাজ্যের স্বপ্ন বিজ্ঞান-রাজ্যের প্রাচীরের আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া স্বকার্য্য সাধন করে; এক্ষণে অধিকন্তু দেখিতে পাইতেছি যে, প্রাণরাজ্যের সুষুপ্তি মনোরাজ্যের প্রাচীরের অড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া অব্যক্ত সত্তার তামস পরিচ্ছদ বয়ন করিতে থাকে। মোটকথা এই যে, জাগরণের কার্য্যক্ষেত্রে—উপরের কর্ম্মচারী উপরের কার্য্য করে, নীচের কর্ম্মচারী নীচের কার্য্য করে, মধ্যের কর্ম্মচারী মধ্যের কার্য্য করে; তা বই, কেহই চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না।

মনে কর, আমি একটা হাঁড়িতে আধসের দুগ্ধ, এক-সের ঘৃত এবং দুই-কুন্‌কে চাউল নিক্ষেপ করিয়া সেই তিন-দ্রব্য-সংবলিত হাঁড়িটা ঘরের এক কোণে রাখিয়া দিলাম। কিয়ৎপরে এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিলাম, "দেখিয়া আইস তো—উহাতে কি আছে।" সে বলিল, "ঘৃত আছে।" আমি বলিলাম "উহাতে আর কোনো সামগ্রী তো নাই?" সে বলিল, "আর তো কিছুই দেখিতে পাইলাম না।" সে দেখিতে না পা'ক্—আমি কিন্তু দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে, ঐ হাঁড়িটার উপরি-স্তরে ঘৃত রহিয়াছে, মধ্য-স্তরে দুগ্ধ রহিয়াছে, নিম্নস্তরে তণ্ডুল রহিয়াছে। তেমনি, আর কেহ দেখিতে পা'ক বা না পা'ক—যে দেখিতেছে, সে দেখিতেছে যে, জাগরিতাবস্থার উপরি-স্তরে বুদ্ধি ব্যাবহারিক সত্তাতে ব্যাপৃত রহিয়াছে; মধ্যস্তরে মন প্রাতিভাসিক সত্তাতে ব্যাপৃত রহিয়াছে; নিম্নস্তরে প্রাণ অব্যক্ত সত্তাতে ব্যাপৃত রহিয়াছে। জাগরিতাবস্থা এবং স্বপ্নাবস্থার মধ্যে প্রধান একটি প্রভেদ এই যে প্রাতিভাসিক সত্তা জাগরিতাবস্থার মধ্যস্তরে চাপা থাকে, স্বপ্নাবস্থায় তাহা উপরি স্তরে ভাসিয়া ওঠে। তেমনি আবার জাগরিতাবস্থা এবং সুষুপ্ত অবস্থার মধ্যে প্রধান একটি প্রভেদ এই যে, অব্যক্ত সত্তা জাগরিতাবস্থার নিম্নস্তরে চাপা থাকে, সুষুপ্ত অবস্থায় তাহা উপরিস্তরে ভাসিয়া ওঠে।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত একই সীধা রাস্তা অবলম্বন করিয়া পদব্রজে সটান চলিয়া আসিয়াছি। এখন যে স্থানটিতে পৌঁছিয়াছি—এ-স্থানটি অনেকগুলা পথের সঙ্গম স্থান ; তাহার মধ্যে কোন্ পথ আপাততঃ অবলম্বনীয়, তাহা বিবেচনার বিষয়। এই সঙ্গমস্থানটিতে পদার্পণ করিবামাত্র আলোচককে একটু থমকিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে হইতেছে। এই স্থানটির নানা-দিক্ হইতে নানা-ভাবের ত্রিক আসিয়া যখন-তখন আলোচকের সম্মুখে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে ; সময়ে সময়ে সেগুলাকে সাম্‌লানো ভার হইয়া পড়ে। আশ্চর্য্য এই যে, যেমন 'সব শেয়ানের একই রা', তেমনি সব ত্রিকেরই ভিতরের কথা একই ধরণের। একটি ত্রিকের চাবি পাইলেই তাহা দিয়া সব ত্রিকেরই ডালা খোলা যায়। আলোচিতব্য ত্রিকগুলি নিম্নে পংক্তি সাজাইয়া প্রদর্শন করা হইল।

ত্রিক-সপ্তক।

(১)	প্রাণ	মন	বুদ্ধি।
(২)	উদ্ভিদ্	জন্তু	মনুষ্য
(৩)	সুষুপ্তি	স্বপ্ন	জাগ্রৎ
(৪)	প্রলয়	সৃষ্টি	স্থিতি
(৫)	অব্যক্ত সত্তা	প্রাতিভাসিক সত্তা	ব্যাবঃ সত্তা
(৬)	ভোগ	কর্ম্ম	জ্ঞান
(৭)	তম	রজ	সত্ত্ব।

এই পংক্তি-সপ্তকের মধ্যে মোটামুটি যে একপ্রকার সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা তো দেখিতে পাওয়া যাইতেইছে ; তা ছাড়া তাহার মধ্যে অনেকগুলি নিগূঢ় রহস্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সে গুলির ভিতরের

সমাচার সংগ্রহ করিতে হইলে, নিগূঢ়তত্ত্বের সমুদ্রে ডুব দিতে ভয় করিলে চলিবে না। বারান্তরে চোখ-কাণ বুজিয়া ডুব দেওয়া যাইবে—এবারে এইখানেই ইতি করা যাউক্।

তিনে এক, একে তিন।

ত্রিকের কথা উপস্থিত হওয়াতে তাহার গোটাকত নমুনা যাহা দেখানো হইয়াছিল তাহা এইরূপ :—

(১)	(২)	(৩)
প্রাণ	মন	বুদ্ধি
উদ্ভিদ্	মূঢ়জীব	মনুষ্য
সুষুপ্তি	স্বপ্ন	জাগ্রৎ
তম	রজ	সত্ত্ব
		ইত্যাদি।

ত্রিক দুই অক্ষরের শব্দ বই নয়, কিন্তু তাহার গুরুত্ব নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কুলায় না। বলা যাইতে পারে যে, তত্ত্বরত্নাগারের চাবি একটিমাত্র; আর সে চাবি ত্রিক। ত্রিকের দৌড় সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছে—কোথাও তাহার পরিসমাপ্তি নাই।

ত্রিকের অভিব্যক্তির পথ একটি চক্রাকৃতি সোপান; আর তাহারই নাম ব্রহ্মাণ্ড চক্র; সংক্ষেপে—ব্রহ্মচক্র।

ব্রহ্মচক্রের দুইটি ক্রম—(১) নাবিবার ক্রম বা সৃষ্টির ক্রম বা অনুলোম-ক্রম এবং (২) উঠিবার ক্রম বা সাধনের ক্রম বা প্রতিলোম-ক্রম। অনুলোম-ক্রমের গতি সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের দিকে; প্রতিলোম-ক্রমের গতি স্থূল হইতে সূক্ষ্মের দিকে।

বলিলাম "দুই ক্রম"; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহা দুই নহে; তাহ

একই ক্রমের দুই অর্দ্ধাঙ্গ। একদিন + একরাত্রি = দুই দিন নহে, পরন্তু তাহা একই দিনের দুই অর্দ্ধাঙ্গ; তেমনি অনুলোম ক্রম + প্রতিলোম-ক্রম = একই ক্রমের দুই অর্দ্ধাঙ্গ; কতকগুলি বিষয় এখানে সবিশেষ দ্রষ্টব্য।

প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, সমগ্র ত্রিক-শ্রেনী একটি চক্রাকার সোপান। দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, ত্রিকগুলি গোল সিঁড়ির ধাপের ন্যায় উপচক্র-পরম্পরা এক-এক ত্রিক এক এক চক্রের ফের।

তৃতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, সমগ্র ত্রিক-চক্র দুই ভাগে বিভক্ত; সে দুই ভাগ দুইটি গোল সিঁড়ি। একটি গোল সিঁড়ি নাবিবার সিঁড়ি, আর একটি গোল সিঁড়ি উঠিবার সিঁড়ি। প্রথম গোল সিঁড়িতে ত্রিক-শ্রেণী ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাবিয়া চলিয়াছে, দ্বিতীয় গোল সিঁড়িতে ত্রিক-শ্রেণী ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাহিয়া উঠিয়াছে। ঐ দুইটি গোল সিঁড়তে যথাক্রমে নাম দেওয়া যাইতে পারে (১) অনুলোম-সোপান এবং (২) প্রতিলোম সোপান।

চতুর্থ দ্রষ্টব্য এই যে, যেমন রজনীর সমাপ্তিই দিবসের আরম্ভ এবং দিবসের সমাপ্তিই রজনীর আরম্ভ, তেমনি অনুলোম-সোপানের সমাপ্তিই প্রতিলোম-সোপানের আরম্ভ এবং প্রতিলোম-সোপানের সমাপ্তিই অনুলোম-সোপানের আরম্ভ। ইহা হইতে আসিতেছে এই যে, রজনীর শেষাংশ যেমন দিবসের প্রথমাংশে গিয়া ঠ্যাকে, তেমনি প্রতিলোম-সোপানের শেষ ত্রিক অনুলোম-সোপানের প্রথম ত্রিকে গিয়া ঠ্যাকে। অনুলোম-সোপানের প্রথম ত্রিক কি? না,—সৎ, চিৎ, আনন্দ; প্রতিলোম-সোপানের শেষ-ত্রিক কি? না,—প্রাণ, মন, বুদ্ধি। দুয়ের সংশ্লেষ কোথায়? না,—যেখানে প্রাণ-মন-বুদ্ধির চরম উৎকর্ষ সৎ-চিৎ-আনন্দে গিয়া পর্য্যাপ্তি লাভ করে।

অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, কি কি গোড়ার ত্রিক, কি মাঝের ত্রিক কি শেষের ত্রিক, সকল ত্রিকেরই ভিতরকার কল একইপ্রকার। সে কলের

মুখ্য অবয়ব তিনটি—(১) শান্তি, (২) প্রতিযোগ, (৩) সংযোগ ; আর, সে কলের গতি তাহার ঐ তিন অবয়বের মধ্যেই আবদ্ধ। সে গতি এইরূপ :— শান্তি হইতে প্রতিযোগে, প্রতিযোগ হইতে সংযোগে, সংযোগ হইতে নূতন শান্তিতে, নূতন শান্তি হইতে নূতন প্রতিযোগে, নূতন প্রতিযোগ হইতে নূতন সংযোগে, নূতন সংযোগ হইতে নবতর শান্তিতে ; ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ত্রিকের ঐ যে ভিতরকার কল, উহা একপ্রকার রূপক-তাল। রূপক-তালের অঙ্গ তিনটিমাত্র—দুই তাল এবং এক ফাঁক। দুই তাল হ'চ্চে প্রতিযোগ এবং সংযোগ, আর, এক ফাঁক হ'চ্চে শান্তি।

সকল ত্রিকের ভিতরকার কল যেহেতু একই-প্রকার, এইজন্য আদি এবং অন্ত, এই দুই মুড়ার দুই ত্রিকের প্রতি আপাতত লক্ষ্য নিবদ্ধ করিয়া সেই দুই ত্রিককে মাঝখানের আর আর ত্রিকশ্রেণীর আদর্শরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। আমি এক্ষণে তাহাই করিব ; তাহার পরিবর্তে গোড়াতেই যদি আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ত্রিকের গোলক-ধাঁদায় প্রবেশ করিয়া আপনিও বিভ্রান্ত হই এবং পাঠকবর্গকেও বিভ্রান্ত করিয়া তুলি, তাহা হইলে একূল ওকূল দুকূল যাইবে ; তাহাতে কাজ নাই। আপাতত এই-রূপ মনে করা যা'ক্ যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ত্রিক যেন তাহার দুই মুড়া'র দুই ত্রিকেই পরিসমাপ্ত ; সৎ, চিৎ, আনন্দ—এই এক ত্রিক, এবং প্রাণ, মন, বুদ্ধি—এই আরেক ত্রিক, এই দুই ত্রিকেই পরিসমাপ্ত। তাহা হইলে সংক্ষেপে দাঁড়াইবে এই যে, সৎ-চিৎ-আনন্দ হইতে প্রাণ-মন-বুদ্ধিতে অব-তরণ করিবার ক্রম অনুলোম-ক্রম, এবং প্রাণ-মন বুদ্ধি হইতে সৎ-চিৎ-আনন্দে উত্থান করিবার ক্রম প্রতিলোম-ক্রম। উপনিষৎশাস্ত্রেও আছে —"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে"—আনন্দ হইতেই সমস্ত ভূত জন্মগ্রহণ করে ; * * * "কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ"—কে বা প্রাণধারণ করিত, কাহারই বা প্রাণস্ফূর্ত্তি হইত,

যদি এই আনন্দ আকাশে না থাকিতেন। অতএব আনন্দ হইত অনুলোম-ক্রমে প্রাণ অভিব্যক্ত হইয়াছে, এ কথা শাস্ত্র এবং যুক্তি উভয় সম্মত। এ কথাও তেমনি উভয়-সম্মত যে, প্রাণ মন-বুদ্ধি প্রতিলোম-ক্রমে সৎ-চিৎ-আনন্দে উত্থান করিতেছে। সর্ব্বপ্রথমে প্রথম ত্রিকের অবয়ব-পারিপাটা এবং ভিতরকার কল কিরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যা'ক্।

আমার সম্মুখে মনে কর একখণ্ড কাগজ উড়িয়া পড়িল। বলিলাম "এক খণ্ড"; কিন্তু সেই একের মধ্যে তিন রহিয়াছে; তার সাক্ষী— (১) এ পিট (২) ও পিট এবং (৩) দুই পিটের-উভয়-সাধারণ চারিধার। তেমনি সত্য এক; কিন্তু সেই একের মধ্যে তিন রহিয়াছে—সৎ রহিয়াছে, চিৎ রহিয়াছে আনন্দ রহিয়াছে। এরূপ কাগজ কেহ কখনো চক্ষে দেখেও নাই, দেখিতে পাইবেও না—যাহার এ-পিট আছে, ও-পিট নাই; ও-পিট আছে এ-পিট নাই; অথবা দুই পিটই আছে, কিন্তু উভয়-সাধারণ পরিধি (Periphery) নাই। তেমনি এরূপ সত্য কেহ কখনো জ্ঞানে বা ধ্যানে উপলব্ধি করিতে পারেও না, পারিবেও না, যে-সত্যের অস্তি (অর্থাৎ সত্তা) আছে, ভাতি (অর্থাৎ প্রকাশ) নাই; ভাতি আছে, অস্তি নাই, অথবা অস্তি-ভাতি দুইই আছে, কিন্তু দুয়ের মধ্যে কোনো-প্রকার ঐক্যের বন্ধন নাই। কেমন করিয়াই বা সেরূপ অঙ্গহীন সত্যের উপলব্ধি সম্ভব হইবে?—মূলেই যাহার ভাতি নাই, কাহারো নিকটে কস্মিন্ কালেও যাহার প্রকাশ নাই—প্রকাশের সম্ভাবনাও নাই, তাহাকে "আছে" বলিলে কি বুঝায়? শুদ্ধ কেবল আ এবং ছে এই দুই অক্ষর বুঝায়, তাহা ছাড়া আর কিছুই বুঝায় না। যাহার ভাতি আছে, অস্তি নাই, তাহাই বা কিরূপ সত্য? "মাথা নাই, মাথা-ব্যথা" যেরূপ সত্য, "অস্তি নাই ভাতি" ঠিক্ সেইরূপ সত্য, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। তুমি বলিতেছ, "অস্তি আবার কি—সবই তো ভাতি", তোমার একথা যদি সত্য হয়, তবে তুমি আবার কে—সবই তো তোমার

মুখের কথা! ফলে, সূর্য্য নাই, দিবালোক আছে এবং অস্তি নাই, ভাতি আছে, এ দুই কথা একই ধরণের কথা; দুইয়ের কোনটিরই অর্থ ঘুণাক্ষরে-ও কাহারো বোধগম্য হইবার নহে। যদি বল যে, অস্তিও আছে, ভাতিও আছে, কিন্তু দুয়ের মধ্যে কোনোপ্রকার ঐক্যের বন্ধন নাই—যোগ-সূত্র নাই—সম্বন্ধ নাই—তবে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—ভাতি যে, সে কাহার ভাতি? অস্তিরই তো ভাতি! অস্তি যে, সে কাহার অস্তি? যাহা প্রকাশ পাইতেছে, তাহারই তো অস্তি—ভাতিরই তো অস্তি! তবে আর কেমন করিয়া বলিব যে, অস্তি এবং ভাতির মধ্যে কোনো প্রকার ঐক্যের বন্ধন নাই—সম্বন্ধ নাই। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, অস্তি এবং ভাতির মধ্যে সেই যে বন্ধনের আঁট, তাহা কি? ইহার উত্তর এই যে, তাহা আনন্দ। এ যাহা বলিতেছি, ইহার প্রথম উপমাস্থল—পিতা মাতার সহিত পুত্রকন্যা-দিগের ঐক্যবন্ধন এবং তৎসংক্রান্ত আনন্দ। পৈত্রিক ঐক্যবন্ধন প্রকৃত প্রস্তাবেই ঐক্যের (কিনা—একত্বের) বন্ধন; কেননা, পুত্রকন্যারা পিতা মাতার শরীর-মন লইয়াই জন্মগ্রহণ করে; পুত্রকন্যারা পিতামাতার সাক্ষাৎ ভাতি (কিনা—আবির্ভাব)। বর্ত্তমান বিষয়ের দ্বিতীয় উপমাস্থল—ভ্রাতায় ভ্রাতায় ঐক্যবন্ধন এবং তৎসংক্রান্ত আনন্দ; এ ঐক্যবন্ধন বিভিন্নের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন; তৃতীয়-উপমাস্থল—পতিপত্নীর ঐক্যবন্ধন এবং তৎসংক্রান্ত আনন্দ; এ ঐক্যবন্ধন বিপরীতের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন। এই তিনপ্রকার ঐক্যবন্ধন মনুষ্য সমাজের গোড়ার বাঁধুনি, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাই-তেছে; অধিকন্তু এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, তিনই অস্তি এবং ভাতির ঐক্য-বন্ধন। পিতামাতা পুত্রকন্যাতে আপনারই ভাতি দেখেন; ভ্রাতারা পরস্পরের আকার-প্রকার-ভাব ভঙ্গীতে আপনাদের ভাতি দেখেন; স্বামী-স্ত্রী আপনা-দিগের উভয়কে পরস্পরের সহিত অভেদ দেখেন, স্বামী স্ত্রীতে আপনার ভাতি দেখেন, স্ত্রী স্বামীতে আপনার ভাতি দেখেন। বিশেষত দম্পতির

ঐক্যবন্ধনে আনন্দ অতীব সুপরিস্ফুট ভাব ধারণ করে; আর, তাহা যে করে, তাহার বিশেষ একটি কারণ আছে; সে কারণ আর কিছু না—প্রতিযোগের মধ্য দিয়া, সংযোগের অভিব্যক্তি! এ যাহা বলিলাম, ইহার যৎকিঞ্চিৎ টীকা করা আবশ্যক; তাহা এইঃ—

পুত্রকন্যা পিতামাতার নিতান্তই আপনার। যাহা আপনার, তাহাতে আপনার ভাতি দেখিতে পাওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ভ্রাতা-ভগিনীরা এক মায়ের গর্ত্তজাত, কাজেই পরস্পরের আকার প্রকার, ভাব-ভঙ্গী এবং আচার-ব্যবহারের দর্পণে পরস্পরের মুখ দেখিতে পাওয়া, তাহাদের পক্ষেও কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পক্ষান্তরে এক পিতা-মাতার পুত্র এবং আর-এক পিতামাতার কন্যা, দোঁহে দোঁহার নিতান্তই পর; তাহা সত্ত্বেও যে স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে দ্বিতীয় আপনি বা আপনার অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করেন; হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্ত্রী স্বামীতে এবং স্বামী স্ত্রীতে আপনার ভাতি দর্শন করেন, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। বর-কন্যার শুভদৃষ্টি একপ্রকার ভাতি-বিনিময় অর্থাৎ পরস্পরের নয়ন-দর্পণে পরস্পরকে দেখা; নিতান্ত পরব্যক্তির নয়ন-দর্পণে আপনাকে দেখা, ইহারই নাম প্রতিযোগের মধ্য দিয়া সংযোগের সংঘটন। দাম্পত্য-বন্ধনে প্রতিযোগের সংশ্লেষে সংযোগ সুপরিস্ফুট হয় বলিয়া, সে বন্ধনে আনন্দ সর্ব্বাপেক্ষা ঘনীভূত ভাব ধারণ করে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, অস্তি এবং ভাতির ঐক্যবন্ধন আনন্দেরই প্রস্রবণ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সকল ত্রিকেরই ভিতরকার কল একই-প্রকার; ইহাও বলিয়াছি যে, সে কলের মূল অবয়ব তিনটি—(১) শান্তি, (২) প্রতিযোগ, এবং (৩) সংযোগ; এই তিনটি অবয়ব মূল ত্রিকে অতীব সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে; তার সাক্ষী ঃ—

প্রথমত সৎ অর্থাৎ নিত্য সত্য চিরকালই সমান। এই যে অপরিবর্ত্তনীয়

নিত্য সত্যের ভাব বা সত্যের ভাব, এই প্রথম ভাবটি শান্তি-প্রধান, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। দ্বিতীয়ত অসতের প্রতিযোগে সতের, এবং সতের প্রতিযোগে অসতের যে প্রকাশ, তাহারই নাম চিৎ বা জ্ঞান; কাজেই বলিতে হইতেছে যে, চিৎ প্রতিযোগ-প্রধান। কেহ বলিতে পারেন যে, ছায়ার উপলব্ধি আলোকের প্রতিযোগিতা সাপেক্ষ, এ কথা স্বীকার করি; কিন্তু আলোকের উপলব্ধিও যে ছায়ার প্রতিযোগিতা সাক্ষেপ, তাহা কে বলিল? একটা ঘর যখন দীপালোকে আলোকিত হয়, তখন সেই আলো-কের প্রত্যেক ছেদ-স্থানেই ছায়া নিপতিত হয়, কোথাও বা ঘনচ্ছায়া নিপতিত হয়, কোথাও বা অর্দ্ধছায়া নিপতিত হয়; তা ছাড়া ঘরের মধ্যে দীপালোক অপেক্ষা মলিন বর্ণের বস্তু যত কিছু আছে, যেমন আবলুষ কাঠ, সবুজ কাপড় ইত্যাদি, তাহাও ছায়ারই সামিল। ফলকথা এই যে, আমাদের চক্ষের সম্মুখে যদি কেবলমাত্র একরঙা আলোক নিত্যনিয়ত বর্ত্তমান থাকিত, আর তাহার কোনোস্থানে যদি কোনোপ্রকার রঞ্জন বা অঞ্জনের সংস্পর্শ না থাকিত, তাহা হইলে হইত এই যে, আমরা যেমন শতমণ বায়ুর ভার মস্তকের উপরে অষ্টপ্রহর বহন করিয়াও তাহার সরিষা ভোরও উপলব্ধি করিনা, তেমনি আমাদের চক্ষুর উপরে অষ্টপ্রহর আলোকের বর্ষণ হইলেও আমরা তাহার কণামাত্রও উপলব্ধি করিতে পারিতামনা। যেখানেই আমরা সূর্য্যাতপ বা চন্দ্রাতপ দেখি, সেই খানেই তাহার আশে পাশে ছেদ-স্থানে এবং সীমাপ্রদেশে ছায়া বা বর্ণমালিন্য সংলগ্ন দেখি, আর সেই ছায়া বা বর্ণ-মালিন্য সংলগ্ন দেখি বলিয়া তাহারই প্রতিযোগে সূর্য্যাতপ বা চন্দ্রাতপ দেখিতে পাই নচেৎ দেখিতে পাইতাম না।

অতএব এটা সুনিশ্চিত যে, ছায়ার প্রতিযোগে আলোকের প্রকাশ সম্ভবে; অসতের প্রতিযোগেই সতের প্রকাশ সম্ভবে; আর সতের সেই যে প্রকাশ, তাহার নাম চিৎ বা জ্ঞান। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে,

সৎ শান্তিপ্রধান, চিৎ প্রতিযোগ-প্রধান। অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে আনন্দ সংযোগ-প্রধান। একদিকে সতের প্রশান্তি এবং অচল-প্রতিষ্ঠা, আর-এক দিকে চিতের উপক্রান্তি এবং প্রকাশ; এই দুয়ের ঐকতানিক সংযোগেই আনন্দের উৎস। গোড়া'র ত্রিকের ভিতরে রূপকতালের তরঙ্গ-লীলা এ যেমন দেখিতে পাওয়া গেল—শেষের ত্রিকের ভিতরে উঁকি দিয়া দেখিলে অবিকল তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়।

শেষের ত্রিক হ'চ্চে—(১) প্রাণ, (২) মন, (৩) বুদ্ধি। কল-প্রধান শতাব্দীর (Mechanical age এর) এক কথায়—কলিযুগের—প্রধান একজন তত্ত্ববিশারদ পণ্ডিত (আর কেহ নহেন—স্পেন্সর) প্রাণের সংজ্ঞা-নির্ব্বাচন করিতে গিয়া বিভ্রান্তির তরঙ্গকল্লোলে হাবুডুবু খাইয়াছেন! হাবুডুবু খাইবারই কথা। প্রাণকে বুদ্ধি এবং মন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে গিয়াছেন—কাজেই হাবুডুবু খাইয়াছেন। তিনি যদি সর্ব্বাগ্রে বুদ্ধিকে ধরিতেন, আর তাহার পরে মনকে অর্দ্ধপরিস্ফুট বুদ্ধি, এবং প্রাণকে অর্দ্ধপরিস্ফুট মন করিয়া অবধারণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে হাবুডুবু খাইতে হইত না; কিন্তু তিনি ঠিক্ তাহার বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়াছেন; তিনি প্রথমেই প্রাণকে এক প্রকার উচ্চ অঙ্গের ঘড়ির কল-রূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন; তাহার পরে তিনি মনকে উচ্চ অঙ্গের প্রাণ, এবং বুদ্ধিকে উচ্চ অঙ্গের মন বলিয়া দাড় করাইয়াছেন; কাজেই হাবুডুবু খাইয়াছেন। বড়'দের দৃষ্টান্ত ছোটোদে'র উপরে কাজ করে; ইহা খুবই সত্য; কিন্তু সকল ছোট'র উপরে সমানভাবে কাজ করে না; একদল ছোটোর' চক্ষে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করে, আর-এক-দল ছোটো'র চক্ষু ফুটাইয়া তোলে। বড় বড় বিদেশীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণের অনেকগুলা নিছক বলগর্ব্ব উক্তি (অর্থাৎ গায়ের জোরের কথা) আমাদের দেশময় বিদ্যালয়ের বালকদিগের চক্ষে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করে—ইহা আমার দ্যাখা

কথা। ক্যাণ্টের কথা ছাড়িয়া দেও—ক্যাণ্ট্ দৈত্য-কুলের প্রহ্লাদ! তাঁহার ন্যায় অকৃত্রিম সত্যানুরাগী দার্শনিক পণ্ডিতের যুক্তিপূর্ণ বাক্যসকলের সহিত স্পেন্সর, মিল প্রভৃতি পণ্ডিতগণের অসম্বদ্ধ প্রলাপোক্তি সকলকে তুলাইয়া দেখিলে শেষোক্ত পণ্ডিতগণের বিপথগামিতার প্রতি কাহার না চক্ষু ফুটে? নিতান্ত যে অন্ধ—তাহারও চক্ষু ফুটে। বলিতে কি, স্পেন্সর প্রভৃতি আধুনিক খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ যে-পথে চলিয়া ভ্রান্তি-কূপে নিমগ্ন হইয়াছেন, আমি ঠিক তাহার বিপরীত পথে চলিয়া সে বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইয়াছি। স্পেন্সর প্রভৃতি পণ্ডিতেরা জড়কে জ্ঞানের সংস্পর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, প্রাণকে একপ্রকার ঘড়ির কল করিয়া দাঁড় করাইয়াছেন। আমি তাহা না করিয়াই প্রথমেই বুদ্ধিকে আলোচ্য পদবীতে বরণ করিয়াছি। বুদ্ধির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি প্রণিধান করিয়া দেখিলাম যে, তাহার ভিতরেই তিন প্রকার সত্তা একত্র জমাটবদ্ধ রহিয়াছে;—অব্যক্ত সত্তা গভীরে নিমগ্ন রহিয়াছে; প্রাতিভাসিক সত্তা উপরে উপরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে এবং বাস্তবিক সত্তা দুইকে কাটিয়া বুদ্ধির সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে। বুদ্ধির মুখ্য উপজীবিকাই হচ্চে বাস্তবিক সত্তা; মনের মুখ্য উপজীবিকা—প্রাতিভাসিক সত্তা; প্রাণের মুখ্য উপজীবিকা—অব্যক্ত সত্তা। এখন দেখিতে হবে এই যে, প্রাণকে এক প্রকার উচ্চ অঙ্গের ঘড়ির কল বলিলে, তাহার পরিচয়জ্ঞাপক প্রভেদ লক্ষণের কিছুই বলা হয় না; অর্থাৎ আর আর কল হইতে প্রাণের বিশেষত্ব যে কোন্খানটিতে, তাহার কিছুই বলা হয় না। স্পেন্সরের দলের পণ্ডিত-বর্গের প্রতি আমার সবিনয় নিবেদন এই যে প্রাণের সংজ্ঞা-নির্ব্বাচন যদি করিতেই হয়, তবে এইমাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত থাকা উচিত যে, জল যেমন তরলভূত বাষ্প এবং বরফ যেমন ঘনীভূত জল; তেমনি মন প্রাতিভাসিক বুদ্ধি, এবং প্রাণ অব্যক্ত মন। পূর্ব্বে আমি দেখাইয়া

যে, সৎ শান্তি-প্রধান, চিৎ প্রতিযোগ প্রধান এবং আনন্দ সংযোগ-প্রধান; এখন দেখাইতে চাই যে, প্রাণ শান্তি প্রধান, মন প্রতিযোগ-প্রধান, এবং বুদ্ধি সংযোগ-প্রধান। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে প্রাণ, মন এবং বুদ্ধির পরস্পরের সহিত পরস্পরের কিরূপ ভেদাভেদ, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

প্রাণের প্রধান আড্ডা হ'চ্চে ভাব-রাজ্যে সুষুপ্তি এবং আবির্ভাবরাজ্যে তরুলতাদি উদ্ভিদ্ পদার্থ। মনের প্রধান আড্ডা হ'চ্চে ভাবরাজ্যে স্বপ্ন, এবং আবির্ভাব-রাজ্যে পশুপক্ষী প্রভৃতি মূঢ়জীব। বুদ্ধির প্রধান আড্ডা হ'চ্চে ভাব জগতে জাগরিতাবস্থা এবং আবির্ভাব জগতে মনুষ্য।

ত্রিক-গণের মধ্যে সৌহার্দ্দ বন্ধন কি চমৎকার! একটা ত্রিককে ডাকিলে দশটা ত্রিক জোটবদ্ধ লইয়া তাহার পাছুপাছু ছুটিয়া আইসে। ডাকিলাম প্রাণ-মন-বুদ্ধিকে; আর অমনি দেখিতে না-দেখিতে সুষুপ্তি-স্বপ্ন-জাগ্রত এবং তরুলতা পশুপক্ষী মনুষ্য জোটবদ্ধ হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া উপস্থিত! এক্ষণে আবার, আর একটি ত্রিক নূতন দেখা দিতেছে —সে ত্রিক হ'চ্চে (১) ভোগ, (২) কর্ম্ম, (৩) জ্ঞান। এই নূতন ত্রিকটি'র সহিত উদ্ভিদ্, মূঢ়জীব এবং মনুষ্য—এই পরিদৃশ্যমান ত্রিকটির তাল-মান-লয়ের মিল যে কেমন চমৎকার, তাহা দেখিলে মন আশ্চর্য্য রসে দ্রবীভূত হয়; ইহা এইরূপ :—

ভোগ-শব্দের মুখ্য অর্থ পূরণ—অভাবের পূরণ; তার সাক্ষী—অন্নদ্বারা শরীরের অভাব-পূরণের নাম অন্ন ভোগ করা; আনন্দদ্বারা মনের অভাব-পূরণের নাম আনন্দ ভোগ করা; ইত্যাদি। যে সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির গৃহ ভোগের সামগ্রীতে পরিপূর্ণ, তাঁহাকে আমরা বলি "সুখী"। কিন্তু সম্পত্তিপন্ন ব্যক্তি সহস্র সুখী হইলেও তাঁহার ভোগের সামগ্রী ক্রমাগতই ক্ষয় পাইতে থাকে; আর, সেইজন্য তাঁহাকে পুনঃপুনঃ ভোগের সামগ্রী জোগাড়

করিতে হয়। ভোগ্যবস্তুর আয়োজন কষ্টকর ব্যাপার ; কাজেই, চেতনাবান্ জীবমাত্রকেই সুখভোগের সঙ্গে সঙ্গে, অল্পই হউক আর অধিকই হউক, দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ফলে দুঃখের প্রতিযোগেই সুখের স্বাদ-গ্রহণ সম্ভবে এবং সুখের প্রতিযোগেই দুঃখের স্বাদ-গ্রহণ সম্ভবে। পর্য্যায়-ক্রমে সুখ-দুঃখের ওল্‌ট্-পালট্ ব্যতিরেকে সুখ ও অনুভূত হইতে পারে না, দুঃখ ও অনুভূত হইতে পারে না। বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদ পদার্থের ভোগের সামগ্রী প্রতিনিয়তই তাহাদের হাতের কাছে সাজানো রহিয়াছে :—তাহাদের একতালার ভাণ্ডার-ঘরে আর্দ্র মৃত্তিকা রহিয়াছে ; সেই স্থান হইতে তাহারা পানীয় আহরণ করে ; তাহাদের দোতালার মুক্ত ভাণ্ডারে বায়ু রহিয়াছে ; সেই স্থান হইতে তাহারা কার্বনাদি অন্ন আহরণ করে ; তাহাদের তেতালার ঘরে সূর্য্যাতপ রহিয়াছে, সেই স্থান হইতে তাহারা আলোক এবং উত্তাপ আহরণ করে। বৃক্ষের কোনো দুঃখ নাই ;—কাজেই সুখও নাই ; কেননা (ইতিপূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি) দুঃখের প্রতিযোগিতা ব্যতিরেকে সুখের স্বাদ গ্রহণ সম্ভবে না। সুখদুঃখের অনুভব উৎপাদন করিতে হইলে ভোগের আয়তন কিনা শরীর, এবং ভোগের সামগ্রী কিনা অন্নাদি, এ-দুয়ের মাঝখানে একটা প্রাচীরের ব্যবধান নিতান্তই আবশ্যক ; ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, প্রকৃতি-মাতা বৃক্ষ-লতাদির ভোগ্য সামগ্রী যেমন প্রতিনিয়তই তাহাদের হাতের কাছে সাজাইয়া রাখেন—পশুপক্ষীদিগের ভোগের সামগ্রী তেমন করিয়া কেহ তাহাদের হাতের কাছে সাজাইয়া রাখে না। পশুপক্ষীদিগের শরীর ক্ষুধাতৃষ্ণার অগ্নিশরণ বা অগ্নি-মন্দির, আর সেই অগ্নির হবনীয় পদার্থ যোজন-যোজন দূরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে ; কাজেই কর্ম্মচেষ্টার পথ দিয়া ঐ অগ্নি এবং ঐ হব্যসামগ্রীর মধ্যে ক্রমাগতই সংযোগ-বিয়োগ চলিতে থাকে, আর সেই গতিকে সুখ দুঃখের ক্রমাগতই ওলট্ পালট্ হইতে থাকে।

বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদ্ পদার্থের কর্ম্ম-চেষ্টা নাই—ভোগই তাহাদের সর্ব্বস্ব। পশুপক্ষীরা পর্য্যায় ক্রমে ভোগ এবং কর্ম্মে ব্যাপৃত হয়। একজন প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক গ্রন্থকার তাই বলিয়াছেন যে, মূঢ়জীবেরা "কুর্ব্বতে কর্ম্ম ভোগায় কর্ম্ম কর্ত্তুঞ্চ ভুঞ্জতে"—ভোগের জন্য কর্ম্ম করে এবং কর্ম্মের জন্য ভোগ করে। আমাদের দেশের সকল শাস্ত্রই একবাক্যে বলে যে, দুঃখই কর্ম্মের প্রবর্ত্তক ; অথচ, বিশ্ববিধাতার কি আশ্চর্য্য ন্যায় এবং দয়া, কর্ম্মেতে ভোগের সুখ প্রতিবিম্বিত হইয়া দুঃখকে কেবল যে ভুলাইয়া দ্যায়, তাহা নহে, অধিকন্তু সুখকে দ্বিগুণিত—চতুর্গুণিত করিয়া তোলে। মনে কর, একটা বিজন প্রান্তরের মধ্যে আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা'র উদ্রেক হইয়াছে ; আর, কোশ-খানেক দূরে একটা দেবালয়ের অতিথ-শালা রহিয়াছে জানিতে পারিয়া তার প্রত্যভিমুখে আমি দ্রুতবেগে পদনিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। এরূপ অবস্থায়—কে বলিল যে, আমার ক্ষুধার জ্বালা দুঃখ, তাহা সুখের নিদান। আমি যে, অতিথি শালায় অন্ন-ভোজন করিয়া সুখী হইব—আমার ক্ষুধার জ্বালা তাহারই শুভ-চিহ্ন। কে বলিল যে, দ্রুতগমনের পরিশ্রম দুঃখ? তাহা সুখের নিদান। আমি যে, অচিরে অতিথিশালায় উপনীত হইয়া বিশ্রামের সুখ উপভোগ করিব—আমার দ্রুতগমনের পরিশ্রম তাহারই শুভ-চিহ্ন। ক্ষুধার দুঃখ যদি সুখের বিষয় না হইত, তবে লোকে পয়সা খরচ করিয়া অগ্নিকর ঔষধ ক্রয় করিত না। অঙ্গ চালনার পরিশ্রম যদি সুখের বিষয় না হইত, তবে ইউরোপের ধনাঢ্য ব্যক্তিরা নাচের মজ্‌লিসে নৃত্য করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ভোগমন্দিরে প্রবেশ করিত না। এই-রূপ দেখা যাইতেছে যে, জীবের কর্ম্ম-চেষ্টাতে এক তো ভাবী সুখ প্রতি-বিম্বিত হইয়া কর্ম্মের দুঃখকে দুঃখ বলিয়াই মনে করিতে দ্যায় না ; তাহাতে আবার কর্ম্ম-চেষ্টা নিজেই একপ্রকার ভোগ (অর্থাৎ অভাবের পূরণ), যেহেতু কর্ম্মদ্বারা জড়তারূপী অভাবের পূরণ হয়।

স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, বৃক্ষলতা'তে ভোগ-ক্রিয়ারই একাধিপত্য ; মূঢ়জীবে ভোগ-ক্রিয়া এবং কর্ম্মচেষ্টা উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া পর্য্যায়-ক্রমে প্রাদুর্ভূত হয়। মনুষ্য সময়ে সময়ে ভোগ এবং কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া উভয়ের ভাল-মন্দের বিচার করে ;—কোন্ সময়ে ভোগ ভাল—কোন্ সময়ে কর্ম্ম ভাল—কিরূপ ভোগ ভাল—কিরূপ কর্ম্ম ভাল—কতমাত্রা কর্ম্ম ভাল—কিরূপ প্রণালীতে ভোগ করা ভাল—কিরূপ প্রণালীতে কর্ম্ম করা ভাল, এই সব ভাল-মন্দের বিচার করে; ভালমন্দের বিচার করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করে। ভাল-মন্দের বিচার সত্যাসত্যের প্রতীতির উপরে নির্ভর করে। যাহার সত্যাসত্যের জ্ঞান নাই, তাহার ভাল-মন্দের-বিবেচনার গোড়া'র বাঁধুনি নিতান্তই আল্‌গা। সত্যই বুদ্ধির মুখ্য আলোচ্য বিষয়। সত্য বস্তুত এক, কিন্তু কার্য্যত অনেক। ভিন্ন ভিন্ন সত্য ভিন্ন ভিন্ন কর্য্যের উপযোগী। জ্যোতিষ্য সত্য পঞ্জিকা-প্রণয়ন-কার্য্যের উপযোগী ; জ্যামিতিক সত্য স্থাপত্য-কার্য্যের উপযোগী ; রাসায়নিক সত্য ছায়াঙ্কন (photography), ঔষধ প্রস্তুত-করণ প্রভৃতি কার্য্যের উপযোগী ; সমগ্র সত্য সমগ্র-আত্মার পুরুষার্থ-সাধনের উপযোগী। সমগ্র সত্য অখণ্ড এবং অপরিচ্ছিন্ন ; ব্যাবহারিক সত্য খণ্ড খণ্ড এবং পরিচ্ছিন্ন ; তার সাক্ষী—দার্শনিক সত্য, বৈজ্ঞানিক সত্য, বৈদিক সত্য, পৌরাণিক সত্য, জ্যামিতিক সত্য, রাসায়নিক সত্য এবংবিধ নানা শ্রেণীর নানা সত্য একই অখণ্ড সত্যের বহুধা-বিচিত্র শাখা-প্রশাখা। সব সত্যই বুদ্ধির আলোচ্য বিষয়। একই অখণ্ড সত্যকে যেমন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের কাজের সুবিধার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া লওয়া হয়, তেমনি একই জ্ঞাতা পুরুষের বুদ্ধিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কার্য্যের সুবিধার জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদে বিভক্ত করিয়া লওয়া হয় ; তার সাক্ষী—প্রজ্ঞা এক থাকের বুদ্ধি ; বিজ্ঞান দ্বিতীয় আর এক থাকের বুদ্ধি ; ধর্ম্মবুদ্ধি তৃতীয়

আর-এক থাকের বুদ্ধি, বিষয়বুদ্ধি চতুর্থ আর-এক থাকের বুদ্ধি; ইত্যাদি। তাহার মধ্যে—প্রজ্ঞার আলোচ্য বিষয় অখণ্ড সত্য; বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় জ্যামিতি জ্যোতিষ রসায়ন প্রভৃতি খণ্ড খণ্ড বৈজ্ঞানিক সত্য; ধর্ম্মবুদ্ধির আলোচ্য বিষয় মনুষ্যের পুরুষকার, বিশ্ববিধাতার ন্যায় এবং দয়া, কর্ম্মফল প্রভৃতি আধ্যাত্মিক সত্য; বিষয় বুদ্ধির আলোচ্য বিষয় অর্থের আয়ব্যয়, সামাজিক রীতি নীতি-প্রথা প্রভৃতি লৌকিক সত্য।

এখানে একটি বিষয় সবিশেষ দ্রষ্টব্য—বিষয়টি গুরুতর; তাহা এই যে, উপরের উপরের ধাপে নীচের নীচের ধাপ সর্ব্বতোভাবে সম্ভুক্ত থাকে; অর্থাৎ নীচের নীচের ধাপে যাহা কিছু আছে, সমস্তই উপরের উপরের ধাপে মোট-বাঁধা হয়—কোনো-কিছুই বাদ পড়ে না। তার সাক্ষী—বিদ্যালয়ের বালক যখন নীচের শ্রেণীতে ব্যাকরণ পড়িয়া-চুকিয়া উপরের শ্রেণীতে রঘুবংশ পড়িতে আরম্ভ করে, তখন সে রঘুবংশের ভিতরে তাহার পূর্ব্ব-শিক্ষিত সমস্ত বৈয়াকরণিক সত্যই সম্ভুক্ত রহিয়াছে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হয়। ইহাও তেমনি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বুদ্ধির ভিতরে মন এবং প্রাণ, দুইই সম্ভুক্ত রহিয়াছে; বাস্তবিক সত্তাতে প্রাতিভাসিক সত্তা, এবং অব্যক্ত সত্তা দুইই সম্ভুক্ত রহিয়াছে; অখণ্ড এবং অপরিচ্ছিন্ন সত্যে সমস্ত সত্যই সম্ভুক্ত রহিয়াছে। অনেকের বিশ্বাস এই যে, অখণ্ড সত্য বুদ্ধি বা খণ্ড সত্য হইতে পরিচ্ছিন্ন একটা কিছু। তাঁহাদের এ বোধ নাই যে, অখণ্ড সত্য যদি খণ্ড সত্য হইতে পরিচ্ছিন্নই হ'ন, তবে তাহা তো পরিচ্ছিন্ন সত্য! পরিচ্ছিন্ন সত্যের নামই তো খণ্ড সত্য! পরিচ্ছিন্ন সত্য আবার অখণ্ড হইল কিরূপে? তেমনি আবার, অনেকে মনে করেন যে, বুদ্ধি-প্রাণ মন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ একটা সৃষ্টিছাড়া রকমের পদার্থ। ইঁহাদের এ বোধ নাই যে, প্রাণ-মনের সহিত বুদ্ধির যদি কোনো প্রকার একাত্মভাব না থাকে, তবে বুদ্ধি রাজ্যহীন রাজার ন্যায় অথবা রথহীন রথীর ন্যায় কেবল একটা আভিধানিক শব্দমাত্রে পর্য্যবসিত

হয়। প্রাণ, মন এবং বুদ্ধির মধ্যে যে, কোনো হিসাবেই প্রভেদ নাই— এ কথা কেহই বলিতেছে না। প্রভেদ খুবই আছে। কিন্তু প্রভেদ যাহা আছে, তাহা অভেদেরই পরিপোষক, তা বই তাহা অভেদের হন্তারক নহে। আমি এখানে দেখাইতে চাই এই যে, তিনের মধ্যে প্রভেদের ছেদচিহ্ন যেমন সুস্পষ্ট, একাত্মভাবের বন্ধন তেমনি সুদৃঢ়; দুয়েরই গুরুত্ব সমান। প্রভেদ কেমন সুস্পষ্ট, এবং একাত্মভাবের বন্ধন কেমন সুদৃঢ় তাহা পরে পরে ক্রমশই অধিকাধিক প্রকাশ পাইতে থাকিবে।

বুদ্ধি, মন এবং প্রাণের কার্য্যগত প্রভেদ।

ডারুইনের শাস্ত্র অনুসারে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন (survival of the fittest) সৃষ্টির প্রধান প্রবর্ত্তক এবং নিয়ামক। ডারুইন এবং তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যেরা যোগ্যতা বলিলে কী বোঝেন না বোঝেন তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া আমার পক্ষে একপ্রকার অনধিকার চর্চ্চা; আমাকে শুধু শোভা পায় যোগ্যতা বলিতে আমার সহজ বুদ্ধিতে আমি যাহা বুঝি সেই কথাটি খোলাসা করিয়া ভাঙিয়া বলা; সে কথা এই :—

যে-কোনো সীমাবদ্ধ বস্তু হউক্ না কেন,—যেমন তুমি বা আমি—সেই সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র বস্তুটিকেই সমস্ত জগতের একতম খণ্ড বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কোনো একব্যক্তিকে—যেমন দেবদত্তকে—যদি সমস্ত জগতের একখণ্ড বলিয়া ধরা যায়, তবে কাজেই দাঁড়ায় যে, দেবদত্তের শরীরের সীমার বাহিরে জগতের মধ্যে আর আর যত কিছু আছে, সমস্তের মোট বাঁধিলে যাহা দাঁড়ায়, তাহা নিখিল জগতের অন্যতম খণ্ড। তবেই হইতেছে যে, নিখিল জগৎ দুই খণ্ডে বিভক্ত; এক খণ্ড হ'চ্চে দেবদত্ত নিজে, আর-এক খণ্ড হ'চ্চে দেবদত্তের শরীরের সীমার বাহিরে যেখানে যাহা কিছু আছে, তা সবা'র সমষ্টি। রূপকচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, তুমি নিজে একজন

এবং তোমার শরীরের সীমার বাহিরে যেখানে যত কিছু পদার্থ আছে, সমস্তের সমষ্টি আর-একজন। তোমরা দুইজন প্রকৃত-প্রস্তাবে দুই নহ; পরন্তু একেরই দুই অপরিহার্য্য অঙ্গ;—সে এক কি? না, সমস্ত জগৎ। তুমি এবং তোমাছাড়া জগতে আর যাহা কিছু আছে সমস্ত—এই দুই ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ খণ্ড পদার্থ যখন একেরই দুই অপরিহার্য্য অঙ্গ, তখন দুয়ের মধ্যে ঐকান্তিক বিচ্ছেদ অসম্ভব—সুতরাং দুইয়ের মধ্যে যোগ অ শুম্ভাবী। এই তো পাইলাম যোগ। এখন যোগ্যতা কি—তাহাই জিজ্ঞাস্য।

যে-কোনো সীমাবদ্ধ বস্তু হউক্ না কেন তাহার যোগ্যতা বলিতে বুঝায় আর কিছু না—তাহার নিজত্বের সীমার বাহিরের বস্তুসকলের সহিত যোগ ক্ষমতা। তুমি যদি তোমার পরিবার-বর্গের সহিত রাজপুরুষদিগের সহিত—কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের সহিত—ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণের সহিত—এক কথায় সময়ের সহিত যোগে চলিতে পার, তবে তোমাকে বলিব যোগ্য-চূড়ামণি। কিন্তু যোগের পাত্র-ভেদ আছে—সেটা ভুলিলে চলিবে না। এই পাত্র-ভেদের ব্যাপারটি চরাচর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া নিরন্তর চলিতেছে, সুতরাং ডারুইনের ন্যায় একজন বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের অনুসন্ধান-চক্ষে তাহা গোপন থাকিতে পারে না। ডারুইন তাহার নাম দিয়াছেন—Natural selection নৈসর্গিক পাত্র-নির্ব্বচন। চোর ডাকাত প্রভৃতি যে সকল দুষ্টলোক জন-সমাজের যোগ ভঙ্গ করিতেই সর্ব্বদা তৎপর, তাহারা যোগের অনুপযুক্ত পাত্র। এইজন্য যে রাজা দুষ্টের সহিত যোগযুক্ত হইয়া শিষ্টের নির্য্যাতন করেন সে রাজাকে যোগ্য রাজা বলিতে পারা যায় না। ফলেও আমরা সেই রাজাকে বলি অযোগ্য রাজা, যিনি শিষ্টের সহিত যোগ-যুক্ত হইয়া দুষ্টের দমন করেন। শিষ্টের সহিত যোগই প্রকৃত যোগ। "শিষ্ট" কিনা শোধিত—পরিণত (finished—accomplished)। জ্ঞান-শব্দ হইতে যেমন জ্ঞেয়-শব্দ এবং জ্ঞাত-শব্দ হইয়াছে, শেব শব্দ হইতে

তেমনি শিষ্য-শব্দ এবং শিষ্ট-শব্দ হইয়াছে। গুরু যাঁহাকে পরিণত করিয়া তুলিতেছেন—পাকাইয়া তুলিতেছেন—finish করিয়া তুলিতেছেন—শেষিত করিয়া তুলিতেছেন— তিনিই শিষ্য; এবং যিনি শেষিত হইয়াছেন, তিনিই শিষ্ট। শিষ্ট হ'চ্চে finished product of শিক্ষা ("শিক্ষা" অর্থাৎ শেষিত হইবার ইচ্ছা বা চেষ্টা), এবং প্রকারান্তরে finished product of nature। প্রকৃতির গতিই শিষ্টের দিকে— দুষ্টের দিকে নহে; কেন না, দুষ্টেরা কালে আপনাদের দোষেই আপনারা মারা পড়ে। শিষ্টেরাই জনসমাজের যোগবন্ধনের ভিত্তিমূল; শিষ্টের সহিত যোগই প্রকৃত যোগ। কাজেই দাঁড়াইতেছে যে, জনসমাজে যিনি যে পরিমাণে শিষ্টদিগের সহিত যোগ-ক্ষম, তিনি সেই পরিমাণে যোগ্য ব্যক্তি। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি কথা আছে ঃ— কথায় বলে "টক বাছিতে গাঁ উজাড়"। কাজেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, জন-সমাজে কেহবা বেশী দুষ্ট, কেহবা কম দুষ্ট; কেহবা কম শিষ্ট, কেহবা বেশী শিষ্ট; তা বই একেবারেই পরম শিষ্ট কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারেনা; এক কথায়— দুষ্ট এবং শিষ্টের মধ্যে অলঙ্ঘনীয় প্রাচীরের ব্যবধান নাই; ব্যবধান না থাকারই কথা; যেহেতু শিষ্ট এবং দুষ্ট— রাম-রাবণ— উভয়েই প্রকৃতি মাতার সন্তান; এমন কি, রাবণ না থাকিলে রামায়ণই হইতে পারিত না। দুষ্ট এবং শিষ্ট দুয়ের মধ্যে যদি অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর থাকিত, তবে চৈতন্য-মহাপ্রভু জগাই-মাধাইকে শিষ্ট করিয়া তুলিতে পারিতেন না। যে রাজা শিষ্টের সহিত যোগযুক্ত হইয়া দুষ্টের দমন করেন, তিনি সুযোগ্য রাজা তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা অপেক্ষাও যোগ্যতর রাজা যদি থাকেন তবে তিনি সেই রাজা—যিনি তাহা করিয়াই ক্ষান্ত হ'ন না, পরন্তু দুষ্টকে আপন সদ্‌গুণের দৈবী মায়ার প্রভাবে শিষ্ট করিয়া তোলেন। জীবের প্রাণ যেমন নির্জীব অন্নকে সজীব রক্ত করিয়া তোলে— মহাপুরুষদিগের প্রেম এবং দয়া তেমনি

অধম পাপীকেও সাধু করিয়া তোলে। এ সকল আশপাশের কথা এখন যাইতে দেওয়া হো'ক। প্রকৃত বক্তব্য যাহা, তাহা এই যে, সীমাবদ্ধ বস্তুগণের মধ্যে, যে বস্তু যে পরিমাণে আপন সীমার বাহিরের বস্তুসকলের সহিত যোগে চলিতে পারে, সে বস্তু সেই পরিমাণে যোগ্য শব্দের বাচ্য। মোটামুটি সকলেই জানে যে, তরু-লতা অপেক্ষা পশু-পক্ষী, এবং পশু-পক্ষী অপেক্ষা মনুষ্য যোগ্যতর জীব; কিন্তু সে প্রকার জানা কাজের জানা নহে। স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সকলেই তো যোগ্য; তবে কেন একজনকে বলা হয় যোগ্য, আরেকজনকে বলা হয় অযোগ্য? যে যোগ্য, সে কিসে যোগ্য— ইহার একটা ঠিক্‌ঠাক্ উত্তর দিতে পারা চাই;—তা যদি তুমি না পার, আর, তবুও যদি বলি যে "আমি জানি যে, উদ্ভিদ পদার্থ অপেক্ষা অধম জন্তু এবং অধম জন্তু অপেক্ষা মনুষ্য যোগ্যতর জীব", তবে সেরূপ জানা বিজ্ঞানের কোনো কার্য্যে আসতে পারে না। প্রকৃত কথা এই যে, উদ্ভিদ পদার্থ অপেক্ষা মূঢ়জীব এবং মূঢ়জীব অপেক্ষা মনুষ্য যে কিসের গুণে অধিকতর যোগ্য তাহার একটি কষ্‌টি-পাথর আছে; তাহা ঘষিয়া দেখিলেই যে যোগ্য, সে কিসে যোগ্য, তাহা তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ে। সে কষ্‌টি পাথর যে কি তাহা বলিতেছি।

সীমাবদ্ধ বস্তু-মাত্রেরই যোগ্যতার অভিজ্ঞান চিহ্ন বা নিদর্শন কি—যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহার নিজস্বের সীমাবহির্ভূত বস্তুসকলের সহিত তাহার যোগের দৌড় কতদূর পর্য্যন্ত, তাহা একবার ভাল করিয়া ঠাহর করিয়া দেখ। যাহার যোগের দৌড় আপন শরীরের সীমা ছাড়াইয়া যত বেশীদূর যায়, সে সেই পরিমাণে অধিকতর যোগ্য। উদ্ভিদ-পদার্থ-সকলের যোগের দৌড় তাহাদের শরীরের সীমা-ঘাঁসা পদার্থ-সকলেতেই পর্য্যাপ্ত; তার সাক্ষী—তাহারা তাহাদের মূল-ঘ্যাঁসা মৃত্তিকা হইতে রসাকর্ষণ করে, পত্র-ঘাঁসা বায়ু হইতে কার্বনাদি অন্ন আহরণ করে, ইত্যাদি। পক্ষান্তরে

মূঢ়জীবদিগের যোগের দৌড় চলে তাহাদের শরীরের সীমা ছাড়াইয়া তাহার ও-দিকে অনেকদূর পর্য্যন্ত! তার সাক্ষী—মৌমাছিরা থাকে মৌচাকে, মধু অন্বেষণ করে সরোবরের পদ্মবনে। এ বিষয়ে মনুষ্য এবং নিকৃষ্ট জন্তুদিগের মধ্যে প্রভেদ এই যে, আর আর জীবদিগের যোগের দৌড় যতই দূরে প্রসারিত হউক না কেন, তথাপি তাহা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে অবরুদ্ধ; মনুষ্যের কিন্তু তাহা নহে; মনুষ্যের যোগের দৌড় কোনোপ্রকার প্রাচীরের অবরোধ মানে না; মনুষ্যের যোগের দৌড় আকাশ-পাতাল-ব্যাপী সমগ্র সত্যে প্রধাবিত হয়; মনুষ্য সমগ্র আত্মার সম্যক চরিতার্থতা চায়; তাহারই জন্য "সার সত্যের আলোচনা"। সার সত্যের আলোচনা পশু-পক্ষীদিগের অধিকার-বহির্ভূত।

এখন দেখিতে হইবে এই যে, উদ্ভিদ-পদার্থ-সকলের যোগ্যতার নিদান তাহাদের প্রাণ; মূঢ় জন্তুদিগের যোগ্যতার নিদান তাহাদের মন; মনুষ্যের যোগ্যতার নিদান তাহার বুদ্ধি। সেই সঙ্গে আর একটি দেখিতে হইবে এই যে, প্রাণের বিচরণ-ক্ষেত্র অব্যক্ত সত্তা; মনের বিচরণ-ক্ষেত্র প্রাতিভাসিক সত্তা; বুদ্ধির বিচরণ-ক্ষেত্র বাস্তবিক সত্তা।

পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি—একটা ত্রিকের কথা উঠিলেই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দশটা ত্রিক সারি বাঁধিয়া আসিয়া হুড়াহুড়ি আরম্ভ করে। বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, মনুষ্য, এই ত্রিকটি যেই ডাক শুনিয়া দণ্ডায়মান হইল, আর অমনি ত্রিকের শ্রেণী পরম্পরা—এটির পশ্চাতে ও-টি—ও টির পশ্চাতে সে-টি—দেখা দিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে দেখা দিল—ভোগ, কর্ম্ম, জ্ঞান; তাহার পরে দেখা দিল—প্রাণ, মন, বুদ্ধি; এখন আবার আরেক ত্রিক আসিয়া উপস্থিত হইল—অব্যক্ত সত্তা, প্রাতিভাসিক সত্তা, বাস্তবিক সত্তা। ত্রিকের ভিমরুলের চাকে ঘা দিলে আর নিস্তার নাই। প্রাণ, মন, এবং বুদ্ধি, তিনের মধ্যে প্রভেদ কিরূপ সুস্পষ্ট, অথচ একাত্মভাব কিরূপ সুদৃঢ়,

তাহা দেখাইবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া বাহির হইয়াছিলাম, পথের মাঝখানে ত্রিকের ভিড় সামলাইতে না পারিয়া, সে প্রতিজ্ঞা মন হইতে সরিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। নূতন অভ্যাগত ত্রিকটিকেও সন্তুষ্ট করা চাই এবং প্রতিজ্ঞার বিষয়টিরও মীমাংসা করা চাই; দুই কূল রক্ষা করা চাই; তাহারই এখন চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

অভ্যাগত ত্রিক হ'চ্চে—অব্যক্ত সত্তা, প্রাতিভাসিক সত্তা, বাস্তবিক সত্তা; অধিবাসী ত্রিক হ'চ্চে—প্রাণ, মন, বুদ্ধি। দুয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ র'হয়াছে—তাহা এইরূপ :—

জীবের অভ্যন্তরে কার্য্য করিবার সময়, প্রাণ কার্য্য করে অব্যক্ত-ভাবে, মন এবং বুদ্ধি কার্য্য করে ব্যক্ত-ভাবে। শরীরের ভিতরে প্রাণ একাকী একশত ব্যক্তির কার্য্য করে;—অন্ন পরিপাক করে, অন্নের নির্য্যাস রক্তে পরিণত করে, রক্ত শোধন করিয়া তাহাকে দিয়া সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ম্যারামত করাইয়া লয়—ইত্যাদি-প্রকার কত যে কার্য্য করে, তাহার সংখ্যা নাই; অথচ সে সমস্ত কার্য্য এমনি অব্যক্ত-ভাবে নিষ্পাদন করে যে, শরীরের যিনি গৃহস্বামী, তিনি তাহা জানিতেও পারেন না। পক্ষান্তরে, মন যখন লোভের চাবুক কসিয়া জীবকে সম্মুখস্থিত বিষয়ের প্রতি প্রধাবিত করে, অথবা ভয়ের তাড়া দিয়া সম্মুখস্থিত বিষয় হইতে ফিরাইয়া আনে, তখন দুইই সে করে ব্যক্ত-ভাবে। বুদ্ধির তো কথাই নাই;—রাজা যখন বুদ্ধিপূর্ব্বক রাজকার্য্য নিষ্পাদন করেন, অথবা সেনাপতি যখন যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যূহ-রচনা করেন, তখন ভূত ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখে সুব্যক্ত-ভাবে বিরাজ করিতে থাকে। এইরূপ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, প্রাণ অব্যক্ত সত্তার ভিতরে ডুব দিয়া কার্য্য করে; মন এবং বুদ্ধি উভয়েরই ব্যক্ত সত্তার আলোকে বিনির্গত হইয়া কার্য্য করে। বুদ্ধি এবং মন দুয়েরই কার্য্যের

সহিত প্রাণের কার্য্যের এ-যেমন প্রভেদ দেখা গেল, বুদ্ধি এবং মনের আপনাদের কার্য্যের মধ্যেও তেমনি আর-এক দিকে আরেক প্রকার প্রভেদ আছে—সে প্রভেদটিও বিবেচ্য। সে প্রভেদ এইরূপ :—

মনের নিকটে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে উপস্থিত বিষয়েরই ব্যক্ত হয় ; আর অন্ধ-সংস্কার-সূত্রে উপস্থিত বিষয়ের সহিত অনুপস্থিত বিষয়ের যোগ অনুভূত হয়। পক্ষান্তরে বুদ্ধির নিকটে উপস্থিত-এবং-অনুপস্থিত-উভয়-সংবলিত সমগ্র আলোচ্য বিষয় প্রতিভাত হয় এবং (অন্ধ-সংস্কার-সূত্রে নহে, পরন্তু) বাস্তবিক সত্তার বন্ধন সূত্রে সমস্তের সহিত সমস্তের যোগ অনুভূত হয়। বুদ্ধি এবং মনের মধ্যে এই যে কার্য্যগত প্রভেদ, ইহা একপ্রকার যোগের প্রকার ভেদ ; যথা :—

যোগ দুই-প্রকার—(১) প্রতিযোগ এবং (২) সংযোগ। যোজ্য বস্তুর সহিত তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী বস্তুর যে যোগ (যেমন পারম্পর্য্য-সূত্রে ক-এর সহিত খ-এর, খ-এর সহিত গ-এর, গ-এর সহিত ঘ-এর যে যোগ), তাহারই নাম প্রতিযোগ ; আর মৌলিক একতা সূত্রে সমস্তের সহিত সমস্তের যে যোগ (যেমন কণ্ঠ্যতা সূত্রে কখগঘঙ এই পাঁচটি বর্ণের সকলের সহিত সকলের যোগ), তাহারই নাম সংযোগ। এখন আমি দেখাইতে চাই এই যে, মন প্রতিযোগ তরঙ্গের ধাক্কায় গম্যপথে অগ্রসর হয়, বুদ্ধি সংযোগ সূত্রে অগ্রপশ্চাৎ বেষ্টন করিয়া পরিধি-পরম্পরা ক্রমে গম্যপথে অগ্রসর হয়।

মনে কর আমি বিদেশে একটা বৃহৎ পান্থশালায় দুই-চারি-দিন মাত্র বাস করিয়াছি। পরদিন প্রাতঃকালে আমি নগর পর্য্যটন করিয়া যখন সেই পান্থশালার দ্বারদেশে উপনীত হইলাম, তখন কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না—সকলেই সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে গঙ্গাস্নানে গিয়াছে। পান্থ

শালার প্রাঙ্গণের দশদিক্ দিয়া দশটা সুঁড়ি পথ গিয়াছে; কোন্ পথটা আমার ঘরে পৌঁছিবার পথ, তাহা ঠিক করিতে পারিতেছি না। এক দিকের একটা পথ ধরিয়া চলিয়া আমার ঘরে যাইবার সিঁড়ি দেখিতে পাইলাম। সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরে তো উঠিলাম, কিন্তু আমার বামে একটা এবং আমার ডাহিনে একটা, দুইদিকে দুইটা বারাণ্ডা রহিয়াছে—কোন্‌টা আমার ঘরের পাশের বারাণ্ডা, তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না। ব্যাকুল ভাবে চারিদিক নিরীক্ষণ করিতেছি, ইতিমধ্যে—বামদিগের বারাণ্ডার এক কোণে একটা প্রস্তরমূর্ত্তি রহিয়াছে—তাহার প্রতি আমার চক্ষু পড়িল; চক্ষু পড়িবামাত্র আমার মনে হইল যে, আমার ঘরের দ্বারের এক পার্শ্বে একটা শ্বেত প্রস্তরের মূর্ত্তি ইতিপূর্ব্বে যেন আমি দেখিয়াছি। তখন আমি সেই প্রস্তরমূর্ত্তিটির সন্নিধানবর্ত্তী একটি দ্বারে উঁকি দিবামাত্র দেখিতে পাইলাম যে, আমার ঘরের জিনিস্‌পত্র যেখানকার যাহা, সমস্তই ঠিক্‌ঠাক্ সাজানো রহিয়াছে। সিঁড়ি আমাকে বারাণ্ডায় পৌঁছাইয়া দিল, বারাণ্ডা আমাকে প্রস্তরমূর্ত্তিতে পৌঁছাইয়া দিল, প্রস্তরমূর্ত্তি আমাকে ঘরে পৌঁছাইয়া দিল। ক আমাকে খ এ পৌঁছাইয়া দিল, খ আমাকে গ এ পৌঁছাইয়া দিল, গ আমাকে ঘ-এ পৌঁছাইয়া দিল। এইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব নিরপেক্ষ উত্তরোত্তর ক্রমই মনের ক্রম। "পূর্ব্ব-পূর্ব্ব নিরপেক্ষ" অর্থাৎ যখন আমি খ-এ পৌঁছিলাম, তখন খ-এর প্রতিযোগে আমার মনে গ যেমনি আবির্ভূত হইল, ক অমনি মন হইতে তিরোভূত হইল। পূর্ব্ববর্ত্তী ক আমার মন হইতে সরিয়া পলাইল, উত্তরবর্ত্তী গ আসিয়া তাহার স্থানে জুড়িয়া বসিল; ইহারই নাম পূর্ব্ব পূর্ব্ব-নিরপেক্ষ উত্তরোত্তর ক্রম। বুদ্ধির ক্রম কিন্তু আর এক-প্রকার; সে ক্রমের নাম দেওয়া যাইতে পারে—যুক্তিপূর্ব্বক বিবরণ পদ্ধতি বা বিচার পদ্ধতি। বিচার পদ্ধতি আর কিছু না—অগ্র পশ্চাতের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া পরবর্ত্তী পদে পা বাড়ানো; পাস্থ-

শালার যিনি কর্তা, তাঁহার মনোমধ্যে পান্থশালার কোথায় কোন্ ঘর, কোথায় যাইবার কোন্ পথ, সমস্তই নখদর্পনে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে; কাজেই, তিনি যখন পান্থশালার কার্যালয় হইতে ভোজনালয়ে গমন করেন তখন সমস্ত পান্থশালার সমস্ত ঘরের-সহিত-সমস্ত-ঘরের কিরূপ যোগাযোগ তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া সমস্তের মধ্য হইতে একটি সুনির্দ্দিষ্ট পথ বাছিয়া ল'ন, এবং সেই পথ অবলম্বন করিয়া গম্যস্থানে উপনীত হ'ন। পাঠশালার একটি কচি বালককে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, গ-এর পরে কোন্ অক্ষর, তবে সে তৎক্ষণাৎ বলিবে ঘ; কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে ক-বর্গের চতুর্থ বর্ণ কি? তবে সে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। এরূপ যে হয়, তাহার কারণ কি? কারণ অতীব সুস্পষ্ট—বালকটির বুদ্ধি এখনো পরিস্ফুট হয় নাই। ক বলিলে তাহার মনে খ আসিয়া পড়ে, খ বলিলে গ আসিয়া পড়ে, গ বলিলে ঘ আসিয়া পড়ে; প্রথমের প্রতিযোগে দ্বিতীয় আসিয়া পড়ে, দ্বিতীয়ের প্রতিযোগে তৃতীয় আসিয়া পড়ে, ইত্যাদি. তা বই প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম সমস্তের মোট বাধিয়া যে একটা বর্গ হয়,—ক বর্গ হয়; আর, ঘ যে সেই ক বর্গের চতুর্থ বর্ণ; এরূপ যুক্তি-মূলক বিচার একটি কচি বালকের নিকট হইতে প্রত্যাশা করাই পাগলামি। ক হইতে খ, খ হইতে গ, গ হইতে ঘ, এরূপ করিয়াই মন যখন উপস্থিত বিষয় হইতে অনুপস্থিত বিষয়ে প্রধাবিত হয়, তখন উপস্থিত বিষয়ের ভাবের টানে অনুপস্থিত বিষয়ের ভাব মনোমধ্যে আপনা-আপনি আসিয়া পড়ে; আর, ভাবের পশ্চাতে ভাবের সমাগম যাহা ঐরূপে সংঘটিত হয়, তাহার দার্শনিক নাম ভাবের অনুবন্ধিতা অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে বলে association of ideas। স্বপ্নের মনোরাজ্য ভাবের অনুবন্ধিতাই সমস্ত প্রাতিভাসিক দৃশ্যের মূল উৎস। জাগ্রৎকালে নির্দ্দিষ্ট পথ অভিবাহন করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছতে হয়; স্বপ্নকালে তাহার কিছুই

করিতে হয় না ; স্বপ্নের অনুজ্ঞা হইলে যে-সে পথ দিয়া যেখানে-সেখানে উত্তীর্ণ হওয়া যাইতে পারে। হনুমানের নিকট হইতে রামচন্দ্র যে-দিন অশোকবনের সংবাদ শুনিলেন, খুব সম্ভব যে, সে-দিন রাত্রিকালে তিনি স্বপ্নযোগে অশোকবনে সীতার দর্শন লাভ করিয়া আনন্দে পুলকিত হইয়াছিলেন ; তখন, সমুদ্রে সেতু বাঁধিবার জন্য তাঁহাকে একমুহূর্ত্তও উপায়-চিন্তা করিয়া কষ্ট পাইতে হয় নাই। এইখানে জাগ্রৎকালের বাস্তবিক-সত্তা এবং স্বপ্নের প্রাতিভাসিক-সত্তা, দুয়ের প্রভেদ স্পষ্ট ধরা পড়িতেছে। বাস্তবিক-সত্তার রাজ্যে বস্তু-সকলের সংযোগের ব্যবস্থা অতীব সুনির্দ্দিষ্ট ; ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে যাইবার পথ অতীব সুনির্দ্দিষ্ট ; পৃথিবী হইতে সূর্য্য চন্দ্র-তারকা প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক পদার্থসকলের দূরত্ব অতীব সুনির্দ্দিষ্ট ; কার্য্য-কারণের পারম্পর্য্য শৃঙ্খলা অতীব সুনির্দ্দিষ্ট ; সহযোগী বস্তুসকলের পরস্পরের সহিত পরস্পরের বাধ্যবাধকতা অতীব সুনির্দ্দিষ্ট। পক্ষান্তরে, স্বপ্নের প্রাতিভাসিক রাজ্যে দেশকালঘটিত দূরত্ব নিকটত্বেরও কোনো ঠিকানা নাই—দিক্-বিদিকেরও কোনো ঠিকানা নাই—কার্য্য-কারণের যোগ্যাযোগ্যতারও কোনো ঠিকানা নাই, স্বপ্নের প্রাতিভাসিক রাজ্যে সবই সব-স্থানে সম্ভবে —পঙ্গুকর্ত্তৃক গিরিলঙ্ঘন সম্ভবে মরুভূমিতে উৎসের উৎসারণ সম্ভবে ; সব কার্য্যই সব-কারণে সম্ভবে ; জোনাকপোকার মশালে অরণ্য প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতে পারে, ভেক হস্তীকে গিলিয়া খাইতে পারে। অতএব এটা স্থির যে, যে-রাজ্যে দিক্ বিদিকের ঠিকানা আছে, যে-রাজ্যে ভিন্ন-ভিন্ন বস্তুর মধ্যে দেশের ব্যবধান সুনির্দ্দিষ্ট ; যে-রাজ্যে প্রত্যেক বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মধ্যে কালের ব্যবধান সুনির্দ্দিষ্ট ; যে-রাজ্যে কার্য্য-করণ-প্রবাহের পারম্পর্য্য-ব্যবস্থা সুনির্দ্দিষ্ট ; যে-রাজ্যে বিভিন্ন বস্তুসকলের পরস্পর বাধ্য-বাধকতা সুনির্দ্দিষ্ট, সেই রাজ্যই বাস্তবিক সত্তার রাজ্য ; আর সেই বাস্তবিক সত্তার রাজ্যই বুদ্ধির বিচরণ-ভূমি। বিচরণ-ভূমি এবং বিচার

ভূমি—এই দুই শব্দের একই অর্থ। ঐ যে বাস্তবিক সত্তা—যাহা বুদ্ধির বিচার-ভূমি—তাহা একই অদ্বিতীয় সত্যের বিশ্বব্যাপী বন্ধন-সূত্র। দ্যুলোকে, ভূলোকে, অন্তরীক্ষে, যেখানে যত কিছু বস্তু আছে, সমস্তই ঐ একই বন্ধন-সূত্রের টানে পরস্পরের সহিত যোগে বিবৃত রহিয়াছে। পান্থশালার গৃহস্বামীর মনোমধ্যে যেমন—পান্থশালার কোথায় কোন্ ঘর, কোথায় কোন্ পথ, কোথায় কোন্ কার্য্যশালা, সমস্তই নখদর্পণে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে; এক অদ্বিতীয় সত্যে সেইরূপ সমস্ত বস্তুর সংযোগ-ব্যবস্থা নখদর্পণে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে; সে সংযোগ-ব্যবস্থা যৎপরোনাস্তি সুনির্দ্দিষ্ট এবং পরিপাটি; তাহা নিয়তির বন্ধন; তাহার একচুলও এদিক্-ওদিক্ হইবার নহে। শাস্ত্রে যে বলে—"বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা মনোবৃত্তি", তাহার অর্থই ঐ। নিশ্চয়াত্মিকা-শব্দের অর্থই হচ্চে—বাস্তবিক-সত্তা-মূলক সংযোগ-ব্যবস্থার নিশ্চয়ীকরণ যাহার মুখ্যতম কার্য্য। বুদ্ধি যখন নিশ্চয় করে যে, ইহা মৃত্তিকা, ইহা জল, ইহা বায়ু ইত্যাদি, তখন প্রত্যেক নিশ্চয়-ক্রিয়ার সঙ্গে এই একটি মৌলিক নিশ্চয়-ক্রিয়া জোড়া-লাগান থাকে যে, ইহা বাস্তবিক পদার্থ। অতএব এটা স্থির যে, সত্য-নিশ্চয়ই গোড়া'র নিশ্চয়, পরম নিশ্চয়, এবং চরম নিশ্চয়। পুনশ্চ শাস্ত্রে বলে যে, মন সংকল্প-বিকল্পাত্মক; সংকল্প-বিকল্প কি? না, কল্পনা-বিকল্পনা। ভাবনা-বিভাবনাও তাহারই নামান্তর। বর্ত্তমান প্রবন্ধের গোড়া'তেই বলিয়াছি যে, ভাবনা-শব্দ ভূ-ধাতু হইতে হইয়াছে—তাহার অর্থ হওয়ানো। মনোমধ্যে ধ্যেয় বস্তু হওয়ানো, মনোমধ্যে ধ্যেয় বস্তু গড়িয়া তোলা, মনোমধ্যে ধ্যেয় বস্তু কল্পনা করা, একই কথা। সংকল্প-বিকল্প আর কিছু না—মনোমধ্যে নির্দ্ধারিতব্য বিষয়ের তোলা পাড়া। বুদ্ধির সত্য-নির্ণয় বাস্তবিক-সত্তা-মূলক-সংযোগ-প্রধান; মনের সংকল্প-বিকল্প কবিতাচ্ছন্দের লঘু-গুরু মাত্রার ন্যায় প্রতিযোগ-প্রধান; আর সেই প্রতিযোগের মূল প্রবর্ত্তক হ'চ্চে—ভাবের অনুবন্ধিতা

(association of ideas)। স্বপ্নে এরূপ ঘটনা কিছুই বিচিত্র নহে যে, এই আমি উদ্যানে বসিয়া পক্ষীর কলরব শুনিতেছি, পরক্ষণেই উদ্যান অরণ্য-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উঠিল, এবং তাহার মধ্য হইতে ব্যাঘ্রের গর্জ্জন-ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। উদ্যান ভাঙিয়া গেল, অরণ্য গঠিত হইয়া উঠিল। এইরূপ ভাঙন-গড়নই সংকল্প-বিকল্প এবং :উভয়ে পরস্পরের প্রতিযোগী।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, প্রাণ, মন এবং বুদ্ধির মধ্যে প্রভেদ খুবই স্পষ্ট। প্রাণের সহিত মনোবুদ্ধির প্রভেদ এই যে, প্রাণ অব্যক্ত সত্তায় ব্যাপৃত হয়—প্রাণের ব্যাপার-ক্ষেত্র অব্যক্ত সত্তা। মন এবং বুদ্ধি উভয়েরই ব্যাপার-ক্ষেত্র ব্যক্ত সত্তা। ব্যক্ত সত্তা আবার দুই থাকে বিভক্ত —(১) প্রাতিভাসিক সত্তা এবং (২) বাস্তবিক সত্তা। মনের ব্যাপার-ক্ষেত্র প্রাতিভাসিক সত্তা। বুদ্ধির ব্যাপার ক্ষেত্র বাস্তবিক সত্তা ; যাহা বাস্তবিক, তাহা আদ্যোপান্ত সবটা ধরিয়া বাস্তবিক। একটা কাগজ তাহার এ-পিট ও-পিট এবং চারিধার, সবটা ধরিয়া বাস্তবিক-কাগজ। পক্ষান্তরে, ও-পিটের সহিত সম্বন্ধ-বর্জ্জিত এ-পিট, এবং দু-পিটের সম্বন্ধ বর্জ্জিত চারিধার, দুইই অবাস্তবিক। "বুদ্ধিতে বাস্তবিক সত্তা প্রকাশ পায়",এ কথার অর্থ এই যে, বুদ্ধিতে আলোচ্য-বিষয়ের কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত সবটা একযোগে প্রকাশ পায়, আর সেই সঙ্গে কেন্দ্র, পরিধি এবং অরাবলী (radii) প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরস্পরের মধ্যে কিরূপ সংযোগের ব্যবস্থা, তাহাও প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে, মন যখন এ-পিঠে ব্যাপৃত হয়, তখন ও-পিঠের কোনো তোয়াক্কা রাখে না। মন যখন যে-পিঠে ব্যাপৃত হয়, তখন সেই পিঠের প্রাতিভাসিক সত্তাই তাহার নিকটে ব্যক্ত হয়। মন প্রাতিভাসিক সত্য লইয়া—ঐকাংশিক সত্য লইয়া—এক-পিট লইয়া কারবার করে। এইজন্য মন এ-পিট হইতে ও-পিট,

ও-পিট হইতে এ-পিট চারিধারে ঘুড়িয়া বেড়ায়, ক-হইতে খ এ, খ হইতে গ-এ ঘুড়িয়া বেড়ায়। মন সর্ব্বদাই ইতস্তত বিক্ষপ্ত হয়; বিক্ষিপ্ত হইবারই কথা —কেন না, কোন আংশিক সত্তাই আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত নহে। মন এলোমেলো ভাবনার তরঙ্গে এরূপ অষ্টপ্রহর তরঙ্গিত হয় যে, একদণ্ডও তাহাকে দেখিলাম না যে, সে স্বস্থানে ভরপূর আসন জমাইয়া বসিয়া আছে। জমাট্ ভাব, সমাহিত ভাব, বা সমাধি; পরিপক্ক বুদ্ধির লক্ষণ—প্রজ্ঞার লক্ষণ। এক অদ্বিতীয় বাস্তবিক সত্যের বাহিরে দ্বিতীয় কিছুই নাই; কাজেই; প্রজ্ঞা যখন কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত সবটা ধরিয়া সমগ্র বাস্তবিক সত্যে ব্যাপৃত হয়; তখন সে সত্য হইতে সে যে পদস্খলিত হইয়া তাহার বাহিরে পড়িয়া যাইবে, তাহার সম্ভাবনা থাকে না; কেননা, যাহার বাহিরই নাই, তাহার বাহিরে পড়িবে কিরূপ? মন আংশিক সত্তা লইয়া কারবার করে, এই জন্যই ভাবের অনুবন্ধিতা (associstion of ideas) তাহাকে নাকে দড়ি দিয়া ক হইতে খ-এ, খ হইতে গ-এ, গ হইতে ঘ-এ ক্রমাগতই ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়।

এই তো গেল, প্রাণ, মন এবং বুদ্ধি, এই তিনের মধ্যেকার প্রভেদ। তিনের মধ্যে একাত্মভাব কিরূপ, তাহা আলোচনা করা যাক্।

বুদ্ধি মন এবং প্রাণের মধ্যে একাত্মভাবের সূচনা।

বুদ্ধি, মন এবং প্রাণের মধ্যে একাত্মভাব কিরূপ, তাহা দেখিতে হইলে, বুদ্ধির নিজাধিকারের অভ্যন্তরেই মন এবং প্রাণ কিরূপ এক-যোগে কার্য্য করে, তাহার প্রতি প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। বুদ্ধি বড়, মন মেজো, এবং প্রাণ ছোটো। যিনি যখন বড় হ'ন, তিনি ছোট এবং মেজো'র ধাপ মাড়াইয়া বড়'র ধাপে উত্থিত হ'ন। বুদ্ধি—প্রাণ এবং মনের ধাপ মাড়াইয়া নিজা-

ধিকারে সমুত্থান করিয়াছে ; কাজেই মন এবং প্রাণের মধ্যে সত্ত্ব যাহা কিছু আছে, সবই বুদ্ধির মধ্যে একাধারে সম্ভুক্ত থাকিবারই কথা। বুদ্ধির নিজাধিকারে মন এবং প্রাণ কি ভাবে সম্ভুক্ত রহিয়াছে, তাহা দেখিতে হইলে, বুদ্ধির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া নির্ব্বাচন করা আবশ্যক— সর্ব্বপ্রথমে তাহাই করা যা'ক্।

বুদ্ধির অঙ্গ নির্ব্বাচন।

কি পশু, কি পক্ষী, কি মনুষ্য—নূতন নূতন অভাব-বোধ সকলকেই নূতন নূতন কার্য্যে প্রবৃত্ত করে। একটা বন-মানুষ—যে ইতিপূর্ব্বে কোনো জন্মে জলে নাবে নাই, তাহাকে যদি একদল শীকারী ঘেরাও করে, তাহা হইলে—পলাইবার আর কোনো পথ না থাকিলে—সম্মুখস্থিত নদীতে ঝম্প প্রদান করিয়া সাঁতরাইয়া নদী পার হওয়া তাহারপক্ষে কিছুই বিচিত্র নহে। বন-মানুষের এইরূপ যত প্রকার বুদ্ধির কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তই শুদ্ধ-কেবল অভাব-বোধের উত্তেজনায় উপস্থিত-মতে ঘটিয়া থাকে। বন-মানুষ কেন—ওরূপ সঙ্কটে পড়িলে জাত্-মানুষও অভাব বোধের উত্তেজনায় ঐরূপে নদী পার হয়। কিন্তু মনুষ্য তাহাতেই ক্ষান্ত থাকে না। মনুষ্যের মনে যখন "নদী পার হওয়া আবশ্যক" এইরূপ একটি অভাব-বোধ উপস্থিত হয়, তখন সে—আর কোনো জন্তু নদীতে সন্তরণ করে কিনা, তাহা চিন্তা করে ; তাহার পরে হংস কিরূপে সন্তরণ করে, মৎস্য কিরূপে সন্তরণ করে, নৌমীন (Nautilus) কিরূপে সন্তরণ করে, তাহা অনুসন্ধান করে ; তাহার পরে, হংসের মুখ্য অবয়বের আদর্শ-অনুসারে একটা কাঠের বাহন নির্ম্মাণ করে ; হংসের পদদ্বয়ের আদর্শ-অনুসারে তাহার দুইটা দাঁড় নির্ম্মাণ করে ; মৎস্যের ল্যাজের আদর্শ-অনুসারে তাহার হাইল নির্ম্মাণ করে, নৌমীনের আদর্শ-অনুসারে

তাহার পাইল নির্ম্মান করে ; এইরূপ একটি বাহন নির্ম্মান করিয়া তাহার নাম দ্যায়—নৌকা।

মনে কর, কূপ হইতে জল তুলিবার জন্য আমার একটা পাত্রের প্রয়োজন হইয়াছে ; অথবা যাহা একই কথা—আমার মনে ঐরূপ একটা পাত্রের অভাব-বোধ হইয়াছে। প্রথমত সে পাত্রের উদর স্ফীত হওয়া চাই—কেন না, তাহা হইলে তাহার অভ্যন্তরে যথেষ্ট পরিমাণ জল ধরিবে, দ্বিতীয়ত তাহার কণ্ঠ উদর অপেক্ষা সরু হ্রস্ব হওয়া চাই এবং মুখরন্ধ্রের চতুষ্পার্শ্ব বাহিরের দিকে বিকুঞ্চিত হওয়া চাই—কেন না, তাহা হইলে তাহার কণ্ঠে রজ্জু বাঁধিয়া তাহাকে ঝুলাইবার সুবিধা হইবে। তৃতীয়ত তাহার উদর এবং কণ্ঠের মধ্যে পরিমাণের সৌষম্য থাকা চাই, এক কথায়—তাহা মানান্-সই হওয়া চাই ; কেন না, তাহা বেমানন্ হইলে আমার মন খুঁৎ খুঁৎ করিবে এবং সেই কারণে তাহাকে ফেলিয়া দিতে ইচ্ছা হইবে। মৃত্তিকার উপাদানে আমি এইরূপ একটা পাত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম দিলাম—ঘট। তাহার পরে আমি ভাবিয়া দেখিলাম যে, মৃত্তিকার উপাদানেই যে ঘট নির্ম্মাণ করিতে হইবে, এমন কোনো বাধ্য-বাধকতা নাই ;—যে-কোনো কঠিন উপাদানে ঐরূপ একটা পাত্র নির্ম্মিত হউক না কেন, তাহাতেই আমার কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। অতএব মৃত্তিকার উপাদান ঘটের মুখ্য অঙ্গ নহে। ঘটের মুখ্য অঙ্গ কি ? না, জল-ধারণ-ক্ষম কাঠিন্য —স্ফীত উদর, হ্রস্ব কণ্ঠ, বিকুঞ্চিত মুখরন্ধ্র, এবং সমস্তের আয়তনের পরিমান-সৌষম্য ; এইগুলি ঘটের মুখ্য অঙ্গ। এইরূপে, ঘটের মধ্য হইতে তাহার মুখ্য অবয়বগুলি বিবিক্ত করিয়া লওয়াকে বিবেচনা কহে।

মনে কর যেন আমিই ঘটের প্রথম উদ্ভাবন-কর্ত্তা এবং লোক-মধ্যে তাহার ব্যবহার-প্রচারের আমিই আদি-গুরু। আমি ভাবিয়া-চিন্তিয়া ঘট

উদ্ভাবন করিয়াছি, এইজন্য ঘট দেখিলেই একটি যুক্তি আমার মনে অতীব সুস্পষ্ট আকারে প্রতিভাত হয়। সে যুক্তি এই :—

যে হেতু ইহা জল-ধারণ-ক্ষম কঠিন, স্ফীতোদর, হ্রস্ব কণ্ঠ, বিকুঞ্চিত মুখ-রন্ধ্র, এবং আদ্যোপান্ত মানান্-সই, অতএব ইহা ঘট। যেহেতু এবং অতএবের মধ্যে এই যে যোগ, ইহারই নাম যুক্তি। যুক্তি-শব্দের অর্থ যে এক প্রকার যোজনা-ক্রিয়া, তাহা তাহার গায়ে লেখা রহিয়াছে। কিসের সহিত কিসের যোজনা? যেহেতুর সহিত অতএবের যোজনা; অথবা যাহা একই কথা—প্রমেয়ের সহিত প্রমানের যোজনা। প্রমাণ শব্দের যে অর্থ কি—তাহাও তাহার গায়ে লেখা রহিয়াছে। প্রমাণ কি? না, সম্মুখবর্ত্তী বিষয়ের মান-কার্য্য কিনা মাপন-কার্য্য। "হস্ত প্রসারণ করা" বলিলে বুঝায়—হস্তকে সম্মুখ-দিকে সারণ করা কিনা সরানো বা বাড়ানো। "প্রতাপ স্ফূর্ত্তি" বলিলে বুঝায়—সম্মুখ-দিকে তাপের বা প্রভাবের স্ফূর্ত্তি। তেমনি "প্রমাণ" বলিলে বুঝায়—সম্মুখবর্ত্তী বিষয়ের মান-ক্রিয়া বা মাপন-ক্রিয়া। তাল-প্রমাণ তরঙ্গ বলিলে বুঝায় যে, তরঙ্গ এত উচ্চে উঠিতেছে যে, তাহা তাল-গাছ দিয়া মাপিয়া দেখিবার বস্তু। কোনো বস্তুকে মাপিয়া দেখিতে হইলে তাহার গাত্রে মান-দণ্ড যোজনা করিতে হয়। যদি বলি যে, এই বস্ত্রখানি এক-হাত লম্বা, তবে তাহার প্রমাণ দেখাইতে হইলে, সেই বস্ত্রখানির দৈর্ঘ্য-অংশ বিস্তারিত করিয়া তাহাতে হস্ত-যোজনা করা আবশ্যক হয়। তেমনি "এটা ঘট" ইহার প্রমাণ দেখাইতে হইলে, ঘটের গাত্রে ঘটত্বের যোজনা করিতে হয় ;—ঘটত্বের যোজনা কিরূপ? না, ইতিপূর্ব্বে যে কয়েকটি ভাবকে ঘটের মুখ্য অবয়ব বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছি—সেইগুলির একত্র সমাবেশ। বলিতেছ "এটা ঘট"—আচ্ছা দেখা যা'ক্ তোমার কথা কতদূর সত্য;—উহার উদর চৌকোণা বাক্সের মতো —অতএব উহা ঘট নহে। পক্ষান্তরে, এ বস্তুটার উদর স্ফীত, কণ্ঠ হ্রস্ব,

মুখরন্ধ্র বিকুঞ্চিত, অতএব, এই বস্তুটাই ঘট। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, বস্ত্রের দৈর্ঘ্য অংশে হস্তযোজনা করিয়া আমরা যেমন বলি যে, বস্ত্রখানি এক-হাত লম্বা, তেমনি ঘটের গাত্রে ঘটত্বের ভাব যোজনা করিয়া যখন আমরা দেখি যে, ঐ বস্তুটির সহিত ঐ ভাবটির ঠিক মিল রহিয়াছে, তখন আমরা বলি যে, এটা ঘটই বটে। বস্ত্রের ব্যালায়—বস্ত্র প্রমেয়, মানদণ্ডের সহিত তাহার ঐক্য হওনই প্রমাণ; ঘটের ব্যালায় ঘট প্রমেয়, ঘটত্বের সহিত তাহার ঐক্য হওনই প্রমাণ। বস্ত্রে মানদণ্ডের যোজনা এবং ঘটে ঘটত্বের যোজনা—দুইই প্রমাণ-শব্দের বাচ্য; এবং বিশেষত শেষোক্ত প্রকার যোজনা—অর্থাৎ ঘটে ঘটত্বের যোজনা—যুক্তি-শব্দের বাচ্য।

মনে কর, আমি একটা ঘটের দোকান খুলিয়া, তাহাতে কাংস্য-ঘট রৌপ্য-ঘট, মৃদ্‌ঘট প্রভৃতি নানাপ্রকার ঘট সাজাইয়া রাখিলাম। অচিরে আমার সেই দোকানে ক্রেতাগণের গমনাগমন হইতে লাগিল। একজন ক্রেতা আমার দোকানে আসিয়া বারবার কাংস্য-ঘট ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছে। আমার দোকানে কাংস্য-ঘট যত ছিল, সব যখন উঠিয়া গিয়াছে, তখন সে ব্যক্তি পুনরায় আমার দোকানে ঘট ক্রয় করিতে আসিল। আমি তাহাকে একটা মৃত্তিকার ঘট দেখাইলাম; তাহা দেখিবামাত্র সে বলিল যে, এটা ঘটই বটে। এ যাহা সে বলিল—কিসের জোরে বলিল? আমিই যখন ঘটের নূতন সৃষ্টিকার, আর, ইতিপূর্ব্বে কোনো ক্রেতার নিকটে আমি যখন মৃদ্‌ঘটের কথা পর্য্যন্ত উত্থাপন করি নাই, তখন উপস্থিত ক্রেতা ইতি-পূর্ব্বে মৃদ্‌ঘট চক্ষে দেখে নাই, ইহা নিঃসংশয়; অথচ আমি তাহার সম্মুখে একটা মৃদ্‌ঘট উপস্থিত করিবামাত্র, তৎক্ষণাৎ সে বলিল "এটা ঘটই বটে।" এ যাহা সে বলিল, কিসের জোরে বলিল? কিসের জোরে বলিল, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। ক্রেতাটি আমার দোকানে আসিয়া অনেক-বার অনেকগুলি কাংস্য-ঘট ক্রয় করাতে, ঘট যে কিরূপ বস্তু, সে সম্বন্ধে তাহার

মনোমধ্যে একটা সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে; মৃদ্ঘট দেখিবামাত্র সেই-তাহার-মনের-সংস্কারটি উপস্থিত মৃদ্ঘটে মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠিল। তাহার ভিতরের সংস্কারটি ভিতর হইতে বাহিরে বিচরণ করিল—মনের মধ্য হইতে ঘটে বিচরণ করিল, আর অমনি সে বলিয়া উঠিল—"এটা ঘট"। ভাবের এইরূপ বিচরণ ক্রিয়ার নাম বিচার; ইংরাজীতে যাহাকে বলে Judgement। এখানে বিশেষ একটি দ্রষ্টব্য এই যে, সেই যে ঘটের ভাব, যাহা ক্রেতার নিজেরই মনোমধ্যে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, তাহা যে কি, তাহা সে জানে না; কেন না, সে-ভাগটি তাহার মনের মধ্যে এখনো বিবেচনা দ্বারা ফুটাইয়া তোলা হয় নাই। সে যখন বলিতেছে যে, "এটা ঘট," তখন তাহার সেই বিচারকার্য্যতেই প্রকাশ পাইতেছে যে, ঘটের ভাব তাহার মনোমধ্যে আছে। তাহা যে তাহার মনোমধ্যে আছে—এটা তাহার কাজে প্রকাশ পাইতেছে; কিন্তু তাহা যে কি, তাহা তাহার জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছে না। সে ব্যক্তি অভ্যস্ত সংস্কারের বলে ঠিক্ই বিচার করিয়াছিল যে, এটা ঘট; কিন্তু হইলে হইবে কি—তাহা একটা সংস্কার বই নহে। পরদিন তাহার একজন বন্ধু তাহাকে বলিল—"ওটা দেখ্‌চি হাঁড়ি।" ইহা শুনিয়া তাহার মনে সংশয় উপস্থিত হওয়াতে, সে আবার দোকানে আসিয়া আমাকে বলিল, "তুমি আমাকে একটা হাঁড়ি দিয়াছ?" আমি তাহাকে বলিলাম যে, হাঁড়ির কণ্ঠ এরূপ কম-চওড়া হয় না, এবং হাঁড়ির ওষ্ঠ এরূপ বিকুঞ্চিত হয় না। তখন তাহার চক্ষু ফুটিল। প্রথমে তাহার মনে সহজেই এইরূপ একটা বিচার উপস্থিত হইয়াছিল যে, "এটা ঘট"; কিন্তু সে বিচার অন্ধ-সংস্কার মূলক। এবারে তাহার মনে সেই বিচারই দৃঢ়তা-প্রাপ্ত হইল—কিন্তু এবারকার বিচার পূর্ব্বের ন্যায় অন্ধ সংস্কার নহে; এবারকার বিচার বিবেচনাত্মক এবং যুক্তি সম্ভাবিত। এবারে সে—ঘটত্ব কিসে হয়, তাহা বিবেচনা-দ্বারা নিষ্কাসন

করিয়া এবং সেই ঘটত্বকে ঘটের সহিত যোজনা করিয়া যুক্তি-পূর্ব্বক বিচার করিল যে, এটা ঘট।

এখানে একটি অতি নিগূঢ় রহস্য আছে; সেটা একেতো বুদ্ধিতে বাহির করা কঠিন—তাহাতে আবার মনে বুঝিলেও, মুখে কিংবা লেখনীতে বাহির করা কঠিন। কিন্তু তাহা কঠিন বলিয়া তাহাকে সরা ইয়া রাখা উচিত হয় না। আমের শাঁস সরস বলিয়া তাহার আঁটিও যে সরস হইবে, এরূপ মনে করা অন্যায়। এইটি এখানে বিবেচনা করা উচিত যে, ভূমিতে আমের আঁটি পুঁতিলেই আম-গাছ গজাইয়া ওঠে; তাহার পরিবর্ত্তে আমের রস সিঞ্চন করিলে কোনো ফলই দর্শে না। বিষয়টা এই ঃ—

অগ্নির দুই অঙ্গ—আলোক এবং উত্তাপ। যে অগ্নির উত্তাপই সর্ব্বস্ব, অথবা আলোকই সর্ব্বস্ব, সে অগ্নি অঙ্গহীন। যে অগ্নির উত্তাপ আছে—আলোক নাই, সে অগ্নি পরিস্ফুট অগ্নি নহে; তেমনি আবার, যে অগ্নির আলোক আছে—উত্তাপ নাই, সে অগ্নি কাজের অগ্নি নহে। অগ্নির যেমন দুই অঙ্গ—উত্তাপ এবং আলোক; বুদ্ধির তেমনি দুই অঙ্গ—শক্তি এবং জ্ঞান। বুদ্ধির বিচার-স্ফূর্ত্তি বা বিচরণ-স্ফূর্ত্তি তাহার শক্তিপ্রধান অঙ্গ এবং বিবেচনা তাহার জ্ঞানপ্রধান অঙ্গ। যে বুদ্ধির বিবেচনা অপেক্ষা বিচার-স্ফুর্ত্তি বেশী প্রবল—সে বুদ্ধি উপস্থিত বুদ্ধি। যে বুদ্ধি বিচারে অপটু, কিন্তু বিবেচনায় সুনিপুণ, সে বুদ্ধি বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি। না উপস্থিত বুদ্ধি—না বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি—অথচ দুইই একাধারে, এইরূপ তৃতীয় আর-এক-প্রকার বুদ্ধি আছে; তাহার নাম প্রতিভা। উপস্থিত বুদ্ধি বিচার-প্রধান; বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বিবেচনা-প্রধান; প্রতিভা যুক্তি-প্রধান। যুক্তি-শব্দে এখানে বুঝিতে হইবে জ্যান্ত যুক্তি;—মৃত ন্যায়-শাস্ত্রীয় যুক্তি বা পুঁথিগত যুক্তি বুঝিলে চলিবে না। একজন প্রতিভাশালী

সুবিজ্ঞ চিকিৎসক যেরূপ যুক্তিতে রোগীর রোগনির্ণয় করেন, তাহা স্বতন্ত্র; এবং একজন বিবিধ ইংরাজী-সংস্কৃত উপাধি-মালায় বিভূষিত আনাড়ি চিকিৎসক যেরূপ যুক্তিতে রোগ নির্ণয় করেন তাহা স্বতন্ত্র। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যেরূপ যুক্তিতে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যূহ সাজাইতেন, তাহা স্বতন্ত্র এবং তাঁহার বিপক্ষদলের সেনাপতি যেরূপ যুক্তিতে ব্যূহ সাজাইতেন, তাহা স্বতন্ত্র। পুঁথিগত যুক্তি যুক্তির একপ্রকার ভাণ বই প্রকৃত যুক্তি নহে।

বিচার বুদ্ধির শক্তি-অঙ্গ। বিচার প্রধান বুদ্ধি স্বীয় শক্তি-প্রভাবে উপস্থিত-মতে কার্য্যোদ্ধার করে বলিয়া তাহার নাম আমরা দিই—উপস্থিত বুদ্ধি। বিচার যেমন বুদ্ধির শক্তি-অঙ্গ—বিবেচনা তেমনি বুদ্ধির জ্ঞানাঙ্গ। বিচার বুদ্ধির হাত-পা—বিবেচনা বুদ্ধির চক্ষু। যে বুদ্ধিতে উপস্থিত বিচার এবং বৈজ্ঞানিক বিবেচনা, দুইই যুক্তি-সূত্রে গ্রথিত—তাহাই যুক্তি-প্রধান বুদ্ধি। যুক্তি-প্রধান বুদ্ধিই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বুদ্ধি এবং তাহারই আর-এক নাম প্রতিভা। বিচার দক্ষিণ হস্তে কার্য্য করে, বিবেচনা বাম হস্তে কার্য্য করে; যুক্তি এক হস্তে দুই হস্তেরই কার্য্য করে। এ যাহা আমি রূপকচ্ছলে হেঁয়ালিচ্ছলে বলিলাম—ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি, তাহা হইলেই তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য সকলেরই বোধগম্য হইবে। একটি শিশুকে আমরা বলি অবোধ শিশু; কেন না, তাহার বুদ্ধি এখনো পরিস্ফুট হয় নাই। তাহার বুদ্ধিরূপী অগ্নির উত্তাপ আছে, কিন্তু আলোক নাই। সেই অবোধ শিশুও বুদ্ধি চালনা করিয়া মাতৃভাষা আয়ত্ত করে—শুদ্ধ-কেবল স্বাভাবিকী বিচারশক্তির প্রভাবে। একজন ইংরাজ বিশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্‌লা-ভাষা শিক্ষা করিলেও সে, বাঙ্‌লা-ভাষা রীতিমত আয়ত্ত করিতে পারে না; কিন্তু একটি বাঙালীর ছেলে সাত বৎসরের মধ্যেই বাঙ্‌লা-ভাষা আয়ত্ত করিয়া ফ্যালে। ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, স্বাভাবিক বিচার-স্ফূর্ত্তির শক্তি বেশী—যদিচ তাহার দৃষ্টি কম। তাহার পরে, যে মাতৃভাষা বালক পিত্রালয়ে শিখিয়াছে,

তাহাই বিদ্যালয়ে নূতন করিয়া শেখে। বিদ্যালয়ে বালকের বিবেচনা মার্জ্জিত হয়—দৃষ্টি মার্জ্জিত হয়। তাহা যখন হয়—তখন বালক তাহার পূর্ব্ব-শিক্ষিত মাতৃভাষা হইতে ভাষার মুখ্য অঙ্গগুলি ক্রমে ক্রমে বিবিক্ত করিয়া লয়। তখন সে বুঝিতে পারে—ভাষা পদার্থটা কি। কিন্তু তাহা বুঝিতে পারিলেও—একখানি পত্র লিখিতে তাহার বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হয়। তাহার যেমন বিবেচনা কতকটা ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছে—তাহার বিচার-শক্তিও সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হওয়া চাই—কিন্তু তাহা তাহার এখনো হয় নাই। পিত্রালয়ে বালক স্বাভাবিকী বিচার শক্তি উপার্জ্জন করিয়াছিল; বিদ্যালয়ে মার্জ্জিত বিবেচনা-দৃষ্টি উপার্জ্জন করিল। তাহার পরে সে যখন বিদ্যালয় হইতে কর্ম্মালয়ে প্রবেশ করিল, তখন সে যুক্তি-দ্বারা স্বাভাবিক বিচার এবং শিক্ষিত বিবেচনা, দুয়ের যোগ-বন্ধন করিয়া সাধুভাষায় চিঠিপত্রাদি লিখিতে আরম্ভ করিল। যুক্তি দ্বারা বিচার এবং বিবেচনার মধ্যে এই যে যোগবন্ধন, ইহার কতক আভাস ইতিপূর্ব্বে আমি জ্ঞাপন করিয়াছি;—তাহা আর কিছু না—যেহেতু'র সহিত অতএবের যোগ-বন্ধন। যেহেতু এ পত্রখানি বিষয়-কর্ম্ম-ঘটিত—অতএব ইহার উত্তর দিতে হইবে সংক্ষিপ্ত প্রাঞ্জল ভাষায়; যেহেতু এ পত্রখানি বাড়ীর লোকের নিকট হইতে আসিয়াছে, অতএব ইহার উত্তর দিতে হইবে ঘরাও ভাষায়। যেহেতু এ পত্রখানি বিজ্ঞান সংক্রান্ত, অতএব ইহার উত্তর দিতে হইবে বৈজ্ঞানিক ভাষায়। উপযুক্ত ভাষা দ্বারা সুনিপুণরূপে কাজ চালাইতে হইলে—শুদ্ধ-কেবল অন্তঃপুরের অশিক্ষিত বিচার-স্ফূর্ত্তি দ্বারাও তাহা সম্ভাবনীয় নহে, আর, শুধু-কেবল পুঁথিগত বৈয়াকরণিক শুদ্ধাশুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারাও তাহা সম্ভাবনীয় নহে। কাজের সময়, অশিক্ষিত বিচার এবং শিক্ষিত বিবেচনা, দুয়ের মধ্যে পদে পদে যোগ-বন্ধন করা নিতান্তই প্রয়োজনীয়; অতএব এবং যেহেতুর মধ্যে পদে পদে যোগ-বন্ধন করা নিতান্তই প্রয়োজ-

-নীয়। কাজের লোক হইতে হইলে, বালক হইলেও চলিবে না, ভট্টাচার্য্য হইলেও চলিবেনা। নিজের বুদ্ধিঅনুসারে পদে পদে যেহেতু এবং অত-এবের সহিত যোগ-বন্ধন করিতে না পারিলে, কাজের মতো কোনো কাজ কাহারো কর্তৃক সম্ভাবনীয় নহে।

বালক যখন পিত্রালয় হইতে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া ব্যাকরণ, ইতি-হাস ভূগোল, প্রভৃতির জ্ঞানোপার্জ্জন-পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হয়, তখন সে নূতন ব্রতী নব নব বিদ্যার আলোকে অন্ধ হইয়া অন্তপুরের অশিক্ষিত সহজ জ্ঞানকে আগাগোড়া কুসংস্কার বলিয়া মনে মনে ঠিক্ দিয়া রাখে, এবং সম-স্তেরই প্রতিবাদ করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু সেই বালক যখন আর কিছু-কাল পরে কর্ম্মালয়ে প্রবেশ করিয়া শিক্ষিত বিদ্যাকে পরীক্ষানলে গলাইয়া তাহাকে কাজে খাটায়, তখন সে অন্তঃপুরমহলের অকৃত্রিম সহজজ্ঞানের মর্য্যাদা বুঝিতে পারে। তখন সে বুঝিতে পারে যে, অন্তঃপুর-সদনের এবং কৃষক-পল্লীর নৈসর্গিক সহজজ্ঞানের মূল এক হিসাবে যেমন পণ্ডিতের মার্জ্জিত জ্ঞান অপেক্ষা অনেক কম, আর-এক হিসাবে তেমনি তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। যাঁহারা আজীবন চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ পড়িয়া প্রৌঢ়বয়সে অসামান্য বৈয়াকরণিক হইয়া উঠেন, আর, সেই ব্যাকরণ জ্ঞানকে মহাজ্ঞান মনে করিয়া সভামধ্যে বুক ফুলাইয়া বেড়া'ন, তাঁহারা একেবারেই কাজের বা'র হইয়া যা'ন। পক্ষান্তরে যাঁহারা শিক্ষিত ব্যাকরণ-জ্ঞানকে ব্যবহার্য্য-ভাষার গায়ে মাখাইয়া সেই ভাষাকে কাজের ভাষা করিয়া দাঁড় করা'ন, আর, সেই ফলপ্রসবিনী ভাষার ব্যবহারে ক্রমে যখন তাঁহাদের হাত পাকিয়া ওঠে, তখন তাঁহাদের ভাষা ফিরেফির্ত্তি আবার বালকের ভাষার ন্যায় স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের আকার ধারণ করে। অন্তঃপুর-সদনের এবং কৃষক-পল্লীর ভাষা সকল সময়ে ব্যাকরণ-সঙ্গত না হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে বক্তার মনের ভাব এরূপ

ত্রম সহজ-শোভন ভাবে উদ্বেলিত হয় যে, কবির নিকটে তাহার মূল্য আঁটাসাঁটা পোষাকপরাণো কৃত্রিম ভাষা অপেক্ষা শতসহস্র গুণ অধিক। প্রথম ধাপের অশিক্ষিত ভাষাতে স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের ভাবই—ফোয়ারার ভাবই—প্রধানত দেখিতে পাওয়া যায়; দ্বিতীয় ধাপের বিগ্যাবাগীশী ভাষাতে বন্ধনের ভাব—নিয়মের ভাব—ব্যবস্থার ভাব—প্রধানত দেখিতে পাওয়া যায়; তৃতীয় ধাপের পরিপক্ক ভাষাতে, উচ্ছ্বাসের ভাব এবং বন্ধনের ভাব, দুইই একাধারে স্ফূর্ত্তি পায়; আর, সেই-কারণবশতঃ তৃতীয় ধাপের ভাষাতে নীচের দুই ধাপের ভাষার দুইপ্রকার গুণ দ্বিগুণ হইয়া উঠে, এবং দুইপ্রকার দোষ প্রক্ষালিত হইয়া যায়। প্রথম ধাপের ভাষার গুণ অকৃত্রিম স্ফূর্ত্তি—দ্বিতীয় ধাপের ভাষার গুণ সুব্যবস্থা। তৃতীয় ধাপের ভাষায় দুয়ের ঐ দুই গুণ একত্র জমাট বাঁধিয়া যায়; আর সেই সঙ্গে দুয়ের দুই দোষ প্রক্ষালিত হইয়া যায়। প্রথম ধাপের ভাষার দোষ হ'চ্চে —অব্যবস্থিত স্ফূর্ত্তি; সে দোষ প্রক্ষালিত হইয়া যায়; এবং দ্বিতীয় ধাপের ভাষার দোষ হ'চ্চে—কৃত্রিম কারিকরি; তাহাও প্রক্ষালিত হইয়া যায়। এই দৃষ্টান্তটির মধ্যে প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, প্রথম ধাপের ভাষাজ্ঞান বিচার-প্রধান উপস্থিত বুদ্ধির যোগে সংঘটিত হয়; দ্বিতীয় ধাপের ভাষাজ্ঞান বিবেচনা-প্রধান বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির যোগে সংঘটিত হয়; তৃতীয় ধাপের ভাষা-জ্ঞান যুক্তিপ্রধান ব্যুৎপন্ন বুদ্ধির যোগে সংঘটিত হয়।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, স্বাভাবিক বিচার-স্ফূর্ত্তি বুদ্ধির শক্তি-প্রধান অঙ্গ; বিবেচনার নিয়ম-বন্ধন বুদ্ধির ভাবনা-প্রধান অঙ্গ; এবং দুয়ের একত্র সমাবেশ-জনিত প্রয়োগ-নৈপুণ্য বুদ্ধির যুক্তি-প্রধান পূর্ণাবয়ব।

যতদূর সহজ প্রণালীতে বুদ্ধির অঙ্গ-নির্ব্বাচন করা সম্ভবে—উপরে তাহা আমি সাধ্যমতে করিলাম। ভাষার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলাম কেন? না, যেহেতু ভাষা বুদ্ধিরই সাক্ষাৎ অভিব্যক্তি। তার সাক্ষী—জ্ঞানগর্ভ

ভাষা শ্রবণ করানোর নামই বুদ্ধি-দান করা; আর, জ্ঞানগর্ভ ভাষা শ্রবণ করার নামই বুদ্ধি-গ্রহণ করা। ভাষাকে ছাড়িয়া বুদ্ধিকে নাগাল পাওয়াও কঠিন—আর, ভাষা-বায়ুর সাহায্য ব্যতিরেকে বুদ্ধির আগুন ধরানোও কঠিন। এইজন্য বুদ্ধির ব্যাপার বুঝিবার এবং বুঝাইবার পক্ষে ভাষার দৃষ্টান্ত খুব কাজে লাগে। Logic শব্দ Logos হইতে হইয়াছে। Logos শব্দের অর্থ Reason এবং language দুইই একাধারে।

এতক্ষণের আলোচনায়, বুদ্ধির তিনটি মুখ্য অবয়বের সন্ধান পাওয়া গেল; সে তিনটি অবয়ব হ'চ্চে—বিচার বিবেচনা এবং যুক্তি। বিচার কি? না, বিচরণ; মনের ভাব হইতে লক্ষ্য-বস্তুতে বিচরণ—অথবা মনের ভাবকে লক্ষ্যবস্তুতে চারাইয়া দেওয়া। তাহা আর কিছু না—"এটা ঘট" এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া ঘটত্বের ভাবকে সাক্ষাৎ-পরিদৃশ্যমান ঘটে প্রতিফলিত দেখা। বিবেচনা কি? না, দৃশ্যমান ঘট হইতে ঘটের ভাবকে বিবিক্ত করিয়া (অর্থাৎ বিযুক্ত করিয়া) দেখা। যুক্তি কি? না, ঘটত্বের ভাব দিয়া বিশেষ বিশেষ ঘটকে মাপিয়া দেখা। যুক্তিতে বিবেচনা এবং বিচার দুইই একযোগে স্ফূর্ত্তি পায়; আর, একযোগে স্ফূর্ত্তি পায় বলিয়াই তাহার নাম হইয়াছে যুক্তি। একজন পাকা জহরী প্রথমত "ভাল হীরা" কাহাকে বলে, তাহা জানে—এইরূপ জানা বিবেচনার কার্য্য; দ্বিতীয় হীরা দেখিলেই বলিতে পারে যে, এটা অমুক মূল্যের হীরা; এইরূপ বলিতে পারা বিচার-শক্তির কার্য্য। তৃতীয়ত কিরূপ হীরা গছাইতে হইবে—ইহা ঠিক্ করা যুক্তির কার্য্য। যুক্তিতে বিবেচনা এবং বিচার, যেহেতু এবং অতএব, দুইই একযোগে কার্য্য করে।

বুদ্ধির অঙ্গ-নির্ব্বাচন মাত্র করিলাম, বুদ্ধির ভিতরে মন এবং প্রাণ কি-ভাবে সম্ভুক্ত রহিয়াছে, তাহা আলোচনা করা যাক্।

বুদ্ধির নিজাধিকারে মন এবং প্রাণের অভিসরণ-চিহ্ন।

প্রথমে দেখা যা'ক্—বুদ্ধির নিজাধিকারে মন কি-বেশে বিচরণ করে এবং কি-ভাবে কার্য্য করে।

বলিয়াছি যে, বুদ্ধির মুখ্য অবয়ব তিনটি—বিচার, বিবেচনা এবং যুক্তি আর, সেই সঙ্গে বলিয়াছি যে, বিচার বুদ্ধির শক্তি-প্রধান অবয়ব; বিবেচনা বুদ্ধির জ্ঞান-প্রধান অবয়ব। এখানে বিশেষ একটি দ্রষ্টব্য এই যে, লোকের প্রথম উদ্যমের বিচার-কার্য্য প্রায়শই উপস্থিতমতে চট্‌পট্ সারিয়া ফ্যালা হইয়া থাকে—সে কার্য্যে বিবেচনাকে বড়-একটা কর্ত্তৃত্ব ফলাইতে অবকাশ দেওয়া হয় না। পাছে বিবেচনা মনের চির-পোষিত সংস্কারের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলে, এই ভয়ে গতানুগতিক লোকেরা সচরাচর বিবেচনাকে ঘাঁটাইতে চাহে না। এক ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র আমি বলিলাম, "এ ব্যক্তি গণ্ডমূর্খ"; দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র বলিলাম, "এ ব্যক্তি মহাপণ্ডিত"; তৃতীয় ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র বলিলাম, "এ ব্যক্তি মস্ত ধনী"। হয় তো আমার সমস্ত কথাই আগা-গোড়া ভুল। প্রথম ব্যক্তি অনেকানেক শাস্ত্রালোচনার বাগ্‌ঝঞ্ঝার মাঝখানে মুখে ছিপি আঁটিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে—ইহা দেখিয়া আমার মনে হইল, "এ ব্যক্তি গণ্ডমূর্খ"; কিন্তু তাঁহাকে যে ব্যক্তি চেনে, সে মনে জানে যে, ইনি একজন মহাপণ্ডিত। দ্বিতীয় ব্যক্তি ভূরিভূরি অজীর্ণ পুঁথির বচন উদ্গীরণ করিয়া সভার মাঝখানে ব্যাপকতা করিতেছে—ইহা দেখিয়া আমার মনে হইল, "এ ব্যক্তি মহাপণ্ডিত", কিন্তু সত্য এই যে, তিনি তাঁহার নিজের মুখ-বিনিঃসৃত শাস্ত্র-বচনের অর্থ নিজেই বোঝেন না—অথবা সোজা অর্থ বাঁকা বোঝেন; মূলের পরিষ্কার অর্থ নানালোকের স্বস্বমতানুযায়ী টীকা এবং ভাষ্যের কর্দ্দম দ্বারা ঘোলাইয়া ফ্যালেন। তৃতীয় ব্যক্তির জম্‌কালো পোষাক দেখিয়া

আমার মনে হইল, "এ ব্যক্তি মস্ত ধনী"; কিন্তু বাস্তবিক এই যে, সে ব্যক্তি তাহার একজন ধনাঢ্য বন্ধুর নিকট হইতে ধার-করিয়া-আনা পোষাক্ পরিয়া নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে আসিয়াছে। যাহাই হো'ক—ভুলই হো'ক্ আর সত্যই হো'ক্—বুদ্ধির বিচার-ক্রিয়া উপস্থিতমতে অষ্টপ্রহরই চলিতে থাকে—তাহা একমুহূর্ত্তও বারণ মানে না; এমন কি—খুনী ব্যক্তিও মহোচ্চ বিচার-পতির সূক্ষ্ম বিচারের উপরে আপনার মনের অনুরূপ নির্দ্দয় বিচারের ছুরি না চালাইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। লোকের প্রথম উদ্যমের বিচার কার্য্য প্রায়শই পুরাতন সংস্কারের প্রবল স্রোতের টানে ভাসিয়া চলে। সেরূপ সরাসরি রকমের বিচার-কার্য্য জ্ঞান-মূলক তত নহে—যত শক্তি-মূলক; আর সে-সে শক্তি, তাহা এক প্রকার গায়ের জোর; তাহাতে যুক্তির তো কথাই নাই—বিবেচনারও স্পষ্ট কোনো চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। বলিলাম—"গায়ের জোর"; তাহার ভাবার্থ আর কিছু না—পুরাতন সংস্কারের বল। পুরাতন সংস্কার জনিত বাসনা এবং রাগ-দ্বেষ মনের ধর্ম্ম; আর সেই সকল জঞ্জালের মধ্য হইতে সত্যকে টানিয়া বাহির করা বুদ্ধির ধর্ম্ম; এ কথা সকলেই স্বীকার করেন।

এটাও কিন্তু দেখা চাই যে, অন্যকে পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিতে হইলে, আপনার গায়ে পঙ্ক না লাগাইয়া সে কার্য্য করিয়া উঠিতে পারা সম্ভবে না। বুদ্ধি যখন মনের নানা প্রকার সংস্কারের মধ্য হইতে সত্য মন্থন করিয়া বাহির করে, তখন সেই সকল সংস্কারের ফেণের ছিটা বুদ্ধির নিজাধিকারে উপসংক্রমণ করে। বাঙালী যুবকেরা যেমন ইংলণ্ডে গিয়া লণ্ডন-নগরে বাঙালি-টোলা পত্তন করে, মন তেমনি বুদ্ধির নিজাধিকারের বক্ষের মাঝে—দলবল লইয়া অবস্থিতি করিতে পারিবার মতো একটা উপনিবেশ পত্তন করে। পুনশ্চ ইংলণ্ড-বাসী বাঙালী যুবকের হ্যাট্‌কোটের মধ্য দিয়া যেমন

বাঙ্গালিত্ব ফুটিয়া বাহির হয়, তেমনি বুদ্ধির ক্রোড়স্থিত মনের নব-প্রস্ফুটিত বিচার-চক্ষুর মধ্য দিয়া পুরাতন সংস্কারের অন্ধতা ফুটিয়া বাহির হয়। এ যাহা আমি বলিতেছি- ইহার জুড়ি-দৃষ্টান্ত অনেক আছে; তাহার মধ্যে নিম্নের উপমাটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর লগ্ন-সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে। মনো-রাজ্যে উহার একটি উপমা দেখিতে পাওয়া যায় এইরূপ :—

রসায়ন বিদ্যা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত— (১) ভৌতিক রসায়ন (inorganic chemistry)। এবং (২) শারীরিক রসায়ন (organic chemistry)। বিরাটপুরীতে ভীম যেমন পাচকবেশে ছাথা দিয়াছিলেন, শরীরপুরীতে ভৌতিক রসায়ন তেমনি শারীরিক রসায়ন-বেশে আবির্ভূত হয়। অন্ন-জলাদির ভৌতিক শক্তি প্রাণের সংস্পর্শে প্রাণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উঠে। কিন্তু তথাপি সময়ে-সময়ে নূতন পিনদ্ধ প্রাণের আবরণের মধ্য দিয়া ভৌতিক শক্তি আপনার পূর্ব্বতন অপ্রাণিকতা'র পরিচয় প্রদান করিতে ছাড়ে না; অজীর্ণ অন্ন প্রাণের শাসন না মানিয়া সময়ে সময়ে পাকস্থলীতে বিদ্রোহ উপস্থিত করিতে ছাড়ে না। তাহা হো'ক—তাহাতে বিশেষ কিছুই আইসে যায় না,—অন্ন জলের সারাংশ প্রাণের সহিত মিশিয়া প্রাণ হইয়া যায়. ইহা সকলেরই জানা কথা। তেমনি মন যখন বুদ্ধির নিজাধিকারে প্রবেশ করে, তখন, শরীর যেমন অন্নের ভৌতিক শক্তিকে আপনার প্রাণের সহিত মিশাইয়া আপনার করিয়া লয়, বুদ্ধি তেমনি আপনার ক্রোড়াশ্রিত মনকে আপনার জ্ঞানের সহিত মিশাইয়া আপনার করিয়া লয়। পুনশ্চ, পাকস্থলী যে পরিমাণে অভ্যাগত অন্নকে আপনার করিয়া লয়, সেই পরিমাণে শরীরে বলাধান হয়; তেমনি বুদ্ধি যে পরিমাণে মনকে আপনার করিয়া লয়, সেই পরিমাণে তাহার বিচারকার্য্যে বল পৌঁছে। প্রাণ যেমন ভুক্ত অন্নকে জঠরানলে গলাইয়া তাহাকে আত্মসাৎ করে, বুদ্ধি তেমনি মনের সমস্ত পূর্ব্বতন প্রাতিভাসিক

সংস্কারকে জ্ঞানানলে গলাইয়া আত্মসাৎ করে, আর তাহাই উপস্থিত বুদ্ধির স্বাভাবিক-বিচার-শক্তি-রূপে পরিণত হয়। স্বাভাবিকী বিচার-শক্তি কিয়ৎকাল ধরিয়া হামাগুড়ি দিতে দিতে ক্রমে যখন দাঁড়াইতে শেখে, তখন বিবেচনা তাহাকে পথ প্রদর্শন করে এবং বিবেচনার দেখাইয়া-দেওয়া পথে যুক্তি তাহাকে হাত ধরিয়া পায়চারি করিয়া লইয়া বেড়ায়।

বুদ্ধির প্রথমাবস্থার বিচার-কার্য্যের সহিত যখন, অবসর বুঝিয়া অল্পে-অল্পে পা বাড়াইয়া বিবেচনা আসিয়া জোটে, তখন বিচার-কার্য্যের মধ্য হইতে "আমি বিচার করিতেছি", এইরূপ একটা কর্ত্তৃত্ব-বোধ ফুটিয়া বাহির হয়;—সাংখ্যদর্শন এই প্রকার কর্ত্তৃত্ব বোধের নাম দিয়াছেন অহঙ্কার। কর্ত্তৃত্ব-বোধ জন্মে কখন? না যখন বিবেচনা আসিয়া বিচার্য্য-বিষয়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া নির্ব্বাচন করে—"ইহার নাম কর্ত্তা, ইহার নাম কর্ম্ম, ইহার নাম ক্রিয়া", এইরূপে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া নির্ব্বাচন করে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে—বিবেচনার আগমনের পূর্ব্বে—বিচার-কার্য্য, কতক বা স্বাভাবিক সংস্কারের টানে কতক বা শিক্ষিত সংস্কারের টানে, উৎস-উৎসারণের ন্যায় সহজভাবে চলিয়া যাইতে থাকে। মনুষ্যের একপ্রকার স্বাভাবিক বিচার-শক্তি আছে—ইংরাজিতে যাহাকে বলে common sense। বিবেচনা এবং যুক্তি আসিয়া সেই লৌকিক জ্ঞানের (common sense এর) ভূমির উপরে মার্জ্জিত জ্ঞানের বা বিজ্ঞানের মূল পত্তন করে। বুদ্ধির নিজাধিকারের সীমার অভ্যন্তরে যদি পুরাতন মানসিক সংস্কারের, এক কথায়—মনের, নূতন মূর্ত্তি দেখিতে চাও, তবে লৌকিক জ্ঞানের স্বাভাবিক বিচারশক্তিই সেই বুদ্ধিঘাঁসা মন বা মনঘাঁসা বুদ্ধি যাহার তুমি দর্শনাকাঙ্ক্ষী।

এতক্ষণ ধরিয়া যাহা বলিলাম, তাহাতে এটা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বুদ্ধি মনকে আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া আপনার করিয়া লয়।

সেনা যেমন সেনাপতির বল বা শক্তি বা তেজ, এবং সেনাপতি যেমন সেনার চক্ষু বা মস্তক বা নিয়ামক; মন তেমনি বুদ্ধির শক্তি, এবং বুদ্ধি তেমনি মনের চক্ষু। বুদ্ধি শুধু যে কেবল মনকেই নিজাধিকারে টানিয়া তুলিয়া আপনার করিয়া লয় তাহা নহে, প্রাণকেও আপনার করিয়া লয়। আমরা অনেক সময়ে বলি যে, "অমুককে আমি প্রাণতুল্য ভালবাসি"; কিন্তু একটি-বার কাহারো মুখ দিয়া এরূপ কথা বাহির হয় না যে, "আমি অমুককে মনতুল্য ভালবাসি"। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে এই যে, মন যদিও মধ্যম এবং প্রাণ যদিও কনিষ্ঠ, তথাপি স্নেহ যেহেতু নিম্নগামী, এইজন্য বুদ্ধির ভালবাসা মেজোকে ডিঙাইয়া ছোটো'র প্রতি দৌড়ায়, মনকে ডিঙাইয়া প্রাণের প্রতি দৌড়ায়। প্রাণ অপেক্ষা মন বয়সে বুদ্ধির নিকটবর্ত্তী, ইহা খুবই সত্য; কিন্তু তথাপি বুদ্ধি আপনার জ্ঞানের চরম পরিপক্কতার আদর্শ প্রাণেতে যেমন মূর্ত্তিমান্ দেখিতে পায়, মনেতে তেমন নহে। মনেতে তাহা দেখিতে না পাইবারই কথা; ধান্য-বৃক্ষের শীর্ষস্থিত ধান্য মৃত্তিকা প্রোথিত বীজেই আপনার সাদৃশ্য দেখিতে পায়, মাঝের বৃন্ত এবং পত্রাদিতে তাহা দেখিতে পায় না; উন্নত বিজ্ঞান যেমন মূল-স্থানীয় বেদোপনিষৎ-শাস্ত্রে চরম কথা খুঁজিয়া পায়—মধ্যম-স্থানীয় পুরাণাদিতে তেমন নহে। ফল কথা এই যে, মনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র বিক্ষেপের ভাব প্রথমেই দর্শকের চক্ষে পড়ে; এ ভাবটি অপেক্ষাকৃত অপ্রীতিকর। পক্ষান্তরে প্রাণের সঙ্গে একপ্রকার নিরাকুল প্রশান্তির ভাব সর্ব্বদাই লাগিয়া আছে—সে ভাবটি জ্ঞানের আদর্শ-স্থানীয়। জীবের অন্তর মহলে সুষুপ্তি এবং বাহির-মহলে তরুলতাদি উদ্ভিদ-পদার্থ প্রাণের মুখ্য বসতি-স্থান। কচি বালক যখন নিদ্রা যায়, তখন তাহারি সর্ব্বশরীরে, বিশেষত মুখমণ্ডলে, নিরুদ্বেগ প্রশান্তির ভাব কেমন মনোহর-মূর্ত্তি ধারণ করে—মাতা যেমন তাহার মর্ম্মজ্ঞ, এমন আর কেহই নহে। বৃক্ষলতাদিতে

কি-যে-এক রমণীয় সর্ব্বসহ অটল স্থৈর্য্যের ভাব বিরাজমান রহিয়াছে—কবি যেমন তাহার মর্ম্মজ্ঞ, এমন আর কেহই নহে। কালিদাস বলিয়াছেন :—

"অনুভবতি হি মূর্দ্ধ্না পাদপস্তীব্রমুষ্ণং
শময়তি পরিতাপং ছায়য়া সংশ্রিতানাম্ ॥"
মস্তকে পাদপ সহে রৌদ্রের প্রকোপ।
ছায়াদানে আশ্রিতের তাপ করে লোপ ॥

প্রাণের নিরাকুল প্রশান্তি এবং অটল স্থৈর্য্য, স্থির-বুদ্ধির প্রধানতম আদর্শ। দ্বিপ্রহর রজনীর ঝিল্লীরব নিনাদিত নিস্তব্ধতার সহিত নিবিড় অশ্বত্থ-বট-বৃক্ষের নিস্তব্ধতার সুর মেলে কেমন চমৎকার! দ্বিপ্রহর রজনীতে যেমন নিদ্রিত জগতের প্রাণ নিস্তব্ধ ভাবে স্পন্দিত হয়, আরণ্যক ওষধি-বনস্পতির মধ্যে সেইরূপ নিস্তব্ধভাবে প্রাণক্রিয়া চলিতে থাকে।

বলিতেছি বটে যে, নিদ্রিত বালকের এবং বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদ-পদার্থের দেহাশ্রিত প্রাণ-ক্রিয়ার নিরাকুল প্রশান্ত-ভাব, স্থির-বুদ্ধির আদর্শস্থল; কিন্তু তাহা কিরূপ আদর্শস্থল? শিশুর অমায়িক সরলতা যেমন প্রবীণ জ্ঞানী-দিগের আদর্শ-স্থল, উহা সেইরূপ ঐকাংশিক আদর্শস্থল; তা বই, সর্ব্বাংশিক আদর্শস্থল নহে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, জল বায়ু-মৃত্তিকার নির্যাসই বৃক্ষলতাদির প্রাণ; দোঁহার প্রাণের সম্বল দোঁহার হাতের কাছেই অষ্টপ্রহর বাঁধা রহিয়াছে; এরূপ অবস্থায়, জীব প্রশান্ত এবং নিরাকুল হইবে না তো কি?—তাহা তো হইবারই কথা। কিন্তু একটা আরণ্যক সিংহের ক্ষুধার উদ্রেক হইলে তাহাকে কত করিয়া দিগ্‌বিদিক্ অন্বেষণ করিতে হয় কত ফন্দি করিয়া শিকার সংগ্রহ করিতে হয়? এরূপ প্রাত্যহিক কাজের ঝঞ্ঝা-টের মধ্যেও সিংহ যে আপনার রাজকীয় স্থৈর্য্য এবং গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয়—ইহাই আশ্চর্য্য! প্রাণের স্থৈর্য্য-গাম্ভীর্য্য মনের নিজাধিকারে প্রবেশ করিলে তাহা যেরূপ মূর্ত্তি ধারণ করে, তাহাই আমরা সিংহেতে

দেখিতে পাই; কিন্তু সেই প্রাণের স্থৈর্য্য যখন আরো একধাপ উপরে উত্থান করে; মনের ধাপ ছাড়াইয়া বুদ্ধির নিজাধিকারে উত্থান করে; প্রাণের স্থৈর্য্য যখন বুদ্ধির স্থৈর্য্যরূপে পরিণত হয়; তখন তাহা অপর কোনো জীবেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—কেবল বিশেষ বিশেষ প্রভাব শালী মনুষ্যেতেই আদর্শীভূত দেখিতে পাওয়া যায়। ভীষণ যুদ্ধের প্রারম্ভ-কালে যখন বিপক্ষদলের সৈন্য সামন্ত চতুর্দ্দিক্ দিয়া ঝাঁকিয়া পড়িয়া প্রথম নেপোলিয়নের সেনা মণ্ডলীকে গ্রাস করিবার জন্য উদ্যত; প্রথম নেপো-লিয়ন তখন রণ-ক্ষেত্রে বসিয়া পারিস্‌নগরের বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী কিরূপ হইলে ভাল হয়, তাহার একটা সমীচীন ব্যবস্থা-প্রণালী লিপিবদ্ধ করিতেছেন; লিপিবদ্ধ করিয়াই তাহা দূতযোগে পারিস্‌নগরে কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকটে প্রেরণ করিলেন। পারিস্‌নগরে বিদ্রোহের ভস্মা-চ্ছাদিত অনল কখন্ কোন্ দিক্ দিয়া ফুঁড়িয়া বাহির হয়, তাহার ঠিকানা নাই; রণস্থলের কোন্ দিক্ দিয়া প্রলয়াগ্নির বজ্র-বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তাহার ঠিকানা নাই—এরূপ অবস্থায় চারিদিকের মহাভীষণ ব্যাপারের মধ্যে মুহূর্ত্তেকের জন্য বুদ্ধিকে স্থির রাখাই কঠিন; কিন্তু সেই পৃথিবীর ওলট্-পালটের সময় নেপোলিয়ন শুধু যে বুদ্ধিকে স্থির রাখিতেছেন তাহা নহে—বুদ্ধিকে সম্যক্ বিচক্ষণতার সহিত কার্য্যে খাটাইতেছেন; একটা বুদ্ধিকে দিয়া দশটা বুদ্ধির কাজ করাইয়া লইতেছেন। জ্ঞানবান্ মনুষ্যের এইরূপ যে অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য, তাহার গোড়া'র কথা—স্বাভাবিক সংস্কারও নহে—অভ্যস্ত সংস্কারও নহে—তাহার গোড়া'র কথা বুদ্ধির স্থৈর্য্য।

প্রাণ উদ্ভিদ-পদার্থের ন্যায় স্থির-ভাবে স্পন্দিত হয়, মন পশুপক্ষীদিগের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করিয়া ছুটিয়া বেড়ায়। দুয়েরই গাত্রে দুইপ্রকার দোষ জড়ানো রহিয়াছে। দুয়ের দুই গুণও পরস্পরের বিপরীত; দুয়ের দুই দোষও পরস্পরের বিপরীত। বৃক্ষলতাদির গুণ স্থৈর্য্য, দোষ অল্পদেশ-

ব্যাপিতা এবং জড়তা; পশুপক্ষীদিগের গুণ সচেতনতা এবং বহুদেশব্যাপিতা, দোষ বিক্ষেপ এবং চঞ্চলতা। মনের বিক্ষেপ এবং প্রাণের স্থৈর্য্য, দুইকেই বুদ্ধি নিজাধিকারে টানিয়া তুলিয়া আপনার করিয়া লয়; ইহাতে ফল হয় এই যে, দুয়ের দুই প্রকার দোষ পরস্পরের সংঘর্ষে মার্জ্জিত হইয়া যায়; এবং দুয়ের দুইপ্রকার গুণ পরস্পরের সংসর্গগুণে দ্বৈগুণ্য লাভ করে। একজন স্থির-বুদ্ধি রাজাকে দেখ—দেখিবে যে, তিনি বহুধা-বিচিত্র রাজ-কার্য্যের মধ্যে আপনার মনের স্থৈর্য্য-গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতেছেন। বহুধা-বিচিত্র বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হওয়া মনের ধর্ম্ম; পক্ষান্তরে বহুধা-বিচিত্র কার্য্যে লিপ্ত হওয়া ও বিভ্রান্ত না-হওয়া বুদ্ধির ধর্ম্ম। স্থির-ভাবে বাঁধা-নিয়মে নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতি কার্য্য চালানো প্রাণের ধর্ম্ম; পক্ষান্তরে রাজধর্ম্মে অচলের ন্যায় স্থির থাকিয়াও চোকো‌লো-ভাবে সমস্ত রাজ্যের শুভাশুভের বার্ত্তা-গ্রহণ করা ও তৎপরতা এবং বিচক্ষণতার সহিত শুভের সাহায্য এবং অশুভের প্রতীকার করা বুদ্ধির ধর্ম্ম। এইরূপ, বুদ্ধিতে যখন একদিকে প্রাণের স্থৈর্য্য এবং আর-এক দিকে মনের বহুব্যাপিতা, দুইই একাধারে মিলিত হয়, তখন দুয়ের দুই দোষ খণ্ডিত হইয়া যায়, এবং দুয়ের দুই গুণ দ্বিগুণিত হয়। বুদ্ধি যখন মন এবং প্রাণকে নিজাধিকারে টানিয়া তুলিয়া দুইকে আপনার করিয়া লয়—তখনই বুদ্ধি পরিপক্কতা লাভ করে; তখন বুদ্ধির অভ্যন্তরে একদিকে বহুত্ব একত্ব-গর্ভ হইয়া জ্ঞানের জ্যোতি বিকীর্ণ করে এবং আর-একদিকে একত্ব বহুত্ব গর্ভ হইয়া শক্তির বলবত্তা সাধন করে। এইরূপ পরিপক্ক বুদ্ধির অভ্যন্তরে প্রাণও থাকে, মনও থাকে; থাকে দুইই, তবে কি না, প্রাণের সংসর্গ-গুণে মনের চঞ্চলতা সংশোধিত হইয়া যায়, এবং মনের সংসর্গ-গুণে প্রাণের জড়তা সংশোধিত হইয়া যায়। প্রাণ বা মনের নিজগুণে এরূপ হয় না;—হয় তা কেবল বুদ্ধির সংস্পর্শ-গুণে। একবাটি জলে মিছরির ড্যালা এবং বাতাসা ফেলিয়া দিলে, সেই মিছরির ড্যালা এবং

বাতাসা জলেরই সংস্পর্শ-গুণে একীভূত হইয়া যায়, তাহাদের আপন গুণে নহে; তেমনি বুদ্ধিরই নিজগুণে বুদ্ধির নিজাধিকারে মন এবং প্রাণ একীভূত হইয়া যায়। এবারে পঠকবর্গের ধারণার উপযোগী করিয়া অনেকগুলি নিগূঢ় কথা উপমাচ্ছলে বলিলাম;—কিন্তু ঐ কথাগুলির ভিতরে প্রকৃতি তত্ত্ব যাহা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা এখনবিবৃত করিয়া বলিতেছি।

মোট-বন্ধন।

সার সত্যের আলোচনার প্রথম উপক্রমে সত্য-জগৎ এবং ভাব জগতের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখানো হইয়াছে যে, একই জগৎ একদিকে সৎস্বরূপের অধিষ্ঠানে সত্তাবান্ সুতরাং সত্য কিনা সৎসম্পর্কীয়, আর একদিকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকটে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগত ভাব। সেই সঙ্গে এটাও ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, ভিন্ন ভিন্ন ভাব-জগতের সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাতা যেমন ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মা, একমাত্র অদ্বিতীয় সত্য-জগতের সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাতা তেমনি একমাত্র অদ্বিতীয় পরমাত্মা।

দ্বিতীয় উপক্রমে—জীবাত্মা হইতেই যাত্রারম্ভ করা বিধেয় এবং জীবাত্মা হইতে যাত্রারম্ভ করিতে হইলে জীবাত্মা আপনার জ্ঞানে আপনি কিরূপ প্রতীয়মান হ'ন, তাহাই সর্ব্বাগ্রে আলোচ্য এইরূপ বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া দেখানো হইয়াছে যে, জীবাত্মার প্রধানতম তিনটি অবস্থা হ'চ্চে জাগ্রত স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি; আর, জীবাত্মা আপনার নিকটে আপনি প্রকাশ পাইবার সময় সেই তিন বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে একই অভিন্ন কর্ত্তা ভোক্তা এবং জ্ঞাতা রূপে প্রকাশ পা'ন। সেই সঙ্গে এটাও ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, ভোগ, কর্ম্ম এবং জ্ঞান, এই তিনটি ব্যাপার জীবাত্মার তিনটি প্রধানতম গুণ-স্ফূর্ত্তি।

তৃতীয় উপক্রমে ভোগ কর্ম্ম এবং জ্ঞান, এই তিনটি মৌলিক ব্যাপারের

সহিত প্রাণ মন এবং বুদ্ধি, এই তিনটি অন্তঃকরণ-বৃত্তির থাপে-থাপে মিল রহিয়াছে দেখাইয়া—প্রাণ মন এবং বুদ্ধির ভেদাভেদসম্বন্ধীয় সার কথাগুলি বিস্তার পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করা হইয়াছে ; বলিতে আরম্ভ করিয়া তিনের মধ্যগত বৈশেষিক লক্ষণগুলির আলোচনা-কার্য্য প্রথম চোটে যতদূর সম্ভবে তাহা একপ্রকার করিয়া-চোকা হইয়াছে। দেখানো হইয়াছে যে,—

(১) প্রাণ ভোগ-প্রধান ; মন ক্রিয়া-প্রধান অথবা যাহা একই কথা—প্রবৃত্তি-প্রধান ; বুদ্ধি জ্ঞান প্রধান।

(২) প্রাণের গতি তরঙ্গের উত্থান পতনের ন্যায় স্বস্থানেই আবদ্ধ ; অর্থাৎ প্রাণ-ক্রিয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গ্রহণ বর্জ্জনের ন্যায় প্রকৃতির বাঁধা নিয়মে নিরন্তর সমভাবে চলিতে থাকে। মনের গতি বিক্ষেপাত্মিকা ; মনঃক্রিয়া ভাবের-অনুবন্ধিতা-মূলক প্রতিযোগের পথানুবর্ত্তী। বুদ্ধির গতি সমাধি-মুখী ;—বুদ্ধিক্রিয়া অগ্রপশ্চাৎ-বিবেচনা মূলক সংযোগের পথানুবর্ত্তী।

(৩) প্রাণের বিশেষ কার্য্যকারিতা দেখিতে পাওয়া যায় সুষুপ্তির অবস্থায় ; মনের—স্বপ্নাবস্থায় ; বুদ্ধির জাগরিতাবস্থায়। শেষোক্ত কথাটি আমাদের দেশে এমনি সুপ্রসিদ্ধ যে, জাগরিতাবস্থার নামই প্রবুদ্ধ অবস্থা।

(৪) প্রাণের বিচরণ-ক্ষেত্র অব্যক্ত সত্তা ; মনের—প্রাতিভাসিক সত্তা বুদ্ধির--বাস্তবিক সত্তা।

প্রাণ, মন এবং বুদ্ধির পৃথক পৃথক বৈশেষিক লক্ষণগুলি এক-তো এই-রূপ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখানো হইয়াছে ; তা ছাড়া—স্থানে স্থানে তিনের মধ্যস্থিত একাত্মভাবের কতক কতক আভাস প্রদান করিতেও ত্রুটি করা হয় নাই। কিন্তু তাহা আভাস-মাত্র ; তা বই—তাহা জিজ্ঞাসু ব্যক্তির আকঙ্ক্ষা মিটিতে পারিবার মতো পরিষ্কার অভিজ্ঞপ্তি নহে। কর্ত্তব্য হ'চ্চে এখন—তিনের মধ্যগত একাত্মভাবের প্রকৃত বৃত্তান্তটি স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলা, তাহা হইলেই পাঠক এবং লেখকের মধ্যে বোঝা-পড়া'র

গোলোযোগ মিটিয়া যাইবে ;—লেখক কোন্ কথা কি অর্থে বলিয়াছে, তাহা খুঁজিয়া-পাতিয়া বাহির করিবার জন্য পাঠককে আর অন্ধকারে হাতড়াইতে হইবে না।

প্রাণের অব্যক্ত-চেতনতা।

একটু স্থির-চিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, প্রাণ দুই নৌকায় পা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে; এক নৌকা হ'চ্চে চেতনা, আর এক নৌকা জড়তা। প্রাণের গতিও তদ্‌বৎ—অর্থাৎ দুই নৌকায়-পা-দেওয়া রকমের। সে গতি আর-কিছু না—নিশ্বাস হইতে প্রশ্বাস, প্রশ্বাস হইতে নিশ্বাস; অন্নগ্রাহী কণ্ঠনলীর সঙ্কোচ হইতে বিকোচ, বিকোচ হইতে সঙ্কোচ; হৃৎপিণ্ডের উত্থান হইতে পতন, পতন হইতে উত্থান, এইরূপে এপাশ-ওপাশ করিয়া হেলন-দোলন; এক কথায়—স্পন্দন।

সম্প্রতি পাশ্চাত্য-দর্শন-রাজ্যে একটি পুরাতন কথাকে নূতন উপাধি দিয়া সাজানো হইয়াছে। উপাধিটি হ'চ্চে Subconscious। Subconsciousness একপ্রকার অবগুণ্ঠনবতী সন্ধ্যাচ্ছায়া; না তাহা ব্যক্ত-চেতনা'র দিবালোক—না তাহা অচেতনতা'র নিশান্ধকার—পরন্তু দুয়ের মাঝামাঝি, তাহা অব্যক্ত চেতনা। এই Subconscious উপাধিটি প্রাণের দুই-নৌকায় ভর দেওয়া প্রকৃতির সহিত দিব্য সংলগ্ন হয়। চলিতভাষায় কথোপকথনের সময় প্রাণ এবং মনের মধ্যগত প্রভেদকে গ্রাহ্যের মধ্যে বড়-একটা আমল দেওয়া হয় না। "মন ঠাণ্ডা হ'ল". "প্রাণ ঠাণ্ডা হ'ল", এ দুই কথার মধ্যে, অথবা "মন চায়", "প্রাণ চায়", এই দুই কথার মধ্যে—ধরা-পাকড়া করিলে—প্রভেদ অস্বীকার করিতে পারা যায় না সত্য, কিন্তু তথাপি—লৌকিক ধাঁচার কথাবার্তার মাঝখানে সে প্রভেদ কাহারো বড়-একটা গ্রাহ্যের মধ্যে আসে না। পক্ষান্তরে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, দর্শনাদি শাস্ত্রের আলোচনাকালে মন এবং বুদ্ধিকেই কেবল অন্তঃ

করণের কোটায় স্থান দেওয়া হয়; প্রাণকে মনে করা হয়, অচেতনতা-প্রযুক্ত অন্তঃকরণের কোটায় স্থান পাইবার অনুপযুক্ত। প্রাণবেচারীর প্রতি এইরূপ শক্ত আইন জারি করিয়া তাহার প্রাণে আঘাত করা বড় যে ভাল কাজ, তাহা বলিতে পারি না। সত্য বটে—প্রাণ অব্যক্ত-চেতন (Subconscious); কিন্তু সেই অপরাধে তাহাকে সর্ব্বসমক্ষে একান্ত-পক্ষেই অচেতন (Unconscious) বলিয়া খোটা দেওয়া, অন্তঃকরণের কোটা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড বিধান করা হয়—ইহা যখন বুঝিতেই পারা যাইতেছে, তখন, জানিয়া শুনিয়া কে এমন নির্ব্বোধ বিচার-পতি যে, তিনি সামান্য অপরাধে ঐরূপ অতি দণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করিয়া আপীলআদালতের বিচারে নিজে দণ্ডার্হ হইবেন? ইহার বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতের ধর্ম্মাসন হইতে যেরূপ সুবিচার-প্রাপ্তি প্রত্যাশা করা যায়, তাহা এই :—

পরীক্ষারূপা প্রবীণ সাক্ষীর জবানবন্দিতে প্রমাণ হইতেছে এই, যে প্রাণ অব্যক্ত চেতন। তবেই হইতেছে যে, প্রাণ একান্ত-পক্ষেই অচেতন নহে। তাহা যখন নহে—একান্ত-পক্ষেই অচেতন যখন নহে—তখন অবশ্য প্রাণ এক হিসাবে অচেতন, আর এক হিসাবে সচেতন। প্রাণ যে হিসাবে সচেতন সে হিসাবে তাহা বুদ্ধি এবং মনের দলভুক্ত, সুতরাং অন্তঃকরণের কোটায় স্থান পাইবার অনুপযুক্ত নহে।

উচ্চ আদালতের প্রথানুযায়ী এইরূপ নিক্তির ওজনের বিচারকে যথার্থ ন্যায়-বিচার জানিয়া তদনুসারে আমি বুদ্ধি, মন এবং প্রাণ, তিনকেই অন্তঃ-করণের কোটায় একসঙ্গে বসাইলাম—একসঙ্গে বসাইয়া তিন ভ্রাতার একত্র মেলামেশা-গতিকে তাহাদের ভ্রাতৃসৌহার্দ্দের ম্লানমুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠে কিনা, তাহার পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলাম। পরীক্ষা করিয়া পাইলাম কি—সেইটিই এখন জিজ্ঞাস্য! পাইলাম যে কি, তাহা "ফলেন

পরিচীয়তে”; অতএব নিম্নের উদাহরণগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করা হো’ক্।

প্রাণ এবং মনের একাত্মভাব।

প্রথম উদাহরণ।

সুনিদ্রার সময় যখন নিদ্রিত ব্যক্তির নিশ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া স্বভাব-গুণে আপনাআপনি চলিতে থাকে, তখন তাহাকে বলা হয় প্রাণ ক্রিয়া। পক্ষান্তরে, প্রাণায়ামসাধনের সময় যখন সাধকের নিশ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া শাস্ত্রোক্ত নিয়মে পরিচালিত হয়, তখন তাহাকে বলা হয় মানসী ক্রিয়া। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, নিদ্রিত ব্যক্তির কথা এবং প্রাণায়াম সাধকের কথা ছাড়িয়া দিয়া, জাগ্রৎ-কালে লোকে সচরাচর যেভাবে নিশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ-বর্জ্জন করে, সে-ভাবেয় শ্বাস-ক্রিয়াকে কোন্ শ্রেণীর ক্রিয়া বলিব? প্রাণ ক্রিয়া বলিব, না মনঃক্রিয়া বলিব? আমি এই যে নিশ্বাস-প্রশ্বাস টানিতেছি ফেলিতেছি —টানিতেছি-ফেলিতেছি কিসের বলে? মনের বলে—না প্রাণের বলে? ইহার উত্তর এই যে মনে করিলেই মনের বলে, মনে না করিলেই প্রাণের বলে। এরূপ স্থলে প্রাণ এবং মনের অধিকারের সীমা-নির্দ্দেশ করা একপ্রকার অসাধ্যসাধনা। আমি যখন দেখি যে, জাগরিতাবস্থায় ইচ্ছা করিলেই আমি আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের পরিচালনা স্থগিত করিতে পারি, তখন আমি বলি যে, আমার এই জাগরিতাবস্থার শ্বাস-ক্রিয়াতে আমার মন নিরবচ্ছেদে লাগিয়া আছে; সংক্ষেপে—জাগরিতাবস্থার শ্বাস-ক্রিয়া মননস্থা। পক্ষান্তরে, আমি যখন দেখি যে, জাগরিতাবস্থাতেও আমার শ্বাস ক্রিয়া আমার মনোযোগের অপেক্ষা না করিয়া আপনাআপনি চলিতে থাকে, তখন আমি আর-এক কথা বলি; তখন বলি যে, জাগরিতাবস্থার শ্বাস-ক্রিয়া সুষুপ্ত অবস্থার শ্বাস-

ক্রিয়ারই যমক সহোদর ;—তাহাও অমনস্কা। তবেই হইতেছে যে, জাগরিতাবস্থার শ্বাস ক্রিয়া এক হিসাবে সমনস্কা, আর-এক হিসাবে অমনস্কা, যে হিসাবে তাহা সমনস্কা, সেই হিসাবে তাহা মনঃক্রিয়া ; যে-হিসাবে তাহা অমনস্কা, সেই হিসাবে তাহা প্রাণ-ক্রিয়া।

দ্বিতীয় উদাহরণ।

একটি দুই-বৎসরের বালক মাতার ক্রোড়ে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া নিমীলিত চক্ষে স্তনপান করিতে করিতে জাগিয়া-উঠিয়া উন্মীলিত চক্ষে স্তনপান করিতে লাগিল। এরূপ স্থলে বালকটির জাগরিতাবস্থায় সুপ্তাবস্থারই পান-ক্রিয়ার লেজুড় চলিতেছে, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। তবেই হইতেছে যে, জাগরিতাবস্থাতেও বালকটির পানক্রিয়া অমনস্কা। আর-এক দিকে দেখা যায় যে, মাতা যখন কোনো আবশ্যক গৃহকার্যের অনুরোধে ক্রোড়স্থ বালকটির মুখ হইতে স্তনাগ্র ছাড়াইয়া লইতে চেষ্টা করেন—বালকটি তখন কিছুতেই তাহা ছাড়িতে চাহে না ; ইহাতে প্রমাণ হইতেছে এই যে, বালকটি মনের সহিত স্তনপান করিতেছে, সুতরাং তাহার পান-ক্রিয়া সমনস্কা। এবারে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, জাগ্রৎকালের স্তনপান-ক্রিয়া এক হিসাবে অমনস্কা, আর-এক হিসাবে সমনস্কা। যে-হিসাবে তাহা অমনস্কা, সেই হিসাবে তাহা প্রাণ ক্রিয়া, যে-হিসাবে তাহা সমনস্কা, সেই হিসাবে তাহা মনঃক্রিয়া।

তৃতীয় উদাহরণ।

একজন গায়ক যখন নিভৃত তরুতলে ভাবে ভোর হইয়া সঙ্গীত-লহরীতে প্রাণ-মন ঢালিয়া দিতেছে, তখন মাতা সরস্বতী তাহার কণ্ঠে আবির্ভূত হইয়া গান করিতেছেন, অথবা গায়ক নিজে গান করিতেছে, তাহা বলিতে পারা সুকঠিন। এরূপ স্থলে গায়কের গানক্রিয়া যে-হিসাবে মা-সরস্বতীর অনুপ্রাণনা, সেই হিসাবে তাহা প্রাণ-ক্রিয়া ; যে-হিসাবে তাহা

একটি অপরিচিত গ্রামে বাস করিতেছি। প্রত্যহ প্রাতঃকালে আমি এক-বার করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করি। পথিমধ্যে আমি প্রত্যহ আম, জাম, বেল, কাঁঠাল, এই চারি ফলের চারিটা গাছ পরে পরে অবলোকন করি। প্রতি-দিনের এই ভূয়োদর্শনের মধ্য-গত ভেদাভেদ সম্বন্ধ আমার প্রাণে গাঁথা পড়িয়া গেল, কেহ বলিতে পারেন যে, "প্রাণে গাঁথা পড়িয়া গেল", এটা কেবল একটা কথার কথা; "মনে গাঁথা পড়িয়া গেল" বলিতে দোষ কি? ইহার উত্তর এই যে, সত্যসত্যই আমাতে যাহা ঘটিল, তাহাই আমি বলি-লাম। তাহা এই যে, পথিমধ্যে প্রত্যহ ঐ চারিটি বৃক্ষের ভূয়োদর্শনের দ্বার দিয়া উহাদের মধ্য গত ভেদাভেদ সম্বন্ধ আমার অন্তঃকরণের অব্যক্ত মহলে চুপিচুপি প্রবেশ করিল—কখন্ যে প্রবেশ করিল, তাহা আমি জানিতেও পারিলাম না। অন্তকরণের সেই যে অব্যক্ত মহল, তাহার নাম প্রাণ; বই, তাহার নাম মনও নহে, বুদ্ধিও নহে। মন সচেতন অন্তঃকরণ-বৃত্তি; যাহা মনে বাস করে, তাহা মনে প্রকাশ পায়। "মনে বাস করিতেছে, অথচ মনে প্রকাশ পাইতেছে না", একথা বলাও যা, আর "এক ব্যক্তি কথা কহিতেছে, অথচ তাহার মুখ দিয়া শব্দ বাহির হইতেছে না", এ কথা বলাও তা—দুই-ই অর্থহীন জল্পনা। অতএব এই কথাই ঠিক্ যে, ঐ চারিটি বৃক্ষের ভেদাভেদ-সম্বন্ধ আমার প্রাণে গাঁথা পড়িয়া গেল। তাহার পরে দেখি যে, প্রতিদিনই সেই স্থানের সেই আম-গাছটি দেখিবামাত্র আমার মনে জামগাছটির দর্শন-কাঙ্ক্ষা জাগিয়া ওঠে; তেমনি, জাম-গাছটি দেখিবামাত্র বেল গাছটির দর্শনাকাঙ্ক্ষা, বেল-গাছটি দেখিবামাত্র কাঁঠাল-গাছটির দর্শনাকাঙ্ক্ষা মনোমধ্যে ক্রমান্বয়ে জাগিয়া ওঠে। হয় আর কিছু না—প্রাণে যাহা অব্যক্তভাবে গাঁথা রহিয়াছে, মনে তাহার এক এক অংশ চাক্ষুষ দৃষ্টি যোগে ব্যক্ত হয় এবং সেই সঙ্গে পরপরবর্ত্তী অংশের দর্শনাকাঙ্ক্ষা ভাবের অনুবন্ধিতা-সূত্রে ব্যক্ত হয়। ব্যক্ত হইবারই কথা;

কেন না, কোনো অভ্যস্ত সংস্কার যখন অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হয়, তখন তাহা প্রাণের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া লুকাইয়া অবস্থিতি করে; আবার, সেই সংস্কার যখন কোনোপ্রকার স্মারকের উত্তেজনায় নাড়াচাড়া পাইয়া প্রকট-বাসনা-রূপে অভিব্যক্ত হয়, তখন কাজেই তাহা মনে ভাসিয়া ওঠে।

একদিন আমি কাঁঠাল-গাছটার অব্যবহিত-পরবর্ত্তী মাঠের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে মাঠ পার হইয়া ধান্য-ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িলাম। এতক্ষণ ধরিয়া, আম হইতে জাম ভিন্ন, জাম হইতে কাঁঠাল ভিন্ন, কাঁঠাল হইতে তৃণ ভিন্ন, এইরূপ একটা ভিন্নতার ব্যাপার—দৃষ্টপূর্ব্ব বিষয়-সজ্জের এক এক অংশের দর্শন এবং পরপরবর্ত্তী অংশের দর্শনাকাঙ্ক্ষা, এই দুই পক্ষে ভর করিয়া মনের আকাশে উড়িয়া চলিতেছিল। ধান্য-ক্ষেত্র হইতে প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইবামাত্র মন থম্‌কিয়া দাঁড়াইল; বুদ্ধির পালা আরম্ভ হইল; ভাবের অনুবন্ধিতা (association of ideas) আড়ালে সরিয়া দাঁড়াইল; অগ্রপশ্চাৎ-বিবেচনা প্রকাশ্যে আবির্ভূত হইল। দৃষ্টপূর্ব্ব বিষয় সকলের ভিন্নতার মধ্য হইতে অভিন্নতা ক্রমে ক্রমে মস্তক উত্তোলন করিতে আরম্ভ করিল। অগ্রপশ্চাৎ-বিবেচনাই বা কিরূপ এবং ভিন্নতার মধ্য হইতে অভিন্নতার বিনির্গমনই বা কিরূপ—তাহা দেখা যা'ক্।

আম-জাম-বেল-কাঁঠাল-গাছ হইতে ধান্য বৃক্ষ কেবল যে ভিন্ন, তাহা নহে, পরন্তু জাত্যংশে ভিন্ন। তাহা যদি হইল—আম্রাদি বৃক্ষ যদি ধান্য-বৃক্ষ হইতে জাত্যংশে ভিন্ন হইল, তবে আম্রাদি বৃক্ষগুলা আপনাদের মধ্যে অবশ্যই জাত্যংশে অভিন্ন। ফলেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা সকলেই একই শ্রেণীর তরু—সকলেই উদ্যান তরু।

এই প্রকার বিবেচনার অভ্যুদয়ে আমার বুদ্ধিতে এইরূপ একটি আনুমানিক সিদ্ধান্ত (Hypothesis) উপস্থিত হইল যে, ঐ চারিটি ফল-বৃক্ষের প্রতিষ্ঠাভূমি যাহা আমি পশ্চাতে ছাড়িয়া আসিয়াছি, তাহা বোধ করি কোনো

একটি উদ্যান-ভূমির অন্তঃপাতী। তাহার পরে, সেই আনুমানিক সিদ্ধান্ত-টির যাথার্থ্য পরীক্ষা করিবার জন্য আম জাম-কাঁঠালের সঙ্গম-স্থানটিতে পুন-রাগমন করিয়া আশপাশের সমস্ত প্রদেশ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম যে, সেখানকার যতগুলা গাছ, সবগুলাই উদ্যান-তরু—কেবলি ফুলগাছ এবং ফলগাছ; তা ছাড়া—অপর কোনোপ্রকার বৃক্ষ দেখিলাম না। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, আম হইতে জাম ভিন্ন, জাম হইতে কাঁঠাল ভিন্ন, এইরূপ ধাঁচার প্রভেদকে বলা যায় ব্যক্তিগত প্রভেদ। নিছক ব্যক্তিগত প্রভেদ যাহা মনে প্রতিভাসিক হইয়াই ক্ষান্ত থাকে, তাহার সহিত অভেদের বড় একটা দেখা-সাক্ষাৎ নাই। পক্ষান্তরে ওষধি এবং বনস্পতির মধ্যগত প্রভেদ যাহা বুদ্ধিতে প্রকাশ পায়, তাহা জাতিগত প্রভেদ। তাহা একপ্রকার ভেদাভেদ, কিনা অভেদাত্মক প্রভেদ। তৃণ এবং পর্ব্বতের মধ্যে যতই প্রভেদ থাকুক্ না কেন—তথাপি দুয়ের মধ্যে অভেদ এই যে, দুই-ই পার্থিব বস্তু; ইহারই নাম অভেদাত্মক প্রভেদ।

উপরে যতগুলি দৃষ্টান্ত সবিস্তরে প্রদর্শিত হইল, তাহার মধ্য হইতে সার সংগ্রহ করিয়া মোট কথাটি যাহা পাওয়া যাইতেছে, তাহা সংক্ষেপে এই:—

(১) প্রথমে ভূয়োদর্শন-জনিত ভেদাভেদের সংস্কার বুকের ধুক্‌ধুকুনির ন্যায় প্রাণের মধ্যে অব্যক্তভাবে স্পন্দিত হইতে থাকে।

(২) তাহার পরে সেই প্রাণে গাঁথা অব্যক্ত ভেদাভেদের ভেদাংশটি ভাবের অনুবন্ধিতা-সূত্রে মনের বাসনা-ক্ষেত্রে ভাসিয়া ভাসিয়া উঠিতে থাকে।

(৩) তাহার পরে প্রাণে-গাঁথা ভেদাভেদের অভেদাংশটি মনঃসমুত্থিত ভেদাংশটির সহিত একতানে মিলিয়া গিয়া, ভেদাভেদের উভয়াংশ, বুদ্ধির আলোকে বিনিস্ক্রান্ত হয়। তাহা যখন হয়, তখন যেমন—

পয়সা কমলং কমলেন পয়ঃ
পয়সা কমলেন বিভাতি সরঃ।
মণিনা বলয়ং বলয়েন মণি-
র্মণিনা বলয়েন বিভাতি করঃ॥
শশিনা চ নিশা নিশয়া চ শশী
নিশয়া শশিনা চ বিভাতি নভঃ।
কবিনা চ বিভুর্বিভুনা চ কবিঃ
কবিনা বিভুনা চ বিভাতি সভা॥

কমলে সলিল শোভে সলিলে কমল।
কমলে সলিলে শোভে সর নিরমল॥
বলয়ে জ্বলয়ে মণি মণিতে বলয়।
বলয়ে মণিতে শোভে কর-কিসলয়॥
নিশীথে শোভয়ে শশী শশীতে নিশীথ।
নিশিতে শশিতে নভ তারকা- ভূষিত॥
নৃপ পাশে কবি শোভে কবি পাশে ভূপ।
কবিতে বিভুতে সভা শোভে অপরূপ॥

তেমনি প্রভেদের আলোকে অভেদ ব্যক্ত হয়, অভেদের আলোকে প্রভেদ ব্যক্ত হয়, এবং উভয়গ্রাহী বুদ্ধির আলোকে ভেদাভেদ ব্যক্ত হয়। নূতন কিছুই ব্যক্ত হয় না ;—যে ভেদাভেদের শিক্ষিত বা অশিক্ষিত সংস্কার পূর্ব্ব হইতেই প্রাণের অভ্যন্তরে অব্যক্তভাবে লুকাইয়া অবস্থিতি করে, এবং মনের বাসনা ক্ষেত্রে যাহার অর্দ্ধাংশ (ভেদাংশ) ভাবের অনুবন্ধিতা-সূত্রে ভাসিয়া ভাসিয়া উঠিতে থাকে বুদ্ধিতে তাহারই সর্ব্বাংশ (ভেদাভেদ উভয়াংশ) অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার আলোকে সুব্যক্ত হইয়া উঠে। কাজেই বলিতে হয় যে, প্রাণ, মন এবং বুদ্ধি, পরস্পরের সহিত এক-সূত্রে গাঁথা রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে অতীব একটি গুরুতর বিষয় বিবেচ্য ; তাহা এই যে, বুদ্ধির উচ্চ-ভূমিতে ব্যক্তের আলোকে অব্যক্ত আলোকিত হয় ; অব্যক্তের

সংস্পর্শে ব্যক্ত প্রতিষ্ঠা-লাভ করে, এই উভয়ের সন্ধিস্থলে বাস্তবিক সত্তা অব্যক্তের আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত এবং ব্যক্তের আলোকে আলোকিত হয়।

প্রয়াণের উদ্যোগ।

ইতিপূর্ব্বে দেখা হইয়াছে যে, প্রাণ—অব্যক্ত চেতন; মন—অর্দ্ধব্যক্ত-চেতন, বুদ্ধি—সুব্যক্ত-চেতন। এটাও দেখা হইয়াছে যে, ও তিন বৃত্তি একই অভিন্ন জীবাত্মার তিন বিভিন্ন অন্তঃকরণবৃত্তি বা অন্তরিন্দ্রিয় —কাজেই তিনের মধ্যে একাত্মভাব অবশ্যম্ভাবী।

পাঠকের মনে সহসা এইরূপ একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, "বাহির হইয়াছ সার সত্যের অন্বেষণে—তাহার ত কোনো উদ্যোগই দেখিতেছি না; কেবল প্রাণ-মন-বুদ্ধি লইয়াই বিব্রত! ইহার কারণ কি?" কারণ যে কি, তাহা বলিতেছি—প্রণিধান করা হো'ক্।

তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়াছি। সঙ্গে লোকজন নাই। বেলা দ্বিপ্রহর। চারিদিকে মাঠ ধুধু করিতেছে। সম্মুখে বৃক্ষচ্ছায়ায় পরিবেষ্টিত একটা কূপ রহিয়াছে। তরুচ্ছায়ায় পোঁট্‌লাপুঁট্‌লি খুলিয়া যৎকিঞ্চিৎ পাথেয়-সামগ্রী, যাহা তাহার মধ্যে পত্রাবগুণ্ঠিত ছিল. তাহাতেই ভোজন-ক্রিয়া সমাপন করিলাম। তাহার পরে বোচ্‌কাবুচ্‌কি হাতড়াইয়া ঘটি বাহির করিতে গিয়া দেখি যে, ঘটি নাই; যাত্রাকালে পাথেয়-দ্রব্যাদি গুছাইবার সময় ঐটি কেবল সঙ্গে লইতে ভুলিয়াছি। কূপের গহ্বর-দ্বারে মুখ বাড়াইয়া তাহার চারি-হাত নীচে দিব্য পরিস্কার জল দেখিতে পাইতেছি—অথচ তৃষ্ণা-নিবারণের কোনো উপায় দেখিতেছি না। পথের মাঝখানে একি বিপত্তি! ঘটির জন্য পুনরায় আমাকে বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। গম্যস্থান হ'চ্চে সার সত্য—বাসস্থান হ'চ্চে জীবাত্মা। জীবাত্মা-কুটুরীর

তিনটি থাকে তিনটি প্রয়োজনীয় উপকরণ উপর্য্যুপরি সাজানো রহিয়াছে ; —নীচের থাকে রহিয়াছে প্রাণ—মাঝের থাকে মন—উপরের থাকে বুদ্ধি। বিনয়ের অনুরোধে লাঘব স্বীকার করিয়া বলিলাম উপকরণ ; কিন্তু সত্য যদি বলিতে হয়, তবে সে তিনটির কোনোটিই সামান্য উপকরণ নহে ; তিনটিই সাক্ষাৎ করণ—অন্তঃকরণ বা অন্তরিন্দ্রিয়। "উপ" মিছে একটা উপসর্গ, তাহাকে সরাইয়া দেওয়া হইল। জল সংগ্রহ করিবার জন্য যেমন ঘটির প্রয়োজন, সত্যের প্রসাদবারি সংগ্রহ করিবার জন্য তেমনি অন্তঃকরণের প্রয়োজন। যাত্রাকালে ঐ তিনটি প্রয়োজনীয় সামগ্রীর পোঁটলাপুঁটলি বাঁধা নিতান্তই আবশ্যক। এতক্ষণ ধরিয়া তাই প্রাণ-মন-বুদ্ধিকে অন্নের মধ্যে বাগাইয়া গোছগাছ করিয়া বাঁধিয়া লওয়া হইল।

বলিলাম "জীবাত্মা বাসস্থান"। কথাটা হইল কেমন—না যেমন "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" গঙ্গাতে ঘোষপল্লী। অর্থাৎ-কিনা গঙ্গার উপকূলে ঘোষ-পল্লী। গঙ্গার দুই দিকের দুই উপকূল এবং মধ্যখানে প্রবাহ, সর্ব্বশুদ্ধ ধরিয়া বলা হইল গঙ্গা। তেমনি আত্মার দুই দিকের দুই উপকূল এবং মাঝখানের প্রবাহ, সর্ব্বশুদ্ধ ধরিয়া বলা হইতেছে আত্মা। এখন আত্মার দুই দিকের দুই উপকূলই বা কাহার নাম—মাঝখানের প্রবাহই বা কাহার নাম—সেইটিই হ'চ্চে জিজ্ঞাস্য। আত্মার মধ্যে যাহা শক্ত ডাঙা ভূমি, তাহাই উপকূল ; যাহা তরল-পদার্থ, তাহাই জল-প্রবাহ। এ দিকে বুদ্ধি বাস্তবিক সত্যে ঠেকিয়াছে, ও দিকে প্রাণ ভৌতিক পদার্থে ঠেকিয়াছে—দুইই শক্ত ডাঙা-ভূমি। দুয়ের মাঝখানে মন প্রাতিভাসিক সত্তার হিল্লোলে হিল্লোলে তরঙ্গিত হইয়া চলে—মন জল-প্রবাহ। এ যাহা বলিলাম, ইহার ভিতরের রহস্যটি পূর্ব্বে অনেকবার ইঙ্গিত করিয়াছি—এখানে তাহা আরেকবার ইঙ্গিত করা শ্রেয় বিবেচনা করি ; কথাটি এই :—

(১) সুষুপ্তি-কালের বস্তু গুণ-ছাড়া বস্তু ; (২) স্বপ্নের প্রতিভাস বস্তু-ছাড়া গুণ ; (৩) জাগ্রৎকালের বস্তু বস্তু-গুণে মাখামাখি।

ইহার প্রমাণ।

সুষুপ্তি-কালে তুমি আছ, কিন্তু তোমার কোনো গুণই প্রকাশ পাইতেছে না। তোমার বিছানা আছে, খাট আছে, শয়নাগার আছে; কিন্তু কাহারো কোনো গুণই প্রকাশ পাইতেছে না। ইহার নাম গুণ-ছাড়া বস্তু। স্বপ্নকালে তুমি যখন হাতী দেখিতেছ—ঘোড়া দেখিতেছ; তখন হাতীও নাই, ঘোড়াও নাই—কেবল দুয়ের দুইপ্রকার গুন তোমার মনে জাগ্রত হইয়া উঠিয়া হাতি-ঘোড়ার বেশে ইতস্তত বিচরণ করিতেছে ; ইহারই নাম বস্তু-ছাড়া গুণ। জাগ্রৎকালে যখন তোমার চক্ষের সম্মুখে একটা উদ্যান বিরাজ করিতেছে, তখন তরু-লতা-পত্র-পুষ্প প্রভৃতি যে-সকল বস্তু বাস্তবিকই তোমার সম্মুখে রহিয়াছে, তাহারই গুণ তোমার চক্ষে প্রকাশ পাইতেছে ;—ইহারই নাম বস্তু-গুণে মাখামাখি। সুষুপ্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে? না প্রাণ। স্বপ্নের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে? না মন। প্রবোধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে? না বুদ্ধি। সুষুপ্তি-কালে প্রাণ শরীরের বাস্তবিক সত্তাতে ঠেস্ দিয়া থাকে—জাগ্রতকালে বুদ্ধি রূপরসাদির বাস্তবিক সত্তাতে অবগাহন করে। বুদ্ধি এবং প্রাণ দুই-ই বস্তু-নিষ্ঠ; প্রভেদ কেবল এই যে, বুদ্ধির বস্তু গুণালোকে আলোকিত ; প্রাণের বস্তু নির্গুণ এবং অব্যক্ত। বুদ্ধি এবং প্রাণ দুই-ই বস্তু-নিষ্ঠ—তাই দুই-ই-ডাঙা-ভূমির সহিত উপমেয়। পক্ষান্তরে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্বপ্নকালে যেমন বস্তুকে ছাড়িয়া বস্তুর ভাণ সদ্য-পলায়িত পক্ষীর ন্যায় খাঁচারই আশে পাশে উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়, মনের কল্পনাও সেইরূপ একপ্রকার উড়া-সামগ্রী। মন এইরূপ বস্তু-ছাড়া গুণের উপরে ভর করে বলিয়া তাহা

জল-প্রবাহের সহিত উপমেয়। ইতিপূর্ব্বে যে কথা বলিয়াছি, তাহার মর্ম্ম-গত ভাবটি এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে; সে কথা এই যে, যখন বলা হয় "গঙ্গায়াং ঘোষঃ", তখন গঙ্গার দুই দিকের দুই উপকূল এবং মাঝখানের প্রবাহ, সর্ব্বশুদ্ধ ধরিয়া বলা হয় গঙ্গা; তেমনি যখন বলা হইতেছে জীবাত্মা সত্যধাম-যাত্রীর বাসস্থান, তখন জীবাত্মার দুই দিকের দুই উপকূল (কিনা বুদ্ধি এবং প্রাণ), এবং মাঝের প্রবাহ (কিনা মন), সর্ব্বশুদ্ধ ধরিয়া বলা হইতেছে আত্মা। ফলেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যে, আমি যখন আমাকে বলি আমি তোমাকে বলি তুমি, তখন (১) প্রাণভৃৎ শরীর, (২) মন, এবং (৩) বুদ্ধি তিনকে একসঙ্গে পুঁটলি বাঁধিয়া তাহাতে আমিত্ব বা তুমিত্ব আরোপ করি। তাহার মধ্যে দেখিতে হইবে এই যে, প্রাণ-ভৃৎ শরীর এ-পার; সত্যাবগাহী বুদ্ধি ও-পার; কাজেই যাত্রারম্ভে শরীর সর্ব্বপ্রথমে বিবেচ্য। মহাকবি কালিদাস তাই বলিয়াছেন—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্"—শরীরই প্রথম উপক্রমের সাধন-ক্ষেত্র।

ভগীরথ যখন ভাগীরথকে স্বস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া গেলেন, তখন ভাগীরথীর পুরাতন উপকূল পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, নূতন উপকূল দুইধারে প্রতিষ্ঠিত হইল। গঙ্গা যেখান হইতে যেখানেই গমন করুন না কেন—দুই উপকূল পার্শ্বরক্ষকের ন্যায় তাঁহার সঙ্গে লাগিয়া থাকা চাই। কিন্তু তা বলিয়া এমন কোনো লেখাপড়া নাই যে, পুরাতন আমলের পেন্সন্‌ভোগী পার্শ্বরক্ষক নূতন আমলে ফিরেফির্ত্তি স্বকার্য্যে নিযুক্ত হইবে। উপকূল অপরিহার্য্য, এ কথা সত্য—কিন্তু কি হিসাবে অপরিহার্য্য? একটা-না-একটা উপকূল চাই-ই চাই—এই হিসাবে অপরিহার্য্য; তা বই, এ যদি চাও যে, ভাগীরথীর ইতস্তত গমনাগমন-কালে একই পুরাতন উপকূল ক্রমাগতই তাঁহার পার্শ্বে জোঁকের ন্যায় লাগিয়া থাকিবে, তবে সে-রকমের অপরিহার্য্য উপকূল আকাশকুসুমেরই সহোদর। উপকূল অপরিহার্য্যও

বটে, পরিবর্ত্তনশীলও বটে। জীবাত্মার শরীরও সেইরূপ,—তাহা অপরিহার্য্যও বটে, পরিবর্ত্তনশীলও বটে। জন্মান্তরের তো কথাই নাই—ইহজন্মেই মনুষ্যের শরীর তিন-চারি-বার পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। বলিলাম "জন্মান্তর", কিন্তু কি অর্থে বলিলাম, সেটাও বিবেচ্য। আমাদের দেশের আবাল বৃদ্ধবনিতা পৃথিবীতে পুনরাগমন করাকেই জন্মান্তর-গ্রহণ বলিয়া স্থিরস্থার করিয়া বসিয়া আছেন; আমার মন কিন্তু তাহাতে সন্তোষ মানে না। জন্ম-শব্দের অর্থের দৌড় যে অনেকদূর যায়—অনেকে তাহা বোঝেন না। শরীর-পরিগ্রহ করিয়া বাহির হইবার নামই জন্ম; তা বই, তুমি এ কথা বলিতে পার না যে, মাতৃগর্ত্ত হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার নামই জন্ম। পদ্ম যখন পঙ্কের বিছানা হইতে আলোকে গাত্রোত্থান করে—তাহা কি জন্ম নহে? পদ্ম কি পঙ্কজ নহে? পদ্ম যখন শরীর-পরিগ্রহ করিয়া বাহির হয়—তখন সে ভূমিষ্ঠ হয় না—জ্যোতিষ্ঠ হয়;—তাহা যখন হয়, তখন তাহারই নাম পদ্মের জন্ম গ্রহণ। আমি তাই বলি যে, মনুষ্যের জন্ম দুই-প্রকার—ঐহিক জন্ম এবং পারত্রিক জন্ম। মনুষ্য যখন ভৌতিক শরীর পরিগ্রহ করিয়া মাতৃগর্ত্ত হইতে পৃথিবীতে বাহির হয়, তাহার নাম ঐহিক জন্ম; আবার যখন তৈজস শরীর পরিগ্রহ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রের মধ্য দিয়া লোকান্তরে বাহির হয়, তাহার নাম পারত্রিক জন্ম। ঐহিক জন্মের প্রাক্‌কালে যেমন গর্ত্ত-বাসের অন্ধকার—জাগরণের প্রাক্‌কালে যেমন সুপ্তির অন্ধকার—পারত্রিক জন্মের প্রাক্‌কালে তেমনি জরা-মৃত্যুর অন্ধকার। অন্ধকারে অন্ধকারে এ যেমন কোলাকুলি, আলোকে আলোকেও তদ্‌বৎ। ঐহিক-জন্মকালে জীবাত্মা মাতৃগর্ত্তের মধ্য দিয়া পার্থিব আলোকে বাহির হয়, পারত্রিক-জন্মকালে জীবাত্মা ব্রহ্মরন্ধ্রের মধ্য দিয়া অপার্থিব আলোকে বাহির হয়। ঐহিক জন্মে জীবাত্মা ভৌতিক শরীর পরিগ্রহ করে, পারত্রিক জন্মে জীবাত্মা তৈজস শরীর পরিগ্রহ করে। ঐহিক জন্মও জন্ম—

পারত্রিক জন্মও জন্ম ; ভৌতিক শরীরও শরীর, তৈজস শরীরও শরীর।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় স্পষ্টই লেখা আছে যে,—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"

মনুষ্য যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, তেমনি পুরাতন শরীর পরিত্যাগ করিয়া নূতন শরীর পরিগ্রহ করে।

এখানে কেবল নূতন-শরীর পরিগ্রহের কথাই বলা হইতেছে ; পৃথিবীতে পুনরাগমনের কথা বলা হইতেছে না। টীকাকার কিংবা ভাষ্যকার কথার ভেল্কি বাজি দ্বারা উহার মধ্য হইতে পুনরাগমনের বৃত্তান্তটি নানাপ্রকার ডাল-পালায় সাজাইয়া চকিতের মধ্যে বাহির করিয়া তুলিতে পারেন কিন্তু যতই যাহা করুন্ না কেন, সমস্তই 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া'—মূলের সহিত কিছুতেই তাহা থাপ্ খাইতে পারে না। কেন যে থাপ্ খাইতে পারে না, তাহা বলিতেছি—প্রণিধান করা হো'ক্।

শরীরই যে কেবল একাকী জীবাত্মার পরিধান বস্ত্র, তাহা নহে ; পৃথিবীও জীবাত্মার পরিধান-বস্ত্র ;—প্রভেদ কেবল এই যে, শরীর অন্তর্ব্বাস—পৃথিবী বহির্ব্বাস। মাটির শরীর মাটির সহিত এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জড়িত যে, তাহাকে পৃথিবী হইতে ছাড়ানো অসম্ভব। বায়ুর সহিত নিশ্বাস প্রশ্বাস, জলের সহিত রসরক্ত, মৃত্তিকার সহিত অস্থিমাংস কঠিন আকর্ষণ-সূত্রে সেলাই করা রহিয়াছে। পৃথিবীর সহিত শরীর—বহির্ব্বাসের সহিত অন্তর্ব্বাস—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সেলাই করা রহিয়াছে ; একটিকে টানিলেই আরেকটিতে টান পড়ে ; একটিকে ছাড়িলেই আর একটি

ছাড়িয়া যায়। মনুষ্য যখন পার্থিব শরীর ছাড়িয়া পলায়, তখন সেই সঙ্গে পৃথিবীও তাহার চতুষ্পার্শ্ব হইতে ছাড়িয়া যায়; তবেই হইতেছে যে, পার্থিব শরীর পরিত্যাগ করিয়া নূতন শরীর গ্রহণ করিতে হইলে অপার্থিব শরীর গ্রহণ করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। কাজেই "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোহপরাণি" ইহার যদি কোন যুক্তিসঙ্গত অর্থ থাকে তবে তাহা এই যে, ঐহিক জন্মকালে জীবাত্মা যেমন ভৌতিক শরীর পরিগ্রহ করিয়া মাতৃগর্ব্ভের মধ্য দিয়া পৃথিবীতে অবতরণ করে, পারত্রিক-জন্মকালে তেমনি তৈজস শরীর পরিগ্রহ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রের মধ্য দিয়া অপার্থিব লোকে সমুত্থান করে।

জীবাত্মার অবশ্য কর্ম্মজনিত গতি স্বীকর্ত্তব্য। কর্ম্মজনিত প্রাণের সংস্কার, মনের বাসনা এবং জ্ঞানের ঔজ্জ্বল্য নানা লোকের নানাপ্রকার; তদনুসারে নানা লোকের গতিও নানাপ্রকার হইবারই কথা। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র মিত্র প্রেসিডেন্সি কালেজে আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন। বিদ্যালয়ে যেমন তিনি প্রকৃষ্ট মেধা বুদ্ধি যত্ন এবং অধ্যবসায়ের গুণে উচ্চস্থান অধিকার করিতেন, কর্ম্মালয়েও তেমনি তিনি উচ্চ আদালতের ধর্ম্মাসনে অধিকার প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগের জন্য তাঁহাকে বিদ্যালয়ে ফিরিয়া যাইতে হইল না। অতএব যাঁহারা পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া যান, তাঁহাদিগকে ফলভোগের অনুরোধে আবার যে এই পৃথিবী-তেই আসিতে হইবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। পর্থিব রাজ্যে যেমন মনুষ্যের কর্ম্মানুযায়ী নানাপ্রকার গতিবৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়, অপার্থিব রাজ্যে ও সেইরূপ নানাপ্রকার গতিবৈচিত্র্য থাকিবারই কথা। তবে দুয়ের মধ্যে স্থূল সূক্ষ্মের প্রভেদ অবশ্যই স্বীকার্য্য। ভৌতিক রাজ্য অপেক্ষা তৈজস রাজ্য যে পরিমাণে সূক্ষ্ম, তৈজস রাজ্যের বিচারও সেই পরিমাণে সূক্ষ্ম হইবারই কথা। পৃথিবীতে মনুষ্যের আন্তরিক গুণাগুণ স্থূল শরীরের আবরণে

ঢাকা থাকে, এইজন্য কোন্ ব্যক্তি কোন্ স্থানের উপযুক্ত তাহা ঠিক্ঠাক্ বলিতে পারা সুকঠিন ; পরলোকে সূক্ষ্ম শরীরের আবরণের মধ্য দিয়া অন্তরের গুণাগুণ অপেক্ষাকৃত সহজে ফুটিয়া বাহির হয়, এইজন্য যে ব্যক্তি যে স্থানের উপযুক্ত, তাহাকে সেই স্থানে সংক্রামণ করিবার জন্য সহজেই একটা ব্যবস্থা হইতে পারে ; কাজেই পারলৌকিক অপার্থিব রাজ্যে কর্ম্মের অনুযায়ী—অথবা যাহা একই কথা—কর্ম্ম-জনিত উচ্চ-নীচ বাসনা-সংস্কার এবং বুদ্ধির অনুযায়ী উচ্চ-নীচ গতি অপক্ষপাতী ঐশ্বরিক নিয়মে নিষ্পাদিত হইতে পারিবার সম্ভবনা সহজেই লোকের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। জীবাত্মার পারলৌকিক গতি সম্বন্ধে আমার বুদ্ধিতে যাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়, তাহাই আমি বলিলাম ;—কথা উঠিল বলিয়া বলিলাম ; পরন্তু তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রকৃত আলোচ্য বিষয় কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে ;—আমার মনে হয়, কতকটা-যেন তাহা অপ্রাসঙ্গিক। এখানে যে কয়েকটি বিষয় আমার প্রধান বক্তব্য, তাহা এই :—

প্রথমত ভৌতিক শরীরেই হউক্, আর তৈজস শরীরেই হউক্ ; স্থূল শরীরেই হউক্, আর সূক্ষ্ম শরীরেই হউক্ ;—সকল-তরো শরীরেই প্রাণ থাকা চাই ;—এই গেল প্রাণ।

দ্বিতীয়ত স্থূলই হউক্, আর সূক্ষ্মই হউক্, কোনো-না-কোনো বিষয়-ক্ষেত্রে মনকে দৌড় দেওয়ানো চাই ;—এই গেল মন।

তৃতীয়ত বুদ্ধি-পরিচালনা করিয়া বাস্তবিক সত্যের অনুসন্ধান এবং অনুশীলন করা চাই ;—এই গেল বুদ্ধি।

তিনই চাই :—তিনের আয়োজন পরিসমাপ্ত হইলে তবেই তিনের মধ্যে জীবাত্মা বিরাজমান হ'ন। ∴ নহিলে রাজ্যহীন রাজা যেমন রাজাই নহে, তেমনি বুদ্ধিহীন, মনোহীন, প্রাণহীন আত্মা আত্মাই নহে। জ্ঞান আত্মার ধী-শক্তির ব্যাপার—, মন কল্পনা-শক্তির ব্যাপার, প্রাণ ভোগ-শক্তির

ব্যাপার; যে আত্মা এই সকল শক্তিতে সম্ভৃত, সেই আত্মাই আত্মা। পক্ষান্তরে কানো কিছুই দেখিতেছি না, শুনিতেছি না, ভাবিতেছি না, বুঝিতেছি না, করিতেছি না, এরূপ শক্তিহীন, জড়বৎ-অথর্ব্ব, অন্ধকারাচ্ছন্ন আত্মাকে আত্মা বলা না বলা সমান। আদর্শ আত্মা কিরূপ? না প্রাণ সরস, মন সতেজ, বুদ্ধি জ্যোতিষ্মতী, এইরূপ রস, তেজ এবং জ্যোতি যে আত্মার নিজস্ব সম্পত্তি, সেই আত্মাই আদর্শস্থানীয়। এখন কথা হ'চ্চে এই যে, বুদ্ধি কোথা হইতে জ্যোতি পাইবে? মন কোথা হইতে তেজ পাইবে? প্রাণ কেথা হইতে রস পাইবে? তা আবার, যেমন তেমন জ্যোতি হইলে চলিবে না—চিরপ্রদীপ্ত স্বয়ংজ্যোতি চাই; যেমন-তেমন তেজ হইলে চলিবে না—অপ্রতিহত ধৈর্য্য-বীর্য্য চাই; যেমন তেমন রস হইলে চলিবে না—চির-উৎসারিত অমৃতের উৎস চাই। ইহারই জন্য সার সত্যের প্রয়োজন—ইহারই জন্য সার সত্যের অন্বেষণ। এতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবাত্মার সম্বন্ধে কগুলি কথা বলিলাম, তাহা শ্রবণে কঠোরশ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিতেরা মুখ ব্যাজার করিতে পারেন; তাঁহারা হয় তো বলিবেন, "আকাশমার্গে উড্ডয়ন ছাড়িয়া দিয়া কঠিন মৃত্তিকায় নাবো—যুক্তি এবং বিচারের পথ অবলম্বন কর—পদে পদে প্রমাণ প্রদর্শন কর—তবেই আমরা তোমার কথায় কর্ণপাত করিব।"

ইঁহাদের মনস্তুষ্টির জন্য আত্মার সম্বন্ধে সার সার গোটাকত দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনায়, এইবারে, প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে। এই কার্য্যটি হইয়া-চুকিলেই পোঁট্‌লাপুঁট্‌লি বাঁধার দায় হইতে নিস্তার পাওয়া যাইবে। তাহার পরেই সম্মুখের পথ সটান প্রসারিত রহিয়াছে—সে পথ প্রকৃতির পথ। সেই বাঁধা রাস্তা অবলম্বন করিয়া যাত্রী সমভিব্যাহারে গম্যস্থানে উপনীত হইবার চেষ্টা দেখা যাইবে।

আত্মজ্ঞান।

এক ব্যক্তিকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"দেবদত্তের সহিত আপনার পরিচয় আছে?" তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন—"দেবদত্ত আমারই নাম।" অর্থাৎ-কিনা দেবদত্তের সহিত তাঁহার খুবই পরিচয় আছে, যেহেতু তিনিই দেবদত্ত এবং দেবদত্তই তিনি। ইহাতে প্রকারান্তরে বলা হইল এই যে, প্রতিজনেরই আত্মা আপনার নিকটে সুপরিচিত; কেন না, চলিত ভাষায় যাহার নাম আপনি, শাস্ত্রীয় ভাষায় তাহারই নাম আত্মা। দুইদিন পরে সেই দেবদত্তের বাটীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখি যে, তিনি চৌকি হেলান দিয়া বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া পুস্তকখানি বন্ধ করিলেন। তাহার পরে পুস্তকখানির নামাক্ষরের প্রতি আমার অনুসন্ধান-দৃষ্টি নিপতিত হইতে দেখিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, "দেখিতেছেন কি—এখানি মহাজ্ঞানী সক্রেটিসের জীবন-কাহিনী। ডেল্‌ফস্-উপদ্বীপের গুহার অভ্যন্তর হইতে তাঁহার প্রতি এইরূপ দৈববাণী হইয়াছিল যে, আপনাকে জানো। এটা কি কম আশ্চর্য্য যে, অনেকে অনেক বিষয় জানে, কিন্তু আপনাকে কেহই জানে না!" কিন্তু দুইদিন পূর্ব্বে ইনি যখন জোরের সহিত বলিয়াছিলেন যে, "দেবদত্ত আমারই নাম", তখন তাহাতে এইরূপ বুঝাইয়াছিল যে, সকলেই আপনার নিকটে আপনি সুপরিচিত। তবেই হইতেছে যে, দেবদত্তের দুইবারের কথা দুইরূপ। তাঁহার প্রথমবারের কথার ভাব এই যে, আত্মা সকলেরই নিকটে সুপরিচিত। তাঁহার দ্বিতীয়বারের কথার ভাব এই যে, আত্মা অনেকেরই নিকটে অপরিচিত। আমার মন বলিতেছে যে, "দুই কথাই সত্য।" কিন্তু মনের সে কথায় বুদ্ধি সায় দিতেছে না। বুদ্ধি বলিতেছে যে, "একটি সত্য হইলে অপরটি অসত্য হইয়া যায়।" আমি

মধ্যস্থ হইয়া দোঁহার বিবাদ মিটাইয়া দিলাম। বামে ফিরিয়া মনকে বলিলাম, "তুমি যে বলিতেছ 'দুই কথাই সত্য', এটা ঠিক্; কিন্তু তোমার কথা আরো ঠিক্ হইত, যদি বলিতে যে, 'দুই হিসাবে দুই কথা সত্য'।" ডাহিনে ফিরিয়া বুদ্ধিকে বলিলাম, "তুমি যে বলিতেছ 'দুই কথাই সত্য হইতে পারে না', এ কথা খুবই সত্য; কিন্তু তোমার কথা আরো সত্য হইত, যদি বলিতে যে, 'একই হিসাবে দুই কথা সত্য হইতে পারে না'। তোমাদের দুই জনের কথার মধ্য হইতে দুই ভাবের দুই সত্য টানিয়া বাহির করিয়া, সেই দুই সত্য জোড়া দিয়া মোট সত্য আমি একটি পাইতেছি এই যে, আত্মা এক হিসাবে সকলেরই নিকটে সুপরিচিত, আর এক হিসাবে অনেকেরই নিকটে অপরিচিত।" মনোবুদ্ধির বিবাদ ভালোয় ভালোয় একপ্রকার মিটিয়া গেল—এখন জিজ্ঞাসা এই যে, কি হিসাবেই বা আত্মা সকলেরই নিকটে সুপরিচিত—কি হিসাবেই বা আত্মা অনেকেরই নিকটে অপরিচিত।

প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, "এটা আমি জানিতেছি যে, আমি আছি, কিন্তু আমি যে কিরূপ, তাহা আমার নিকটে অপ্রকাশ"—এ'র নাম যদি হয় আত্মজ্ঞান, তবে সেরকমের আত্মজ্ঞান সকলেরই আছে।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, "এটা আমি বেশ জানিতেছি যে, আমিই দেখিতেছি, আমিই শুনিতেছি, আমিই ভাবিতেছি", ইত্যাদি। দৃশ্য দেখিবার সময় আমি আপনার নিকটে দ্রষ্টারূপে প্রকাশ পাই—গান শুনিবার সময় আমি আপনার নিকটে শ্রোতারূপে প্রকাশ পাই—মনোমধ্যে কোনো বিষয়ের আলোচনা করিবার সময় আমি আপনার নিকটে মন্তারূপে প্রকাশ পাই—কোনো বিষয়ের সত্যাসত্য অবধারণ করিবার সময় আমি আপনার নিকটে বোদ্ধারূপে প্রকাশ পাই—প্রকাশ পাই এই পর্য্যন্ত; কিন্তু সত্যসত্যই আমি যে কিরূপ—আমার গাত্র হইতে নাট্যশালার সমস্ত সাজগোজ

খুলিয়া ফেলিলে তখন আমি যে কিরূপ, তাহা আমার নিকটে অপ্রকাশ। এই পর্য্যন্তই কেবল আমি বলিতে পারি যে, "আমি এই-এই-সময়ে এই-এই রূপে আপনার নিকটে প্রকাশ পাই;" তা'বই, কোনো সময়েই আমি এরূপ কথা বলিতে পারি না যে, "এখন আমি আপনার নিকটে যেরূপে প্রকাশ পাইতেছি—বাস্তবিকই আমি সেইরূপ ;"—এ'র নাম যদি আত্মজ্ঞান হয়—তবে এ-রকমের আত্মজ্ঞানও অনেকেরই আছে।

তৃতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, কোনো দাণপ্রার্থীর হস্তে একটি স্বর্ণমুদ্রা বিন্যস্ত হইলে সে বস্তুটি যেমন তাহার বুদ্ধিতে (শুধু যে কেবল প্রকাশ পায়, তাহা নহে, পরন্তু) বাস্তবিক-সত্য-রূপে প্রকাশ পায়—আত্মা সকলের বুদ্ধিতে সেই রকম বাস্তবিক-সত্য রূপে—জাজ্বল্যমান ধ্রুব-সত্য-রূপে—প্রকাশ পা'ন কি না, সেইটিই হ'চ্চে জিজ্ঞাস্য।

একটি কথা এই যে, আমি যদি বর্ত্তমান থাকি-ও, তথাপি আপনার নিকটে প্রকাশ না পাইলে আত্মজ্ঞান হয় না ; আর একটি কথা এই যে, আমি যা-তা রূপে আপনার নিকটে প্রকাশ পাইলেও আত্মজ্ঞান হয় না ; তৃতীয় কথা এই যে, আমি বাস্তবিক যাহা এবং আপনার নিকটে প্রকাশ পাইতেছি যেরূপ, এই দুয়ের মধ্যে যদি ব্যবধান বা প্রভেদ না থাকে আমি বাস্তবিক যাহা—সেইরূপেই যদি আমি আপনার নিকটে প্রকাশ পাই—তবেই তাহাকে বলা যাইতে পারে আত্মজ্ঞান। পূর্ব্বোক্ত দুইরূপ আত্মজ্ঞান অনেকেরই আছে—শেষোক্তপ্রকার আত্মজ্ঞানই মনুষ্যমধ্যে সুদুর্লভ।

যিনি বলেন যে, "সুষুপ্তিকালেও 'আমি আছি, কিন্তু প্রকাশ পাইতেছি না' এই ভাবে আপনার নিকটে আপনি প্রকাশ পাই, আর প্রকাশ যখন পাই তখন সেই সুষুপ্তকালের প্রকাশকেই বা আত্মজ্ঞান না বলি কেন," তিনি মুখে তাহা বলেন বটে, কিন্তু মনে মনে বিলক্ষণই জানেন যে, সেরূপে

প্রকাশ পাওয়া প্রকাশ না পাওয়ারই নামান্তর ; এইজন্য তাঁহার সহিত বৃথা তর্কে কালাতিপাত না করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়।

যিনি বলেন যে, "স্বপ্নকালে আমি যখন রাজা হইয়া রাজসিংহাসনে উপবেশন করি, তখন যেমন আমি আপনার নিকটে রাজারূপে প্রকাশ পাই—তেমনি তুমি যাঁহাকে বলিতেছ আত্মজ্ঞানী, তিনি আপনার নিকটে আপনি বাস্তবিক-সত্য-রূপে প্রকাশ পাইতে পারেন—এ কথা আমি অস্বীকার করিতেছি না, কিন্তু তিনি আপনার নিকটে আপনি যেরূপ প্রকাশ পাইতেছেন—সত্যসত্যই যে তিনি সেইরূপ, তাহার প্রমাণ কি ?" তাঁহার প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, স্বপ্নের প্রাতিভাসিক রাজা এবং জাগ্রৎকালের বাস্তবিক রাজা, এ দুয়ের মধ্যে যে, প্রভেদ আছে, ইহা তিনি বিলক্ষণই জানেন, কিন্তু সে প্রভেদ যে কিরূপ প্রভেদ এবং কতটা প্রভেদ, তাহা বোধ করি তিনি ভাল করিয়া প্রণিধান করিয়া দেখেন নাই। এইটি তাঁহার দেখা উচিত যে, আরব্য উপন্যাসের আবু হোসেন্‌কে যখন দশচক্রে ফেলিয়া রাজা বানানো হইয়াছিল, তখন আবু হোসেনের মনোমধ্যে ক্রমাগতই এইরূপ একটা প্রশ্ন আন্দোলিত হইতেছিল যে, „কালিকে'র সেই দীন হীন ক্ষুদ্র আমি হঠাৎ আজিকে প্রত্যূষে উঠিয়াই রাজা হইলাম কিরূপে ? সত্য কি আমি রাজা—না স্বপ্ন দেখিতেছি !" পক্ষান্তরে স্বপ্নের রাজার মনোমধ্যে ভুলক্রমেও একটিবার এরূপ প্রশ্ন উত্থিত হয় না যে—"কাল্ যে চাসা ছিলাম ! আজ রাজা হইলাম কিরূপে ? সত্যই কি আমি রাজা—না স্বপ্ন দেখিতেছি!" ফলে—"বাস্তবিক বা অবাস্তবিক" এ কথাটিই স্বপ্নাবস্থার কথা নহে। জাগরিত অবস্থাতেই আমাদের নিকটে বস্তুসকলের বাস্তবিক সত্তা প্রকাশ পায়, আর, সেই সঙ্গে প্রাতিভাসিক সত্তা যাহা প্রকাশ পায়, তাহা বাস্তবিক সত্তা'র প্রতিযোগেই প্রকাশ পায়। প্রকৃত কথা এই যে, "বাস্তবিক বা অবাস্তবিক" এই যে একটি কথা অভিধানে

আছে—এ কথা জাগরিত অবস্থার খাস্ নিজাধিকারের কথা আর, সেইজন্য, স্বপ্নের অধিকারাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে চাহেও না—প্রবেশ করিতে পারেও না। অতএব প্রকৃত আত্মজ্ঞানী আত্মাকে যে-ভাবের বাস্তবিক-সত্য-রূপে—ধ্রুব সত্য-রূপে—উপলব্ধি করেন, তাহার সহিত স্বপ্নের রাজ্যভোগের উপমা দেওয়া কেবল একটা কথার-কথা বই আর কিছুই নহে।

আত্মজ্ঞানের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার সময়, আত্মজ্ঞানের কাঠিন্য কোন্‌খানটিতে, সেইটি সর্ব্বপ্রথমে বুঝিয়া দেখা আবশ্যক।

জ্ঞানের কার্য্যই হ'চ্চে অব্যক্তকে ব্যক্ত করা। আত্মার ভিতরে কত-প্রকার অব্যক্ত-শক্তি যে অতলস্পর্শ গভীরে নিস্তব্ধভাবে অবস্থান করিতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? সেই অব্যক্ত-শক্তির কতক-কতক অংশ যখন আমাদের ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া, মনঃক্রিয়া, প্রাণ-ক্রিয়া এবং বুদ্ধি-ক্রিয়াতে ব্যক্ত হয়, তখনই সেই সেই ক্রিয়া-দ্বারা বিশেষিত হইয়া আত্মা আপনার নিকটে বিশেষ বিশেষ রূপে প্রকাশ পা'ন—দ্রষ্টারূপে, শ্রোতারূপে, মন্তারূপে, বোদ্ধারূপে প্রকাশ পা'ন। প্রথমত, আত্মার যখন যেশক্তি বর্ত্তমানে স্ফূর্ত্তি পায়, তাহাই তখন সাক্ষাৎসম্বন্ধে অনুভূত হয়। দ্বিতীয়ত, অতীত কালে যে-শক্তি স্বকার্য্য সাধন করিয়া এক্ষণে বিশ্রাম করিতেছে—সে শক্তিরও স্ফূর্ত্তি—স্মরণে জাগ্রত হইয়া অনুভূত শক্তি-স্ফূর্ত্তির সহিত মিলিয়া যায়। উল্কাপিণ্ড আকাশ হইতে দ্রুতবেগে নিপতিত হইবার সময় তাহার নিজের পিণ্ডাকার পরিত্যাগ করিয়া আগ্নেয়রেখাকারে প্রকাশ পায় কেন? তাহার কারণ শুদ্ধকেবল এই যে, "দৃষ্ট" আগ্নেয় পিণ্ডের পশ্চাৎ পশ্চাৎ "স্মৃত" আগ্নেয় পিণ্ড-পরম্পরা সারিবন্দী-ক্রমে আবির্ভূত হইয়া, সমস্ত মিলিয়া, দেখিতে দেখায় ঠিক্ যেন একটা প্রলম্বিত আগ্নেয়রেখা। দর্শন-শক্তির স্ফূর্ত্তি যেমন স্মরণ-শক্তিকে জাগাইয়া তোলে—দর্শন এবং স্মরণ দুয়ের সমবেত স্ফূর্ত্তি তেমনি ধী-শক্তিকে

জাগাইয়া তোলে। আমি যখন সম্মুখে একটা বটবৃক্ষ দেখিতেছি, তখন আমার স্মরণ হইতেছে যে, পূর্ব্বে অনেক স্থানে আমি ঐরূপ বৃক্ষ দেখিয়াছি ; আর, ঐরূপ বৃক্ষ যেখানে যতগুলা চক্ষে দেখিয়াছি, সবগুলাকেই লোকে “বটবৃক্ষ” বলে, তাহাও কর্ণে শুনিয়াছি ; এইরূপে দর্শন-স্ফূর্ত্তি হইতে স্মরণ-স্ফূর্ত্তি উদ্দীপিত হইল ; এবং পরিশেষে উভয়-স্ফূর্ত্তির সমবেত উদ্দীপনায় আমার বুদ্ধি-স্ফূর্ত্তি হইল এইরূপ—যে, দৃশ্যমান বৃক্ষটি বটবৃক্ষ। আমার এইরূপ দর্শন-শক্তি, অনুভব-শক্তি, স্মরণ-শক্তি, এবং ধী-শক্তির বর্ত্তমান স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনার নিকটে দ্রষ্টা, অনুভব-কর্ত্তা, স্মরণ-কর্ত্তা, বোদ্ধারূপে প্রকাশ পাই। “বর্ত্তমান স্ফূর্ত্তি” এখানে বলা হইতেছে কাহাকে—সেটা বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। বর্ত্তমান কালে আমি যে ঐ বিশেষ বটবৃক্ষটি দেখিতেছি—সেই বিশেষ দর্শন ক্রিয়া এবং তাহার সঙ্গে “আমি পূর্ব্বে অমুক অমুক স্থানে ঐরূপ বটবৃক্ষ দেখিয়াছিলাম” এই বিশেষ স্মরণ-ক্রিয়া, এবং “এটা বটবৃক্ষ” এই বিশেষ বুদ্ধি-ক্রিয়া, যাহা বর্ত্তমান কালে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে—সেই সকল বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার স্ফূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়াই এখানে বলা হইতেছে—দর্শনাদি শক্তির বর্ত্তমান স্ফূর্ত্তি। এখন যেন আমার দর্শনাদি শক্তির বর্ত্তমান স্ফূর্ত্তি ঐ বিশেষ বটবৃক্ষটির দর্শনাদি-ক্রিয়াতেই আবদ্ধ ; কিন্তু গতকল্য আমার দর্শনাদি-শক্তির বর্ত্তমান স্ফূর্ত্তি পশ্বাগারের সিংহ দর্শনে ব্যাপৃত ছিল। আজিকের এখনকার এই বর্ত্তমান স্ফূর্ত্তি আজ আমার নিকটে ব্যক্ত হইয়াছে—কাল আমার নিকটে অব্যক্ত ছিল—কালিকের বর্ত্তমান স্ফূর্ত্তি কাল আমার নিকটে ব্যক্ত ছিল, আজ আমার নিকটে অব্যক্ত রহিয়াছে। এইরূপ প্রত্যহ প্রতি-ক্ষণে আত্মার বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া-স্ফূর্ত্তি ব্যক্ত হইতেছে এবং সেই সঙ্গে অপরাপর ক্রিয়া-স্ফূর্ত্তি অব্যক্ত থাকিতেছে। যে-ক্রিয়া যখনই স্ফূর্ত্তিমতী হয়, সেই ক্রিয়া তখনই

ব্যক্ত হয়; আর, যখন ব্যক্ত হয়, তখনই সেই-ক্রিয়া-সমন্বিত-রূপে আপনাকে উপলব্ধি করি। কিন্তু যাহা এখন অব্যক্ত আছে, পূর্ব্বে তাহা এক সময়ে ব্যক্ত হইয়াছিল, অথবা ভবিষ্যতে তাহা ব্যক্ত হইতে পারে। এইরূপ করিয়া ক্রমাগতই মুহুর্ম্মুহু ব্যক্তাব্যক্তের উদয়াস্ত হইতে থাকিলেও ব্যক্তাব্যক্তের মধ্যে বস্তুত কোনো প্রভেদ থাকিতে পারে না; কেন না, যাহা এক কালে ব্যক্ত হইতেছে তাহাই আর-এককালে অব্যক্ত থাকিতেছে; এবং যাহা এককালে অব্যক্ত থাকিতেছে, তাহাই আর এককালে ব্যক্ত হইতেছে। এইজন্য আত্মা যখন ব্যক্ত-ক্রিয়াস্ফূর্ত্তি-সমন্বিত-রূপে বর্ত্তমানে প্রকাশ পা'ন তখন তাহাতেই প্রকারান্তরে দাঁড়ায় যে, আত্মা ব্যক্তাব্যক্ত-উভয়প্রকার-ক্রিয়া-স্ফূর্ত্তি-সমন্বিত—কেন না, ব্যক্ত এবং অব্যক্তের মধ্যে বস্তুত কোনো প্রভেদ নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আত্মা বাস্তবিক যাহা—সেইরূপে প্রকাশ পাওয়ার নামই আত্মজ্ঞান। আত্মা বাস্তবিক যাহা, সেই জায়গাটিতে আত্মা ব্যক্তাব্যক্ত-উভয়প্রকার-স্ফূর্ত্তি-সমন্বিত; আর, আত্মা বিশেষ বিশেষ কালে বিশেষ বিশেষ যে-যে-রূপে আপনার নিকটে প্রকাশ পা'ন—সেই জায়গাটিতে আত্মা ব্যক্তস্ফূর্ত্তি-সমন্বিত-রূপে প্রকাশ পা'ন। যে জায়গাটিতে আত্মা ব্যক্তস্ফূর্ত্তি সমন্বিত, সেই জায়গাটিই আত্মার জ্ঞেয়-স্থান; যে জায়গাটিতে আত্মা অব্যক্ত-শক্তির আশ্রয়-ভূমি, অথবা যাহা একই কথা—যে জায়গাটিতে আত্মা ক্রিয়াস্ফূর্ত্তিসমূহের লয়স্থান বা সমাধিস্থান, সেই জায়গাটিই আত্মার জ্ঞাতৃস্থান; আর, যে জায়গাটি ব্যক্তাব্যক্তের সন্ধিস্থান, অর্থাৎ যে জায়গাটিতে আত্মা ব্যক্তাব্যক্ত-উভয়প্রকার-শক্তিস্ফূর্ত্তি-সমন্বিত-রূপে প্রকাশ পা'ন—সেই জায়গাটিই আত্মার জ্ঞানস্থান—আর সেই জায়গাটিতে আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হয়। আত্মজ্ঞানের কাঠিন্য কোন্‌খানটিতে, তাহা এখন বলিবামাত্রই বুঝিতে পারা যাইবে—যিনি জ্ঞাতা, তিনিই জ্ঞেয়—

যিনি ব্যক্তাব্যক্ত-উভয়প্রকার-শক্তি-সমন্বিত, তিনিই ব্যক্তশক্তি-সমন্বিত—এটা বুঝিলে সহজ, না বুঝিলে কঠিন; এইখানেই আত্মজ্ঞানের কাঠিন্য। পাঠকের প্রতি সবিনয় নিবেদন এই, বুঝিবার এবং বুঝাইবার সুবিধার জন্য—সময় এবং কাগজ বাঁচাইবার জন্য—আমি স্থানে স্থানে রূপকচ্ছলে ভাবপ্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি; ইহা দেখিয়া তিনি যেন এরূপ মনে না করেন যে, তাহা রূপক ছাড়া আর কিছুই নহে। উপরে আমি বলিলাম, "এ জায়গায় আত্মা অমুক—ও জায়গায় আত্মা অমুক" ইত্যাদি। এখানে জায়গা-শব্দের অর্থ যে কি, তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। যদি এরূপ কেহ থাকেন—যিনি উপরি উক্ত স্থলে জায়গা-শব্দে প্রকৃতপক্ষেই জায়গা বা স্থান বুঝিয়া বসিয়া আছেন—তবে তাঁহার প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধের গন্তব্য-পথে আর কিছুদূর অগ্রসর হইলে তাঁহার ভ্রম ঘুচিয়া যাইবে;—আপাতত যাহা তিনি বোঝেন, তাহাই বুঝিয়া সন্তুষ্ট থাকুন।

জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয়।

আত্মজ্ঞানের কাঠিন্য যে কোন্‌খানে, তাহা বিগত প্রবন্ধে ইঙ্গিতে-আভাসে দেখানো হইয়াছে। যাহা দেখানো হইয়াছে, তাহা আরো স্পষ্ট করিয়া দেখানো যাইতে পারে এইরূপে :—

যাহা দৃষ্টিক্ষেত্রে প্রকাশ পায়, তাহারই নাম দৃশ্য; যাহা জ্ঞানে প্রকাশ পায়, তাহারই নাম জ্ঞেয়। যখন আমার সম্মুখবর্ত্তী ঐ শাখা হেলানিয়া তালগাছ'টা আমার দৃষ্টিক্ষেত্রে প্রকাশ পাইতেছে, তখন "আমি ঐ শাখা-হেলানিয়া তালগাছটা দেখিতেছি" এই মোট বৃত্তান্তটি আমার জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছে। এরূপ স্থলে শাখা হেলানিয়া তালগাছটা দৃশ্য, এবং "আমি ঐ তালগাছটা দেখিতেছি" এই মোট বৃত্তান্তটি জ্ঞেয়। ওটাই বা কেন দৃশ্য, আর, এটাই বা কেন জ্ঞেয়? ওটা (তালগাছটা) আমার চক্ষে

প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া দৃশ্য; এটা (অর্থাৎ "আমি ঐ তালগাছটা দেখিতেছি" এই মোট বৃত্তান্তটি) আমার জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া জ্ঞেয়। ওটার ব্যালায় যেমন এরূপ হইতে পারে না যে, তালগাছের বা তাহার কোনো খণ্ডাংশের শুদ্ধকেবল মধ্যপ্রদেশটিই আছে, তা বই তাহার আগা নাই অথবা গোড়া নাই; এটার ব্যালায়'ও তেমনি এরূপ হইতে পারে না যে, শুদ্ধকেবল "দেখিতেছি"-মাত্রটিই আছে, তা বই—যে দেখি-তেছে সে-আমি নাই "তালগাছ" বলিলেই বুঝায় যে, তাহার আগা আছে—গোড়া আছে—মধ্যপ্রদেশ আছে; "দেখিতেছি"—বলিলেই বুঝায় যে, মূলস্থানে আমি আছি—লক্ষ্য-স্থানে দৃশ্য প্রকাশিত আছে—মাঝখানে দর্শন-ক্রিয়া চলিতেছে। মোট দৃশ্যের সঙ্গে একযোগে যেমন তাহার আগা, গোড়া এবং মধ্যপ্রদেশ, তিনিই দৃশ্য; মোট জ্ঞেয়ের সঙ্গে একযোগে তেমনি জ্ঞানের কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া, তিনই জ্ঞেয়। ঐ শাখা-হেলানিয়া তালগাছটার সঙ্গে সঙ্গে উহার শাখাও আমার দৃষ্টিক্ষেত্রে প্রকাশ পাইতেছে; তথৈব, "আমি তালগাছ দেখিতেছি" এই মোট বৃত্তান্তটির সঙ্গে সঙ্গে "আমি"ও আমার জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছি। তবেই হইতেছে যে, শাখা-হেলানিয়া তালগাছটার সঙ্গে সঙ্গে শাখাও দৃশ্য; তথৈব, "আমি তালগাছ দেখিতেছি" এই মোট জ্ঞেয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমি'ও জ্ঞেয়। "আমি তালগাছ দেখিতেছি" এই কথা-টির গোড়াতেই 'আমি' রহিয়াছে;—সেই গোড়া'র কথাটি জ্ঞানে প্রকাশ না পাইলে মোট কথাটা জ্ঞানে প্রকাশ পাইতে পারে না;—"আমি" এই ক্ষুদ্র কথাটি জ্ঞানে প্রকাশ না পাইলে, "আমি তালগাছ দেখিতেছি" এত-গুলা কথা জ্ঞানে প্রকাশ পাইতে পারে না। "আমি" জ্ঞেয় না হইলে "আমি তালগাছ দেখিতেছি" এই মোট বৃত্তান্তটি জ্ঞেয় হইতে পারে না। অতএব "আমি তালগাছ দেখিতেছি" এই মোট বৃত্তান্তটি যখন আমার

জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছে, তখন কাজেই সেই সঙ্গে "আমি"ও আমার জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছি—সুতরাং "আমি"ও জ্ঞেয়। তবেই হইতেছে যে, মোট জ্ঞেয় বৃত্তান্তটির সহিত জড়িতরূপে—দৃশ্যমান বৃক্ষের দ্রষ্টারূপে —যে-আমি আপনার নিকটে প্রকাশ পাইতেছি, সে-আমি জ্ঞেয়-আমি। পক্ষান্তরে, ঐ জ্ঞেয় আমির পশ্চাতে যে-আমি সাক্ষিরূপে (নিছক সাক্ষিরূপে) দণ্ডায়মান আছি, সেই-আমিই জ্ঞাতা আমি। আমার মন বলিতেছে যে, জ্ঞাতা আমি এবং জ্ঞেয়-আমি, এ দুই আমি একই আমি। বুদ্ধি কিন্তু মনের ঐ সোজা কথাটিতে সায় দিতে ইতস্তত করিতেছে। বুদ্ধি ঘাড় নাড়িতেছে আর বলিতেছে—"তাহা হইবে কিরূপে? দুই আমি এক আমি হইব কিরূপে? বিশেষত যখন দুই আমি দুই রকমের;—এক আমি জ্ঞাতা, আর এক আমি জ্ঞেয়। মন এবং বুদ্ধির মধ্যে এই যে, মতের অনৈক্য, ইহাই আত্ম জ্ঞানের পথের কণ্টক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এছার কণ্টকের উন্মোচন হইতে পারে কি উপায়ে, সেইটিই চিন্তার বিষয়।

তবে কি জ্ঞাতা আমি এবং জ্ঞেয়-আমির একত্ব আমার মনে প্রকাশ পাইলেও তাহা—বাস্তবিক সত্য নহে? এইটিই হ'চ্চে জিজ্ঞাস্য। এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে আমাদের জাগ্রত জ্ঞানের সাক্ষাতে কার্য্যত যাহা প্রতিনিয়ত ঘটে, তাহাই সর্ব্বাগ্রে প্রণিধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। অতএব দেখা যা'ক্ ঃ—

নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিবার সময় আমার জ্ঞান যদি ব্যক্ত না হইত, তবে তো কোনো কথাই থাকিত না; তাহা হইলে জ্ঞাতা বা জ্ঞেয় এরূপ একটা কথা আমার মনেও স্থান পাইতে পারিত না—মুখেও বাহির হইতে পারিত না। কিন্তু জ্ঞান একবার ব্যক্ত হউক্ দেখি—সেই দণ্ডে সেই জ্ঞানের জ্ঞাতৃস্থানে জ্ঞাতা আমি সাক্ষিরূপে অধিষ্ঠান করিব এবং তাহার জ্ঞেয়-স্থানে একদিকে যেমন ঘটপটাদি নানা বিষয় একটির পর আর-একটি

যাওয়া-আসা করিতে থাকিবে, আর একদিকে তেমনি সেই সকল জ্ঞেয় বিষয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ জ্ঞেয় আমি ক্রমাগতই ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকিবে। দেখিব তখন যে, জ্ঞেয় আমি'র সম্মুখে যখন যে ভাবের বিষয় আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, তখন তাহার সঙ্গে গোড় দিয়া আপনিও সেই-ভাবের ব্যক্তি হইয়া দাঁড়াইতেছি—এইরূপে ঘড়ি-ঘড়ি বেশ-পরিবর্ত্তন করিতেছি। একই রাজা রাজসভায় দেশের মস্তকস্থানীয় মহা-মহা শূর-বীর এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের মাঝখানে এক মূর্ত্তি ধারণ করেন; আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের সহিত ভোজে বসিয়া তাঁহাদের মাঝখানে দ্বিতীয় আর এক মূর্ত্তি ধারণ করেন; রঙ্গশালায় বয়স্যগণের মাঝখানে তৃতীয় আর-এক মূর্ত্তি ধারণ করেন; অন্তঃপুরে পুত্র-কলত্রাদির মাঝখানে চতুর্থ আর-এক মূর্ত্তি ধারণ করেন। যে-রাজা'র এইরূপ ঘড়ি ঘড়ি মূর্ত্তি-পরিবর্ত্তন হইতেছে, সেই রাজাই রাজার জ্ঞেয় আমি। তদ্ব্যতীত রাজার মধ্যে আর-এক রাজা আছেন—যিনি রাজার জ্ঞাতা-আমি। এ-রাজা (জ্ঞাতা-আমি) দেব-প্রতিমা'র ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া নির্নিমেষ চক্ষে ও-রাজার (জ্ঞেয় আমি'র) বিচিত্র লীলা দর্শন করিতেছেন। জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় আমি-দুটার মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই যে, জ্ঞেয় আমি পরিবর্ত্তনশীল—জ্ঞাতা আমি অপরিবর্ত্তনীয়। এই যে দুই ভাবের দুই আমি—জ্ঞাতা আমি এবং জ্ঞেয় আমি—এ দুই আমি আপামর সাধারণ সকলেরই নিকটে এক আমি বলিয়া প্রকাশ পায়, তাহা জানি; কিন্তু প্রকাশ যে পায়—তাহা কি প্রকাশ পায় মাত্র, না তাহা বাস্তবিক সত্য—সেইটিই হ'চ্চে জিজ্ঞাস্য! তাহা শুদ্ধ-কেবল প্রকাশ-পাইতেছে-মাত্র হইলে তাহাতে আত্মজ্ঞানের পক্ষে বিশেষ কোনো ফল দর্শিতে পারে না। যাহা প্রকাশ পাইতেছে, তাহা বাস্তবিক সত্য-রূপে-ধ্রুব সত্য-রূপে—প্রকাশ পাওয়া চাই, তবেই আত্মজ্ঞানের কাঠিন্যের অনেকটা লাঘব হইতে পারে।

মন তো অষ্টপ্রহরই বলিতেছে যে, "তুই আমি একই আমি—জ্ঞাতা-আমিই জ্ঞেয়-আমি এবং জ্ঞেয়-আমিই জ্ঞাতা-আমি" ; তবে কেন বুদ্ধি তাহাতে সায় দিতে ইতস্তত করিতেছে? অবশ্যই তাহার কোনোনা-কোনো কারণ আছে। সে কারণ এই যে, ব্যাঘ্র যদি মেষরূপে প্রকাশ পায়, তবে সেরূপ প্রকাশ'কে সত্যের প্রকাশ বলা যাইতে পারে না। ব্যাঘ্র যখন ব্যাঘ্ররূপে প্রকাশ পায়, তখন তাহারই নাম সত্যের প্রকাশ। জ্ঞানের জ্ঞাতৃ-স্থানে আমি অধিষ্ঠান করিতেছি কিরূপে?—অপরিবর্ত্তনীয় সাক্ষিরূপে প্রকাশ পাইবার সময় প্রকাশ পাইতেছি কিরূপে? পরিবর্ত্তনশীল নানারূপে। তবেই হইতেছে যে, আছি একরূপ—প্রকাশ পাইতেছি আর একরূপ। এরূপ উল্টা-প্রকাশ'কে সত্যের প্রকাশ বলা যাইতে পারে না। জ্ঞাতৃ-স্থানে আমি যেমন একই অপরিবর্ত্তনীয়, জ্ঞেয়-স্থানেও যদি সেই প্রকার একই অপরিবর্ত্তনীয় রূপে প্রকাশ পাইতাম তবেই আমি তাহাকে সত্যের প্রকাশ বলিয়া বুদ্ধিতে সমাদরপূর্ব্বক স্থানদান করিতে পারিতাম। এই বিষম গোলাকধাঁদার মধ্য হইতে বাহির হইবার একটি কেবল পথ আছে; সে পথ এই :—

জ্ঞাতা-আমি'র জন্য কোনো চিন্তা নাই—জ্ঞাতা-আমি আপন পদে স্থির আছে; কেবল জ্ঞেয়-আমি কখনো বা সুখী, কখনো বা দুঃখী, কখনো বা জ্ঞানী, কখনো বা অজ্ঞানী, কখনো বা ঘটদ্রষ্টা, কখনো বা পটদ্রষ্টা, এই-রূপে—ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন রূপে—প্রকাশ পায়। এরূপ যে হয়—কেন হয়? তাহার কারণ কি? কারণ যে কি, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে।

জ্ঞানের জ্ঞেয়-স্থানে যখন ধন-জন যৌবন দেখা দ্যায়—তখন জ্ঞেয় আমি তা'-সবা'র মাঝখানে সুখি-বেশে বুক ফুলাইয়া বিচরণ করে। জ্ঞানের জ্ঞেয়-স্থানে যখন স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের দীন-হীন-মলিন বেশ এবং বন্ধুবর্গের

অপ্রসন্ন বদন দেখা যায়, তখন জ্ঞেয়-আমি তা-সবা'র মাঝখানে মুমূর্ষু ভাবে কালাতিপাত করে। তবেই হইতেছে যে, জ্ঞেয় বিষয়ের পরিবর্ত্তনেই জ্ঞেয় আমি পরিবর্ত্তিত হয়—বা পরিবর্ত্তিত-হইতেছি রূপে প্রকাশ পায়।

জ্ঞেয় বিষয় নানা; আর নানা বলিয়া এটার পরিবর্ত্তে ওটা, ওটার পরিবর্ত্তে সেটা, এইরূপে এটা-ওটা-সেটা'র মধ্যে পরিবর্ত্তন দাপিয়া বেড়াইতে জো পায়। পরিবর্ত্তনের মধ্যে স্থির থাকিবার এক কেবল উপায়, যাহা বুদ্ধিতে পাওয়া যায়, তাহা এই :—

আমাদের জ্ঞানের জ্ঞেয়-স্থানে যদি অশেষবিধ বিচিত্র বস্তুসকলকে ক্রোড়ে করিয়া এক অদ্বিতীয় সর্ব্বশক্তিসমন্বিত সর্ব্বময় সত্য প্রকাশিত হ'ন —যে সত্য জগতের নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ দুই-ই একাধারে —অর্থাৎ যে সত্য সত্যের একটা ভাব মাত্র নহেন, পরন্তু বাস্তবিকই সত্য; তবে সেই একমাত্র অদ্বিতীয় জ্ঞেয় বস্তুর সঙ্গে গোড় দিয়া আমার জ্ঞেয়-আমিও একই অপরিবর্ত্তনীয় আমি-রূপে প্রকাশ পাইতে পারে; অর্থাৎ জ্ঞানের জ্ঞাতৃস্থানে আমি যেমন একই অপরিবর্ত্তনীয় আমি-রূপে অধিষ্ঠান করিতেছি, জ্ঞানের জ্ঞেয় স্থানেও তেমনি একই অপরিবর্ত্তনীয় রূপে প্রকাশ পাইতে পারি; তাহা হইলেই জ্ঞাতৃস্থানে আমি আছি যেরূপ, জ্ঞেয়স্থানে আমি প্রকাশ-পাই'ও সেইরূপ; ইহারই নাম বাস্তবিক-সত্য-রূপে আপনার নিকটে প্রকাশ পাওয়া। আত্মা যখন এই প্রকার ধ্রুবসত্য-রূপে প্রকাশ পা'ন, তখন সেইরূপ প্রকাশই প্রকৃতপক্ষে আত্মজ্ঞান-শব্দের বাচ্য।

এ যাহা বলিলাম—ইহাতে দাঁড়াইতেছে এই যে, আত্মজ্ঞান এবং সত্য-জ্ঞান এপিট-ওপিট। এইরূপ প্রকৃত আত্মজ্ঞান সাধকের পক্ষে কতদূর সম্ভাবনীয়—কি-প্রকারেই বা সম্ভাবনীয়, তথৈব, সর্ব্বময় মহাশক্তিশালী এক অদ্বিতীয় সত্যবস্তুই বা কিরূপে জ্ঞানগম্য হইতে পারেন—এই সকল গভীর এবং গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে অতীব

সাবধানে—প্রশান্ত, প্রণত এবং সংযত ভাবে—তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

অতএব আজিকের মতো এইখানেই বিশ্রাম করা শ্রেয়।

আত্মা হইতে সত্যে উপসংক্রমণ।

বিগত প্রবন্ধের শেষভাগে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল এই যে, প্রকৃত আত্ম-জ্ঞান সাধকের পক্ষে কতদূর সম্ভাবনীয়—কি প্রকারেই বা সম্ভাবনীয়? এই প্রশ্নটিকে আগে ভাল করিয়া খুলিয়া-খালিয়া নির্ব্বাচন করা যা'ক, তাহার পরে তাহার মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করা যাইবে।

প্রশ্নটির প্রকৃত তাৎপর্য্য এই:—

যিনি জানিতেছেন তিনি জ্ঞাতা এবং যাঁহাকে জানা হইতেছে তিনি জ্ঞেয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যিনি জানিতেছেন, তাঁহাকে জানা কি প্রকারে সম্ভাবনীয়? জ্ঞাতাকে জ্ঞেয় করা কি প্রকারে সম্ভাবনীয়? জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের একীকরণ কি প্রকারে সম্ভাবনীয়?

ইহার সোজা উত্তর এই যে, জলে সাঁতার দেওয়া তোমার পক্ষে কতদূর সম্ভাবনীয় তাহা যদি তুমি জানিতে চাও, তবে অন্তত এক-কোমর জলে নাবিয়া হাত-পা ছুঁড়িতে আরম্ভ কর—তাহা হইলেই সঙ্কল্পিত কার্য্যটির সম্ভাবনীয়তার সম্বন্ধে ক্রমে তোমার চক্ষু ফুটিবে; তাহা না করিয়া তুমি ডাঙায় দাঁড়াইয়া "আগে মাথা উঁচা করিব কি আগে হাত ছুঁড়িব" "আগে হাত ছুঁড়িব কি আগে পা ছুঁড়িব" এইরূপ নানাবিধ প্রণালীর মধ্যে কোন্‌টি সবিশেষ ফলদায়ক, তাহার পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া মাথা ঘুরাইয়া সার হইতেছ—কাজেই জলে সাঁতার দেওয়া যে কতদূর সম্ভাবনীয় সে বিষয়ে কিছুতেই তোমার মনের ধন্দ মিটিতেছে না। তাই বলি যে, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের একীকরণ কতদূর সম্ভাবনীয়, তাহা জানিতে

হইলে তাহা ভাবিয়া দেখা অপেক্ষা করিয়া দেখাই সহজ উপায়। কিন্তু তাহা করিয়া দেখিবার পূর্ব্বে একটি বিষয় সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য। কোনো নূতন ব্রতী যদি সাঁতার শিখিবার মানসে জলে নাবিতে উদ্যত হ'ন, তবে সম্মুখবর্ত্তী জলের ভাবগতি অবগত হইয়া সেরূপ কার্য্যে সাবধানতার সহিত প্রবৃত্ত হওয়াই তাঁহার পক্ষে উচিত। যে স্থানটিতে তিনি নাবিতে ইচ্ছা করিতে-ছেন, সেখানে এক হাঁটু জল, কি এক-কোমর-জল, কি অগাধ জল, তাহার সবিশেষ সন্ধান লওয়া তাঁহার পক্ষে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। আত্মজ্ঞানের সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াই যদি অভিনব ব্রতী এমন এক স্থানে পদ-সংক্রমণ করেন—যেখানে থই পাওয়া যায় না, তবে তিনি দুই পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই পদ-স্খলিত হইয়া বিপদে পড়িবেন তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। অতএব আত্মজ্ঞানের সাধনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আত্মাকে কোন্ স্থানে ধরিতে হইবে, তাহার সন্ধান লওয়া সাধকের প্রথম কর্ত্তব্য, তাহাতে আর ভুল নাই।

জ্ঞাতার ঠিকানা-নির্দ্দেশ।

ছুঁচের আগা দিয়াই কাণ ফোঁড়া হইয়া থাকে—ছুঁচের আগা দিয়াই কাপড় সেলাই করা হইয়া থাকে—ছুঁচের আগাটিই ছুঁচের মুখ্য অঙ্গ, তাহা আমি জানি; কিন্তু ছুঁচের আর-সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাদে শুদ্ধকেবল তাহার ঐ মুখ্য অঙ্গটি, শুদ্ধকেবল তাহার আগামাত্রটি, আমাকে আনিয়া দেয় দেখি—তাহা যদি তুমি আমাকে আনিয়া দিতে পারো, তবেই বলিব যে, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় বাদে শুদ্ধকেবল জ্ঞাতামাত্রকে জ্ঞানের উপলব্ধি গোচরে আনয়ন করা সম্ভবে। কিন্তু ছুঁচের শুদ্ধকেবল আগা-মাত্রটি ধরিতে ছুঁতে পাইবার বস্তু নহে তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। তাহা ধরিতে-ছুঁতে পাইবার বস্তু নহে—কেন? না, যেহেতু তাহা একটি

জ্যামিতিক বিন্দুমাত্র। জ্যামিতিক বিন্দুর থাকিবার মধ্যে আছে কেবল স্থিতি (position); তা বই তাহার আয়তন (magnitude) নাই; আয়তন যখন নাই, তখন কাজেই তাহা ধরিতে-ছুঁতে পাইবার বস্তু নহে। "যিনি দৃশ্য বস্তু দেখিতেছেন" এতখানি কথা বলিলে তবে তাহার মধ্য হইতে দ্রষ্টা-শব্দের অর্থ টানিয়া বাহির করা যাইতে পারে। যিনি'র একটি বাহন হ'চ্ছে দৃশ্য-বস্তু এবং আর-একটি বাহন হ'চ্ছে "দেখিতেছেন" অর্থাৎ দর্শনক্রিয়া; যিনি'র এই দুইটি বাহন-বাদে শুদ্ধকেবল যিনি-মাত্রটি নিঃসঙ্গ জ্যামিতিক বিন্দুরই সহোদর ভ্রাতা, তাহা ধরিতে-ছুঁতে পাইবার বস্তু নহে। একজন রাজচক্রবর্ত্তী, যিনি রাজকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, তিনিও তিনি, আর, একজন গরিব ব্রাহ্মণ, যিনি রাজদ্বারে আতিথ্য যাচ্ঞা করিতেছেন, তিনিও তিনি। ও-তিনি হইতে রাজকার্য্য এবং এ তিনি হইতে যাচ্ঞা-কার্য্য বাদ দিলে দুই তিনির অনেকটা ভার-লাঘব হয়, তাহাতে আর ভুল নাই; কিন্তু যদি ঐরূপ প্রণালীতে দুই তিনির মধ্য হইতে দোঁহার সমস্ত কার্য্য এবং সমস্ত গুণ বাদ দিয়া নিঃসম্বল তিনি দুটিকে আলোচনা ক্ষেত্রে উপস্থিত করানো যায়, তাহা হইলে দুয়ের মধ্যে কোনো প্রভেদই দর্শকের নয়নগোচর হইতে পারে না। কেন না, সে তিনি যে কোন্ তিনি—রাজকার্য্যের কর্ত্তারূপী মহা-তিনি অথবা ভিক্ষা-কার্য্যের কর্ত্তারূপী ক্ষুদ্র তিনি—তাহা তাঁহার গায়ে লেখা নাই; তাহা যখন নাই, তখন কাজেই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ নির্দ্দেশ করিতে পারা কাহারো কর্ত্তৃক সম্ভবে না। সুষুপ্তির-অবস্থায় রাজাধিরাজ মহারাজ এবং ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্র চাসা দোঁহারই পদবী সমান—সে অবস্থায় দোঁহার দুই আত্মার মধ্যে সরিষা-ভোর প্রভেদেরও স্থানাভাব। অতএব এটা যে স্থীর যে, আত্মায় আত্মায় যত-কিছু প্রভেদ এবং প্রত্যেক আত্মার যত-কিছু বিশেষত্ব, সমস্তই আত্মার শক্তি-স্ফূর্ত্তি এবং গুণপ্রকাশের পশ্চাৎ ধরিয়া চলিয়া জ্ঞেয়-স্থানে উপনীত হয়—উপনীত হইয়া

সেই জ্ঞানালোকিত প্রদেশে গৃহপ্রতিষ্ঠা করে; এতদ্ব্যতীত আত্মার কোনো বিশেষত্বই জ্ঞাতৃস্থানের অব্যক্তপুরীতে শুদ্ধকেবল আছি মাত্রে ভর করিয়া জীবনধারণ করিতে পারে না। যদি কেবল আছি মাত্রে ভর করিয়া জ্ঞাতৃস্থানে বর্ত্তমান থাকিলেই আত্মজ্ঞানে সিদ্ধিলাভ করা যাইতে পারিত, তবে বিনা সাধনে সকলেই সিদ্ধ। প্রকৃত কথা এই যে, জ্ঞাতৃস্থানে আত্মা যাহা আছেন, তাহাই আছেন; তদ্ব্যতীত জ্ঞান-স্থানে আত্মার শক্তিস্ফূর্ত্তি চাই এবং জ্ঞেয়স্থানে আত্মার গুণপ্রকাশ চাই; তাহা যতক্ষণ না হইতেছে, ততক্ষণ আত্মজ্ঞান কেবল একটা কথার কথা মাত্র। অর্থাৎ কি না—জ্ঞানস্থানে আত্মার শক্তিস্ফূর্ত্তি না হইলে জ্ঞেয়স্থানে আত্মার গুণ-প্রকাশ হইতে পারে না; জ্ঞেয়স্থানে আত্মার গুণপ্রকাশ না হইলে আত্মজ্ঞান কেবল শব্দ মাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। ফলকথা এই যে, প্রথম উদ্যমেই আত্মাকে জ্ঞাতৃস্থানে উপলব্ধি করিতে গেলে থই পাওয়া যায় না—কাজেই অকূল পাথারে হাবুডুবু খাইতে হয়। অতএব, আত্মাকে যাহাতে জ্ঞেয়স্থানে উপলব্ধি করা যাইতে পারে, তাহারই চেষ্টা দেখা সাধকের প্রথম কর্ত্তব্য।

আত্মজ্ঞানের সাধনপদ্ধতি।

পাতঞ্জল দর্শনে যোগের দুইরূপ সাধন পদ্ধতি নির্দ্দেশিত হইয়াছে। প্রথম পদ্ধতি শুদ্ধকেবল সাধনেরই ব্যাপার, দ্বিতীয় পদ্ধতি সাধন এবং ভজন দুয়ের একত্র সমাবেশ। যোগোক্ত প্রথম পদ্ধতি এইরূপ :—

কোনো একটি ইচ্ছানুরূপ বস্তুতে বা প্রদেশে মনকে নিবদ্ধ করিবে। তাহার পরে লক্ষ্য বিষয়টির প্রতি মনের একটানা স্রোত নিরবচ্ছেদে প্রবাহিত করিতে থাকিবে। প্রথম কার্য্যটির নাম ধারণা, দ্বিতীয় কার্য্যটির নাম ধ্যান। তাহার পরে লক্ষ্য বিষয়টির প্রতি মনোবৃত্তি যখন সর্ব্বতোভাবে

সমাহিত হইবে—যখন সাধকের জ্ঞানে সেই লক্ষ্য বস্তুটি ছাড়া আর কিছুই প্রতিভাত হইবে না ; প্রতীয়মান হইবে তখন এইরূপ—যেন সেই লক্ষ্য বস্তুটিই সমস্ত জগৎ, সেই লক্ষ্য বস্তুটি ছাড়া আর যেন কোনো কিছু নাই—এমন কি, সাধক নিজেও যেন নাই। ইহারই নাম সমাধি। সমাধিতে লক্ষ্য প্রদেশটিতেই—জ্ঞেয়স্থানটিতেই—জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় দুইই জ্ঞানের সমক্ষে একীভূত ভাব ধারণ করিয়া আত্মারূপে প্রকাশিত হয়।

যোগোক্ত দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্চে ঈশ্বর প্রণিধান। ঈশ্বর প্রণিধান কি ?—না, সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে পরম গুরু জানিয়া পরম ভক্তি সহকারে তাঁহাতে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করা। প্রথম পদ্ধতি এবং দ্বিতীয় পদ্ধতির মধ্যে প্রভেদ খুবই আছে—যদিচ পাতঞ্জলদর্শনে সে প্রভেদের গুরুত্বের প্রতি বড় একটা ভ্রুক্ষেপ করা হয় নাই ; কেন যে ভ্রুক্ষেপ করা হয় নাই, তাহার বিশেষ একটি কারণ আছে ;—সে কারণ এই ঃ—সাধনই পাতঞ্জলদর্শনের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। ভজন পাতঞ্জল দর্শনের মুখ্য আলোচ্য বিষয় নহে। এইজন্য ভগবান পতঞ্জলি-মুনি "ভজন-ক্রিয়া—সাধনের মস্ত একটি সহায়" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্য আলোচ্য বিষয় একমাত্র কেবল সত্য, তা-বই কোনো বিশেষদর্শনের বিশেষসত্য বর্ত্তনান প্রবন্ধের মুখ্য আলোচ্য বিষয় নহে। এইজন্য সাধনের গৌরব রক্ষার অনুরোধে ভজনকে তাহার উচ্চপদবী হইতে সরাইয়া রাখা বর্ত্তমানস্থলে কোনো গতিকেই মার্জ্জনীয় বলিয়া আদর পাইতে পারে না। সত্য এই যে, ভজন-ক্রিয়াটি সাধনের প্রধান-একটি সহায় তো বটেই, তা ছাড়া, ভজন-ক্রিয়া সাধনের একটি অপরিহার্য্য মুখ্য অঙ্গ। ভজন-বর্জ্জিত সাধন এক-প্রকার হৃদয়বর্জ্জিত হস্ত—তাহা নিতান্তই অঙ্গহীন। যাহাই হো'ক—ক্রিয়াযোগের সাধন এবং ভক্তিযোগের সাধন, দুইই পরে পরে পর্য্যালোচনা করিয়া

দেখা আবশ্যক; তাহা হইলে দুয়ের মধ্যে কোনটি কতদূর ফলদায়ক, তাহা আপনা হইতেই ধরা পড়িবে।

আত্মজ্ঞানের ঐকাঙ্গিক সাধন।

আত্মজ্ঞানের সাধন পদ্ধতি দুইস্থানে দুইরূপ। যে স্থানে ভাব-জগতের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করা হয়, সে স্থানে একরূপ, এবং যেস্থানে সত্য-জগতের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করা হয়, সেস্থানে একরূপ। ভাব জগতের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করিলে সাধকের নিকটে আত্মশক্তির কার্য্যকারিতা সর্ব্বোপরি প্রকাশ পায়; সত্য জগতের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করিলে সাধকের নিকটে ঐশী শক্তির কার্য্যকারিতা সর্ব্বোপরি প্রকাশ পায়। দুই স্থানের দুই প্রকার সাধনপদ্ধতির মধ্যে এইরূপ মর্ম্মান্তিক প্রভেদ সত্ত্বেও দু'য়ের মধ্যে এক জায়গায় ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় এই যে, দুয়েরই সাধনীয় কার্য্য হ'চেচ জ্ঞাতাকে জ্ঞেয়স্থানে আনয়নপূর্ব্বক জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ের একীকরণ।

ভাব-জগতের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করাই বা কিরূপ, আর, সত্য-জগতের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করাই বা কিরূপ, তাহার একটি মোটামুটি রকমের উপমা দিতেছি, তাহা হইলেই দুয়ের মধ্যগত প্রভেদ সুস্পষ্টরূপে পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।

একজন কাশ্মীর যাত্রী আমাকে বলিলেন, "তুমি যদি কাশ্মীর দেখিতে চাও, তবে আমার সঙ্গে আইস।" আমি বলিলাম, "তথাস্তু।" অনতি-পরে দুইজনে আমরা রেলগাড়ীর দুই কোনে সুখাসীন হইয়া পশ্চিমাভিমুখে প্রধাবিত হইলাম। কিন্তু রেলগাড়ীর ঢিমাচালে আমার বড়ই দেক্ ধরিতে লাগিল। রেলগাড়ীকে "দূরহ" বলিয়া এক ধাক্কায় দূরে সরাইয়া দিয়া মনোরথে আরোহণ করিলাম এবং চকিতের মধ্যে কাশ্মীরের রমণীয় উদ্যান-কাননে উপনীত হইয়া সুগন্ধ সমীরণ সেবন করিতে লাগিলাম।

মনোরথের ধোঁয়াকলে ধোঁয়ার যোগাড় পূর্ব্ব হইতেই হইয়া রহিয়াছিল—তাহার জন্য আমাকে ভাবিতে হয় নাই। অর্থাৎ কাশ্মীর যে কিরূপ চমৎকার স্থান, তাহা নানা পরিব্রাজকের মুখে শুনিয়া শুনিয়া আমার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। আমি সেই সকল শ্রুতপূর্ব্ব বৃত্তান্ত জোড়াতাড়া দিয়া চিদাকাশে (অর্থাৎ আত্মার জ্ঞেয়স্থানে) কাশ্মীরনগর উদ্ভাবন করিলাম; উদ্ভাবন করিয়া তাহার ধ্যানে নিমগ্ন হইলাম। ইহারই নাম ভাব জগতের প্রতি লক্ষ্য নিবেশ। কিয়দ্দিবস পরে আমি যখন সশরীরে কাশ্মীরে উপনীত হইয়া অথাকার সুরম্য নদ নদী-গিরি কাননের প্রতি চাহিয়া দেখিয়া অবাক হইলাম, তখন আমার নেত্রযুগল কি যে স্বর্গভোগ করিতে লাগিল, তাহা বলিবার কথা নহে। ইহারই নাম সত্য জগতে লক্ষ্য নিবিষ্ট করা। রেলগাড়ীতে চক্ষু মুদিত করিয়া যে কাশ্মীর দেখিয়াছিলাম, তাহাও কাশ্মীর এবং তাহার কিছুদিন পরে চক্ষু মেলিয়া যে কাশ্মীর দেখিলাম তাহাও কাশ্মীর; দুই কাশ্মীরের মধ্যে প্রভেদ এই যে, ভাব জগতের সে যে কাশ্মীর, তাহা আমার আত্মশক্তিরই ব্যাপার; পক্ষান্তরে, সত্য জগতের এ যে কাশ্মীর, ইহা সাক্ষাৎ ঐশী শক্তির ব্যাপার। কাশ্মীর দর্শন যেমন দুইরূপ—(১) ভাব জগতের কাশ্মীর দর্শন এবং (২) সত্য-জগতের কাশ্মীর দর্শন; আত্মজ্ঞানও তেমনি দুইরূপ—(১) ভাব জগতের আত্মজ্ঞান এবং (২) সত্যজগতের আত্মজ্ঞান। পুনশ্চ, ভাব-জগতের কাশ্মীর দর্শনে যেমন আত্মশক্তির প্রাধান্য এবং সত্য-জগতের কাশ্মীর-দর্শনে যেমন ঐশী শক্তির প্রাধান্য প্রকাশ পায়; ভাব-জগতের আত্মজ্ঞানে তেমনি আত্মশক্তির প্রাধান্য এবং সত্য-জগতের আত্মজ্ঞানে তেমনি ঐশী শক্তির প্রাধান্য প্রকাশ পায়।

প্রথমে, ভাব-জগতের আত্মজ্ঞানের সাধন-পদ্ধতি কিরূপ, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যা'ক্। (এটা যেন মনে থাকে যে, দুই

পদ্ধতিরই সাধনীয় কার্য্য একই ; কি ? না, জ্ঞাতাকে জ্ঞেয়স্থানে আনয়ন-পূর্ব্বক জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ের একীকরণ।)

পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্রে যেরূপ ধারণা-ধ্যানের প্রণালী-পদ্ধতি উপদিষ্ট হইয়াছে, তদনুসারে প্রথমে চিদাকাশের কোনো একটি বিন্দু পরিমিত জ্ঞেয়স্থানে মনের লক্ষ্য নিবদ্ধ কর। তাহার পরে পড়া মুখস্থ করিবার সময় বালক যেমন একই শব্দ পুনঃপুন উচ্চারণ করে, অথবা জপ করিবার সময় যেমন ভক্ত বৈষ্ণব বা শাক্ত একই বীজমন্ত্র পুনঃপুন উচ্চারণ করে, তেমনি সেই লক্ষ্য বিন্দুটিতে মনকে পুনঃপুন সন্নিবিষ্ট করিবে—যেন সেখান হইতে মন অন্য কোনো স্থানে সরিয়া পলাইতে অবসর না পায়। দুই হ্রস্ব ই ক্রমাগত উচ্চারণ করিতে থাকিলে ক্রমে যেমন দুই ই মিলিয়া এক দীর্ঘ ঈ হইয়া দাঁড়ায়, এবং ই ই ই ই ক্রমাগত উচ্চারণ করিতে থাকিলে ক্রমে যেমন দুই দীর্ঘ-ঈ মিলিয়া এক মহাদীর্ঘ ঈ হইয়া দাঁড়ায়, তেমনি সেই লক্ষ্য বিন্দুটিতে মন ক্রমাগত পরিচালিত হইতে থাকিলে ক্রমে মনের খণ্ড খণ্ড প্রযত্ন একতানে মিলিত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান-প্রবাহে পরিণত হইবে। তাহার পরে ধ্যানের সেই একটানা স্রোত লক্ষ্য-বিন্দুটির প্রতি এরূপ একাগ্রতা সহকারে অনন্যমানসে প্রধাবিত করিবে—যেন লক্ষ্য বিন্দুটি ছাড়া অপর কোনো কিছুই জ্ঞেয়স্থানে তিলমাত্রও অধিকার না পায়। তাহা হইলে সমস্ত জানিবার বস্তু, এবং সেই সঙ্গে জ্ঞাতা আপনি, সেই লক্ষ্য-বিন্দুটিতে কেন্দ্রীভূত হইয়া যাইবে ; তাহাতে দাঁড়াইবে এই যে, আত্মা জ্ঞাতৃস্থানে যেরূপ এক অপরিবর্ত্তনীয় সত্যরূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন, জ্ঞেয়-স্থানে সেইরূপ এক অপরিবর্ত্তনীয় সত্যরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। পরি-বর্ত্তন কাহাকে বলে ? একটি হইতে আরেকটিতে যাওয়ার নাম পরিবর্ত্তন। কাজেই, যদি এরূপ হয় যে, জ্ঞানের সন্নিধানে একটি বস্তু ছাড়া দ্বিতীয় কোন বস্তুই প্রকাশ পাইতেছে না—তবে তাহারই নাম

অপরিবর্ত্তনীয়রূপে প্রকাশ পাওয়া। তবেই হইতেছে যে, সাধকের সমস্ত মনোবৃত্তি যখন লক্ষ্য-বিন্দুটিতে সর্ব্বতোভাবে সমাহিত হয়, তখন আত্মা জ্ঞাতৃস্থানে যেরূপ এক অপরিবর্ত্তনীয় সত্যরূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন, জ্ঞেয়স্থানে সেইরূপ এক অপরিবর্ত্তনীয় সত্যরূপে প্রকাশিত হন। ইহাই ভাব-জগতের আত্মজ্ঞান।

ভাব-জগতের আত্মজ্ঞানের সাধনপদ্ধতি এই যাহা প্রদর্শিত হইল, তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি পৃথক পৃথক করিয়া দৃষ্টিক্ষেত্রে আনয়ন না করিলে তাহার ভিতরকার অনেকগুলি কথা চাপা দেওয়া রহিয়া যাইবে; তাহা হইতে দেওয়া উচিত হয় না। এইজন্য, সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি পৃথক্ পৃথক্ রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা নিতান্তই আবশ্যক; —তাহারই এক্ষণে চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

পূর্ব্বে ইহা যথেষ্ট দেখা হইয়াছে যে, ছুঁচের আর-সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাদে কেবলমাত্র তাহার আগাটি যেমন ধরিতে-ছুঁতে পাইবার বস্তু নহে, তেমনি আত্মার সমস্ত কার্য্য এবং গুণ বাদে—জ্ঞান-স্থানের শক্তিস্ফূর্ত্তি এবং জ্ঞেয়-স্থানের প্রকাশ বাদে—কেবলমাত্র তাঁহার জ্ঞাতৃস্থানের সত্তাটি (শুদ্ধকেবল আছি-মাত্রটি) ধরিতে-ছুঁতে পাইবার বস্তু নহে। এক্ষণে দ্রষ্টব্য এই যে, ছুঁচের সর্ব্বাবয়ব যখন আমার চক্ষের সমক্ষে উপস্থিত হয়, তখন সেই সঙ্গে যেমন ছুঁচের আগাটিও আমার চক্ষের সমক্ষে উপস্থিত হয়, তেমনি আত্মার জ্ঞানস্থানীয় শক্তিস্ফূর্ত্তি এবং জ্ঞেয়স্থানীয় গুণপ্রকাশ যখন আমার জ্ঞানসমক্ষে উপস্থিত হয়, তখন সেই সঙ্গে আত্মার জ্ঞাতৃস্থানীয় সত্তাও আমার জ্ঞান-সমক্ষে উপস্থিত হয়। তাহা যখন হয়, তখন আত্মার সবটা ধরিয়া আমি দেখি এই যে, আত্মা আত্মশক্তি খাটাইয়া জ্ঞাতৃস্থানের অপ্রকাশ হইতে জ্ঞেয়স্থানের প্রকাশে বাহির হইতেছেন; দেখি যে, আত্মশক্তির মূলস্থানে যে-আত্মা জ্ঞাতৃভাবে অধিষ্ঠান করিতেছেন,

আত্মশক্তির ফলস্থানেও সেই আত্মা জ্ঞেয়ভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। তবেই হইতেছে যে, আত্মশক্তির এ-পারে জ্ঞাতৃ-আত্মা এবং ও-পারে জ্ঞেয় আত্মা;—দুই আত্মা একই আত্মা। কেন না, যে আত্মা মূলে অব্যক্ত ছিলেন—আত্মশক্তির কর্ত্তৃত্ব-বলে সেই আত্মাই ফলে ব্যক্ত হইলেন। আত্মার সেই যে শক্তিস্ফূর্ত্তি যাহার এ-পারে অব্যক্ত জ্ঞাতৃ-আত্মা এবং ও-পারে ব্যক্ত জ্ঞেয় আত্মা, সে শক্তিস্ফূর্ত্তি জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের সন্ধিস্থলে থাকিয়া দুয়েরই সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া একীভূত; তাহা জ্ঞাতা, জ্ঞান এবং জ্ঞেয়, সমস্তই একাধারে; কেন না, জ্ঞাতা তাহারই মূল-প্রান্ত, জ্ঞেয় তাহারই ফল-প্রান্ত, এবং জ্ঞান তাহাতেই ওতপ্রোত। এইরূপ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, আত্মশক্তির প্রাধান্যই ভাব-জগতের আত্ম-জ্ঞান-সাধনের গোড়ার কথা। অতঃপর সত্য-জগতের আত্মজ্ঞানের সাধনপদ্ধতি কিরূপ, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

মাঝপথ।

বিশেষ কোনো কার্য্য উপলক্ষে দূরদেশে যাত্রা করিবার সময় মাঝপথে কালবিলম্ব করা যাত্রীর পক্ষে শ্রেয়স্কর নহে—তাহাতে কার্য্যহানী হইতে পারে। তবে, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য মাঝপথের স্থানে স্থানে ন্যূনাধিক কালবিলম্ব না করিলে নয়—কাজেই করিতে হয়। আমরা এক্ষণে আত্মা হইতে সত্যে যাইবার পথে উপনীত হইয়াছি। এই মাঝপথটিতে কিয়ৎকাল থামিয়া-দাঁড়াইয়া কতকগুলি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করা নিতান্ত আবশ্যক।

ভাব জগতের আত্মজ্ঞান কিরূপ পদার্থ, তাহা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখিয়াছি। আমাদের গম্য-স্থান হচ্ছে সত্য-জগৎ। ভাব-জগতের মধ্যদিয়া সত্যজগতে উপনীত হইতে হইবে; তাহার পথ হচ্চে আত্মজ্ঞান।

সম্মুখবর্ত্তী পথের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসকল আলোচিতপূর্ব্ব আত্মজ্ঞানের মধ্য হইতেই সংগ্রহ করিতে হইবে। তাহারই এক্ষণে চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান।

পূর্ব্ব-প্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি যে, সাধক আত্মশক্তি খাটাইয়া আপনাকে জ্ঞাতৃস্থান হইতে জ্ঞেয়স্থানে আনয়ন করেন। তাহা না করিয়া তিনি যদি বলেন—"'আমি আছি' এ কথাটিতে আমার তিল-মাত্রও সংশয় নাই; এই তো আমার আত্মজ্ঞান হইয়াছে; ইহার অধিক তুমি কি চাও?" তবে সে যে তাঁহার আত্মজ্ঞান, সেরূপ আত্মজ্ঞানে সকলেরই আছে; তাহার জন্য সাধনের কোনো আবশ্যকতা নাই। সেরূপ আত্মজ্ঞানে যদি তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারিত, তবে তো কোনো গোলই থাকিত না! দুঃখের বিষয় এই যে, সেরূপ আত্মজ্ঞান কোনো তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিরই আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে না। আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে না কেন? না, যেহেতু সেরূপ আত্মজ্ঞানে শুদ্ধ কেবল আত্মার সত্তা মাত্রের প্রতি লক্ষ্য করা হয়; তা বই, আত্মার আর যে-দুইটি ভাব সেই সত্তার সঙ্গাশ্রিত, সে দুইটি ভাবের প্রতি আদবেই ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। সে দুইটি ভাব কি? জ্ঞানের দিক্ দিয়া দেখিলে সে দুইটি ভাব হচ্চে আত্মার (১) জ্ঞান-ক্রিয়া এবং (২) জ্ঞেয় ভাব; কার্য্যের দিক দিয়া দেখিলে সে দুইটি ভাব হচ্চে আত্মার (১) শক্তিস্ফূর্ত্তি এবং (২) গুণ-প্রকাশ। আত্মার শক্তি এবং গুণের প্রতি কিছুমাত্র দৃক্‌পাত না করিয়া শুদ্ধ কেবল আত্মার সংজ্ঞা নির্ব্বাচনকেই কিছু আর আত্মজ্ঞান বলা যাইতে পারে না। আত্মার সংজ্ঞা-নির্ব্বাচন খুবই সহজ—"যিনি জানিতেছেন তিনিই আত্মা" এইমাত্র। "যিনি জানিতেছেন তিনি আত্মা" এইরূপে আমি আত্মাকে সঙ্গিত করিলাম,

কিন্তু যিনি জানিতেছেন তিনি কিরূপ পদার্থ—কিরূপেই বা তাঁহাকে জ্ঞানে উপলব্ধি করা সম্ভবে—তাহা জানিলাম না, এরূপ আত্মজ্ঞান নিতান্তই অঙ্গহীন, তাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। পক্ষান্তরে, সাধক যখন আত্ম-শক্তি খাটাইয়া আপনাকে আপনার জ্ঞান-গোচরে আনয়ন করেন, তখন তিনি আত্মাকে জ্ঞানের কর্ত্তা জ্ঞাতা, জ্ঞানের লক্ষ্য জ্ঞেয় এবং জ্ঞানের ক্রিয়া জ্ঞানক্রিয়া, এই তিন ভাবে একসঙ্গে উপলব্ধি করেন ; আত্মার কোনো মর্ম্মাশ্রিত ভাবকেই তাঁহার ন্যায্য অধিকার হইতে দূরে সরাইয়া রাখেন না। এইরূপ সর্ব্বাঙ্গীন আত্মজ্ঞানই—গোটা আত্মজ্ঞানই—প্রকৃত আত্মজ্ঞান। তাহারও পরের কথা এই যে, সর্ব্বাঙ্গীন আত্মজ্ঞানেও সাধকের মনের চাঞ্চল্য, সংশয় এবং তজ্জনিত কষ্ট দূর হয় না—যতক্ষণ না তাঁহার সেই স্বশক্তিসম্ভূত আত্মজ্ঞান সর্ব্ব-মূলাধার বাস্তবিক সত্যোধ অবলম্বন পায় ; কিন্তু সে কথা পরে আসিবে। আপাতত ভাব-জগতের ঐরূপ সর্ব্বাঙ্গীন আত্মজ্ঞান হইতে কতকগুলি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করা চাই ; তাহাতেই অন্বেষণচেষ্টা নিয়োগ করা বিধেয়।

ভাব-জগতের সর্ব্বাঙ্গীন আত্মজ্ঞান হইতে আমরা প্রধান যে চারিটি বিষয় সংগ্রহ করিয়া পাইতেছি, তাহা ক্রমান্বয়ে এই :—

(১) আত্মার সত্তা।

(২) আত্মার শক্তিস্ফূর্ত্তি।

(৩) আত্মার গুণপ্রকাশ।

(৪) আত্মার গুণপ্রকাশে আত্মার উপলব্ধি।

এই চারিটি বিষয়। এতদ্ব্যতীত ঐ চারিটি বিষয়ের পরস্পরাধীন সম্বন্ধ হইতে (অথবা যাহা আরো ঠিক—একাত্মভাব হইতে) আরেকটি বিষয় পাইতেছি ; তাহা এই যে, আত্মার সত্তা যাহা সাধনের পূর্ব্বে জ্ঞাতৃস্থানে অব্যক্ত থাকে, সাধনের পথ দিয়া তাহাই জ্ঞেয়স্থানে ব্যক্ত হয় ; তাহা যখন

হয়, তখন আত্মার শক্তিস্ফূর্ত্তি এবং গুণপ্রকাশ দুইই সেই সত্তার সহিত ওতঃপ্রোতভাবে একযোগে ব্যক্ত হয়। এইরূপ যখন কর্ত্তা-কর্ম্ম-ক্রিয়া সমন্বিত সমগ্র আত্মা জ্ঞেয়স্থানে ব্যক্ত হ'ন, তখন সেইরূপ ব্যক্ত হওয়ার নামই সমগ্র আত্মজ্ঞান, এবং তাহা আত্মশক্তিরই ফলস্বরূপ। এই স্থানটিতে একটি সোজা কথা গোলকধাঁদার ন্যায় বিষম এক পাকচক্রময় জটিল এবং দুরূহ আকার ধারণ করে। কথাটি হ'চ্চে—আত্মসত্তা, আত্মশক্তি এবং আত্মজ্ঞান, তিনের মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ। একসঙ্গে অভেদ এবং প্রভেদ বুঝাও কঠিন—বুঝানও কঠিন। পক্ষান্তরে, যদি অভেদ এবং প্রভেদ এই দুই সম্বন্ধকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বুঝিতে এবং বুঝাইতে যাওয়া যায়, তাহা হইলে আর-এক বিপদ্ উপস্থিত হয়,—(১) অভেদ সম্বন্ধ পৃথকরূপে আলোচনা করিতে গেলে প্রভেদের পথ একেবারেই অবরুদ্ধ হইয়া যায়; (২) প্রভেদ সম্বন্ধ পৃথকরূপে আলোচনা করিতে গেলে অভেদের পথ একেবারেই অবরুদ্ধ হইয়া যায়। জানিয়া শুনিয়া আমি এক্ষণে এই অপরিহার্য্য বিপদ্-টিকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইতেছি;—প্রথমে—আত্মসত্তা, আত্মশক্তি এবং আত্মজ্ঞান তিনের মধ্যে অভেদ কিরূপ এবং তাহার পরে তিনের মধ্যে প্রভেদ কিরূপ;—পৃথক পৃথক রূপে এই দুইটি বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেছি। যাহারই যখন তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব, তাহারই দিকে তখন সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ঢলিয়া পড়িব, তাহা আমি জানি; আর, সেই কারণে অপর পক্ষের কোপে পড়িব, তাহাও আমি জানি; জানিয়াও, আমি ফাঁদে পা না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না। ইহার কারণ যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহা এই যে, আমি দেখিয়া-শেখা অপেক্ষা ঠেকিয়া-শেখা পছন্দ করি। আমার এইরূপ বিশ্বাস যে, যাহা ঠেকিয়া শেখা যায়, তাহা যেমন মনোমধ্যে পাকাপোক্ত-রকমে বদ্ধমূল হয়—দেখিয়া-শেখা জিনিষ কখনই তেমনটি হয় না। অতএব প্রথমে প্রভেদের কথা দূরে

সরাইয়া রাখিয়া—জ্ঞান এবং সত্তার মধ্যে অভেদ কিরূপ, তাহা দেখা যাক্।

সম্যক জ্ঞান সত্তা হইতে তিলমাত্রও পৃথক নহে—সম্যক্ জ্ঞান এবং সত্তা একই। যদি বল যে, জ্ঞান এবং সত্তা পরস্পর হইতে ভিন্ন, তবে আমি বলিব যে, যে-অংশে জ্ঞান সত্তা হইতে ভিন্ন, সে অংশে তাহা জ্ঞান নহে। যদি হাতী হাতি-রূপে প্রকাশ পায়, তবে তাহারি নাম হস্তিবিষয়ক জ্ঞান; পক্ষান্তরে, যদি হাতী ঘোড়া রূপে প্রকাশ পায়, তবে তাহার নাম হস্তিবিষয়ক অজ্ঞান বা ভ্রম। তবেই হইতেছে যে, জ্ঞেয়বস্তুর প্রকাশ যে-অংশে জ্ঞেয়বস্তুর সহিত অভিন্নরূপী, সেই অংশেই তাহা জ্ঞাননামের যোগ্য। ইহা হইতে আসিতেছে এই যে, জ্ঞেয়বস্তুর প্রকাশ যদি জ্ঞেয়বস্তু হইতে তিলমাত্রও ভিন্ন হয়, তবে যে-অংশে তাহা জ্ঞেয়বস্তু হইতে ভিন্ন, সেই অংশে তাহা ভ্রম-শব্দের বাচ্য। কথায় বলে "যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা হয়"—যে বিপদের আশঙ্কা করিতেছিলাম, সেই বিপদ্ এক্ষণে সম্মুখে দণ্ডায়মান। উপরের যুক্তি অনুসারে অগত্যা দাঁড়াইতেছে এই যে, জ্ঞেয়-বস্তুর সত্তা এবং সম্যক্ জ্ঞান দুয়ের মধ্যে তিলমাত্রও প্রভেদ নাই, জ্ঞান এবং সত্ত্বা একই। প্রভেদের পক্ষ এতক্ষণ চুপি চুপি অস্ত্র শানাইতেছিল—এক্ষণে অবসর বুঝিয়া তাহা তীব্র বেগে বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল।

সত্তাই যদি জ্ঞান হয়, তবে সত্তা তো গোড়া হইতেই আছে। সত্তাই যদি জ্ঞানের আর-এক নাম হয়, তবে তো জ্ঞান যতদূর হইবার, তাহা গোড়া হইতেই হইয়া বসিয়া আছে। তবে আর জ্ঞানকে পাইবার জন্য এত আগ্রহই বা কেন—জ্ঞানকে বাড়াইবার জন্য এত সাধ্যসাধনাই বা কেন? সত্তার তো উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই, পরিবর্ত্তনও নাই, সত্তা স্বতঃসিদ্ধ; অতএব, সত্তা এবং জ্ঞান যদি একই হয়, তবে কাজেই দাঁড়াইতেছে যে, জ্ঞানের উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই, পরিবর্ত্তনও নাই; জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ। ভ্রম

কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ নহে; ভ্রমের উৎপত্তিও আছে, বিনাশও আছে, পরি-বর্ত্তনও আছে। ভ্রম একটা আগন্তুক পদার্থ অর্থাৎ উড়িয়া-আসিয়া-জুড়িয় বসা রকমের পদার্থ। ভ্রম যখন আগন্তুক পদার্থ, তখন তাহা না থাকিলেও না থাকিতে পারে। মনে কর, জ্ঞান হইতে সমস্ত ভ্রম ঝাঁটাইয়া ফ্যালা হইল, আর, সেই গতিকে জ্ঞান যতদূর নিখুঁত পরিষ্কার হইতে হয়, তাহা হইল। তুমি বলিতেছ যে, ওরূপ অবস্থায় সত্তার সহিত জ্ঞানের তিলমাত্রও প্রভেদ থাকে না। ইহাতে প্রকারান্তরে বলা হইতেছে এই যে, ওরূপ অবস্থায় জ্ঞানের কার্য্য ফুরাইয়া যায়, আর, সেই সঙ্গে জ্ঞান আপনিও ফুরাইয়া যায়;—থাকে কি? না, যাহা গোড়া হইতেই আছে—সত্তা মাত্র। তবেই হইতেছে যে, জ্ঞানের পরম পরিশুদ্ধ অবস্থা জ্ঞানের অন্তিম দশা; সে অবস্থায় জ্ঞান সত্তার সাগরে ঝম্প প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করে।

বাদী, প্রতিবাদী, উভয় পক্ষেরই কথা এই তো শোনা হইল। বাদী যাহাকে বলিতেছেন—জ্ঞানের পরম পরিশুদ্ধ অবস্থা, প্রতিবাদী তাহাকে বলিতেছেন—জ্ঞানের অন্তিম দশা। এই দুই কথার কাহার কি মূল্য, তাহা একবার মনের বাজারে যাচাই করিয়া দেখা যা'ক। মন বলে এই যে, জ্ঞানের পরম পরিশুদ্ধ অবস্থা সকলেরই প্রার্থনীয়—জ্ঞানের অন্তিম দশা কাহারো প্রার্থনীয় নহে। ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, জ্ঞানের পরম পরিশুদ্ধ অবস্থার নিকটে জ্ঞানের অন্তিম দশাকে ঘেঁসিতে না দেওয়া সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। কিন্তু এই প্রার্থনীয় কার্য্যটি ঘটাইয়া তুলিবে কে? তাহা যদি ঘটিবার না হয়, তবে তুমিও তাহা ঘটাইয়া তুলিতে পার না—আমিও তাহা ঘটাইয়া তুলিতে পারি না; আর, তাহা যদি ঘটিবার হয়, তবে তাহার একটা বন্দোবস্ত গোড়া হইতেই হইয়া আছে, তাহাতে আর ভুল নাই। জ্ঞান এবং সত্তার মধ্যে প্রভেদ রক্ষা করা যাহার কার্য্য, সে তাহা চিরকালই করিয়া আসিতেছে এবং চিরকালই করিবে—তুমি বলিলেও করিবে—না বলিলেও

করিবে। সে কার্য্য কাহার কার্য্য? সে কার্য্য যাহার কার্য্য এবং যে তাহা চিরকালই অতন্দ্রিতভাবে করিয়া আসিতেছে এবং করিবেও তাহার নাম শক্তি। শক্তিই জ্ঞান এবং সত্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া দুয়ের প্রভেদ চিরকাল রক্ষা করিয়া আসিতেছে এবং করিবেও তাহা চিরকাল। শক্তির কার্যই হ'চ্চে তাই। এই শক্তির অভ্যাগমনে আমরা ফাঁকা সত্তার বদলে গোটা সত্তা পাইতেছি। গোটা সত্তা হ'চ্চে সত্ত্ব, শক্তি এবং জ্ঞান, তিনই একাধারে। একটি বীণাযন্ত্রের তিনটি তার। বীণাযন্ত্র হ'চ্চে আত্মা; আর, তাহার তিনটি তার হ'চ্চে—সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান। এই তিনটি তার পরস্পরের সহিত এরূপ অভেদ-প্রাণ যে, একটিতে অঙ্গুলি-কোন ঠেকাইবা-মাত্রই তিনটি এক সঙ্গে বাজিয়া উঠে। তা শুধু নয়—সামান্য বীণাযন্ত্রের তন্ত্রীস্থান হাতের তেলোর মতো চ্যাপটা—এইজন্য কান্ তারটি মাঝের তার, এবং কোন্ দুটি তার পার্শ্বের তার, তাহা দেখিবামাত্রই বুঝিতে পারা যায়। পক্ষান্তরে, আলোচ্য বীণাটির তন্ত্রীস্থান বংশখণ্ডের ন্যায় চোঙাকৃতি। এই-জন্য, এ বীণার তিনটি তারের প্রত্যেকটিই মাঝের তার বলিয়া গৃহীত হইতে পারে; আর যেটিকে যখন মাঝের তার বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তখন অপর দুইটি তার সেইটিরই দুই পার্শ্বের দুইটি তার হইয়া দাঁড়ায়। ফলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, কাজের লোকেরা শক্তিকেই মাঝের তার বলিয়া গ্রহণ করেন—পণ্ডিত লোকেরা জ্ঞানকেই মাঝের তার বলিয়া গ্রহণ করেন—ভাবের লোকেরা সত্তাকেই মাঝের তার বলিয়া গ্রহণ করেন। শাক্তের নিকটে শক্তিই জ্ঞান; বেকনের নিকটে জ্ঞানই শক্তি; ভক্তের নিকটে সত্তা বা বস্তুই সার—যেমন "বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর!" যখন শক্তিকে সত্তা এবং জ্ঞানের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া ধরা যায়, তখন মনে হয় যে, জ্ঞান অপেক্ষা শক্তি সত্তার নিকট বস্তু; তেমনি আবার, যখন জ্ঞানকে শক্তি এবং সত্তার মধ্যবর্ত্তী বলিয়া ধরা যায়, তখন মনে হয় যে শক্তি অপেক্ষা

জ্ঞান সত্তার নিকটের বস্তু। প্রকৃত কথা এই যে, শক্তি এবং জ্ঞান, দুইই সত্তার সহিত ওতপ্রোত;—কাজেই দুইকে যদি সত্তা হইতে ভিন্ন করিয়া দেখিতে হয়, তবে উভয়কে সত্তা হইতে সমদূরবর্ত্তী বলাই যুক্তি-সঙ্গত; আর, যদি দুইকে সত্তার সহিত অভিন্নভাবে দেখিতে হয়, তবে তো কথাই নাই; তবে সত্তাও যা, শক্তিও তা, জ্ঞানও তা, তিনই এক হইয়া দাঁড়ায়। ন্যায়দর্শনের একটি গোড়ার কথাই হ'চ্চে—"শক্তিশক্তিমতো-রভেদঃ" শক্তি এবং শক্তিমান্ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ নাই। কথাগুলা বড্ড দার্শনিক হইয়া পড়িতেছে; অতএব একটা স্থূল উদাহরণ দিতেছি, তাহা হইলেই এখানকার প্রকৃত মন্তব্য কথাটি পাঠকের সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে।

আমার মনোমধ্যে আমি একটা গল্প সাজাইয়া তাহার রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। গল্পটি সংক্ষেপে এইঃ—

অবন্তীরাজ্যের প্রধান মন্ত্রী নানাপ্রকার ছলে-বলে-কৌশলে রাজসিংহাসন অধিকার করিলেন এবং অবশেষে আপনার পাকচক্রে আপনি জড়াইয়া পড়িয়া অশেষ দুর্গতি প্রাপ্ত হইলেন।

গল্পের মাঝখানটিতে দুষ্ট মন্ত্রী যখন সুখ-সমৃদ্ধিতে স্ফীত হইয়া ধরাকে সরা-জ্ঞান করিতেছে, তখনকার সে কথাটি আমার প্রকৃত মনের কথা নহে; অথচ সেই কথাটির নানা প্রকার ডালপালা সাজাইয়া তাহাই আমাকে সর্ব্বাগ্রে রচনা করিতে হইতেছে। আমার যাহা প্রকৃত মনের কথা, তাহা সকলের শেষে বাহির হইবে। দুষ্ট মন্ত্রীর দুর্গতি-আকাঙ্ক্ষা রচিতব্য উপন্যাস-টির বীজ। সেই বীজটি এক্ষণে আমার মনের মধ্যে মাটিচাপা রহিয়াছে। গল্পের শেষভাগে ঐ বীজটি যখন প্রকাশ্যে বহির্গত হইবে, তখন তাহা শস্যের আকার ধারণ করিবে; অথবা, যাহা একই কথা—নিজমূর্ত্তি ধারণ করিবে। এখন, যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, বীজের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটের বস্তু কে? তবে তাহার দুইভাবের উত্তর দুই প্রকার। এক ভাবের উত্তর এই যে,

বীজের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটের বস্তু হ'চ্চে অঙ্কুর; আর-এক ভাবের উত্তর এই যে, বীজের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটের বস্তু হ'চ্চে শস্য। প্রথম ভাবের উত্তর-টির ভাবার্থ যে কি, তাহা তাহার গায়ে লেখা রহিয়াছে; তাহা এই যে, বীজের অব্যবহিত পরবর্ত্তী দেশকালে অঙ্কুর ফুটিয়া বাহির হয়। দ্বিতীয় ভাবের উত্তরটির একটু টীকা করা আবশ্যক। সে টীকা এইঃ—

শস্যই বীজের নিজমূর্ত্তি। অঙ্কুর বীজের ব্যক্তিমূর্ত্তি। উপন্যাসের শেষের কথাটিই আমার মনের নিকটতম বস্তু;—মাঝের ডালপালা সেই নিকটতম বস্তুটিকে দূরে সরাইয়া রাখিতেছে। মাঝের ডালপালা আমার মনের এত যে বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে—তথাপি তাহাকে আমি একটিবারও নিবারণ না করিয়া ক্রমিকই প্রশ্রয় দিতেছি। কেন এরূপ করিতেছ? তাহার কারণ কি? কারণ আর কিছু না—বিপরীত ভাবের প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া মনোগত ভাবটিকে বিধিমতে ফুটাইয়া তুলিবার ইচ্ছা। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, গল্পের ডালপালা সাজাইয়া যে কথাটিকে আমি সেই জঙ্গলাকীর্ণ প্রাচীরের ও-পিটে সরাইয়া রাখিতেছি, সেই শেষের কথাটি গোড়াতেই আমার মনে উপস্থিত হইয়াছিল এবং গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত ক্রমাগতই তাহা আমার মনে নিরবচ্ছেদে লাগিয়া রহিয়াছে। তবেই হইতেছে যে, সেই শেষের কথাটিই সর্ব্বাপেক্ষা আমার মনের নিকটের বস্তু। এখন কথা হচ্চে এই যে, বীজ যেমন ডালপালার মধ্য দিয়া শস্যাকারে ফুটিয়া বাহির হইয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ করে, সত্তা সেইরূপ শক্তিস্ফূর্ত্তির মধ্য দিয়া জ্ঞানাকারে ব্যক্ত হইয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ করে। যে হিসাবে শস্য বীজের নিকটতম বস্তু (অর্থাৎ যে হিসাবে গল্পের শেষের কথাটিই গোড়ার কথা) সেই হিসাবে, জ্ঞান, সত্তার নিকটতম বস্তু; আর যে হিসাবে অঙ্কুর বীজের নিকটতম বস্তু, সেই হিসাবে শক্তি, সত্তার নিকটতম বস্তু। যদি শক্তির প্রতি আদবেই দৃকপাত না করা যায়, তবে জ্ঞান এবং সত্তা একাকারে পরিণত হয়, তাহা আমরা

একটু পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। এটাও তেমনি দেখা উচিত যে, যদি জ্ঞানের প্রতি আদবেই দৃক্‌পাত করা না যায়, তবে সত্তা এবং শক্তি একাকারে পরিণত হয়; কেন না, জ্ঞানের ভোগে না আসিলে শক্তির সমস্ত কার্য্যই ব্যর্থ হইয়া গিয়া একান্তপক্ষেই তাহা ভূতের ব্যাগার হইয়া দাঁড়ায়। মনে কর—আর সবই হইয়াছে, কেবল চেতন-পদার্থ হয়ও নাই, আর, ভবিষ্যতে যে হইবে, তাহার সম্ভাবনাও নাই; এরূপ অবস্থায় শক্তি কেন-যে শুধু শুধু খাটিয়া মরিবে, তাহার কোনো অর্থ থাকে না; কাজেই, ওরূপ উদ্দেশ্য-বিহীন, লক্ষ্য-বিহীন, অর্থ-বিহীন অবস্থায় শক্তি সত্তাতে বিলীন হইয়া গেলেই বাঁচে; তা শুধু নয়—ওরূপ অবস্থায় শক্তি আগেভাগেই সত্তাতে বিলীন হইয়া বসিয়া আছে; কেন না, জ্ঞানের নিকটে শক্তির কার্য্য প্রকাশ পাওয়াতেই শক্তির শক্তিত্ব হয়—শক্তির প্রকাশ বন্ধ হওয়ার নামই শক্তির প্রলয়-অবস্থা। জ্ঞান না থাকিলে শক্তির প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়; শক্তির প্রকাশ বন্ধ হইয়া গেলেই শক্তি সত্তাতে বিলীন হইয় যায়। এইরূপ আমরা দেখিতেছি যে, একদিকে, শক্তি,—জ্ঞান এবং সত্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া জ্ঞান এবং সত্তার প্রভেদ রক্ষা করিতেছে; আর একদিকে, জ্ঞান,—সত্তা এবং শক্তির মাঝখানে দাঁড়াইয়া সত্তা এবং শক্তির প্রভেদ রক্ষা করিতেছে।

এতক্ষণের ধস্তাধস্তির পরে প্রকৃত কথাটির দর্শন পাওয়া গেল; তাহা কি? না সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞানের প্রভেদাত্মক অভেদ এবং অভেদাত্মক প্রভেদ, এক কথায়—একাত্মভাব।

গোড়াতেই আমাদের মনে বিষম এক আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল এই যে, জ্ঞানের পরম পরিশুদ্ধ অবস্থা যদি জ্ঞানের অন্তিম-দশারই আর-এক নাম হয়, তবেই তো বিপদ্! এক্ষণে দেখিতেছি যে, সে আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক। কেননা, সত্তা বলিলেও সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান একসঙ্গে বুঝায়—জ্ঞান বলিলেও সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান এক সঙ্গে বুঝায়,—শক্তি বলিলেও সত্তা,

শক্তি এবং জ্ঞান একসঙ্গে বুঝায়; প্রভেদ কেবল এই যে, সত্তা বলিলে সত্তা-প্রধান জ্ঞান-এবং শক্তি বুঝায়, শক্তি বলিলে শক্তি-প্রধান সত্তা এবং জ্ঞান বুঝায়, জ্ঞান বলিলে জ্ঞান-প্রধান শক্তি-এবং-সত্তা বুঝায়। সত্তাকে যদি সত্তা প্রধান জ্ঞান-এবং-শক্তি না বলিয়া তাহাকে জ্ঞান এবং শক্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথকরূপে গ্রহণ করিতে চাও; শক্তিকে যদি শক্তি-প্রধান জ্ঞান-এবং-সত্তা না বলিয়া জ্ঞান-এবং-সত্তা হইতে সম্পূর্ণ পৃথকরূপে গ্রহণ করিতে চাও; জ্ঞানকে যদি জ্ঞান প্রধান শক্তি-এবং-সত্তা না বলিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ পৃথক্-রূপে গ্রহণ করিতে চাও; তবে তাহা করিয়া দেখ—তাহা হইলেই তোমার চক্ষু ফুটিবে। সত্তাকে তুমি যদি শক্তি হইতে পৃথক কর, তবে সত্তার সহিত তোমার কোনো সম্বন্ধই ঘটিতে পারিবে না; সত্তাকে যদি জ্ঞান হইতে পৃথক্ কর, তবে সত্তা তোমার নিকটে প্রকাশ পাইতে পারিবে না। এরূপ অবস্থায়, তোমার মুখে সত্তা-শব্দ একটা নিতান্তই উড়া-সামগ্রী, তাহা বায়ুর অধিক আর কিছুই নহে। তেমনি, জ্ঞানকে সত্তা-এবং-শক্তি হইতে পৃথক্ করিলে জ্ঞানও কিছুই না হইয়া যাইবে; শক্তিকে সত্তা-এবং-জ্ঞান হইতে পৃথক্ করিলে তাহারও ঐ দশা ঘটিবে। ফল কথা এই যে, দীপ যেমন দীপশিখা, দীপরশ্মি এবং দীপালোক তিনই একাধারে, আত্মা তেমনি আত্মসত্তা, আত্মশক্তি এবং আত্মজ্ঞান, তিনই একাধারে। অতএব এটা স্থির যে, সাধকের জ্ঞানে যদি আত্মা প্রকাশিত হ'ন, তবে আত্মার সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান, তিনই একসঙ্গে প্রকাশিত হইবে; এরূপ হইবে না যে,

(১) জ্ঞান এবং শক্তি অন্তর্হিত হইয়া শুদ্ধকেবল সত্তামাত্র প্রকাশ পাইতেছে;

অথবা

(২) শক্তি এবং সত্তা অন্তর্হিত হইয়া শুদ্ধকেবল জ্ঞান মাত্র প্রকাশ পাইতেছে;

(৩) সত্তা এবং জ্ঞান অন্তর্হিত হইয়া গিয়া শুদ্ধকেবল শক্তিমাত্র প্রকাশ পাইতেছে।

মাঝপথের ব্যাপার অনেকটা বলিয়া চুকিলাম। অল্প একটু যাহা বাকি আছে, তাহা বারান্তরের জন্য স্থগিত রাখা হইল। বিষয়টি এই :— আত্মজ্ঞানের ভিতরেই তিন পদার্থের (সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞানের) তারতম্যই বা কিরূপ—সামঞ্জস্যই বা কিরূপ—তাহার পর্য্যালোচনা।

ত্রিকের তারতম্য এবং সামঞ্জস্য।

বিগতবারের সমালোচনায় এটা বেশ বুঝিতে পারা গিয়ছে যে, সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান, এই তিন মৌলিক পদার্থের প্রত্যেকেই অপর দুইটির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে জড়িত—এরূপ ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, একটিকে টানিলেই অপর দুইটিতে টান পড়ে।

কোনো ব্যক্তি তর্কের তোড়ে বলিতে পারেন যে, "আমি কেবল সত্তা মানি—শক্তিও মানি না, জ্ঞানও মানি না"; অথবা, "আমি কেবল শক্তি মানি—সত্তাও মানি না, জ্ঞানও মানি না", অথবা, "আমি কেবল জ্ঞান মানি—সত্তাও মানি না, শক্তিও মানি না"। মুখে তিনি তাহা বলিতে পারেন, কিন্তু মুখের কথায় কাহার কি আসে যায়? কাজে তিনি একটিও এমন সত্তাবৎ বস্তু (সংক্ষেপে—সদ্‌বস্তু), বা জ্ঞান-পদার্থ, বা শক্তি-পদার্থ, আমাকে দেখা'ন্ দেখি, যাহা অপর দুইটির কোনো ধারই ধারে না? যতই ধস্তাধস্তি করুন্ না কেন—কিছুতেই তাহা তিনি পারিয়া উঠিবেন না। তিনি হয় তো একজন মস্ত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত,—আমার স্পর্দ্ধাবাক্য শুনিয়া তিনি হয়তো মনে মনে হাসিবেন; তিনি হয় তো বলিবেন—"জ্যামিতি-পুস্তকের পাত-উল্টানো বোধ করি হয় নাই!

জ্যামিতিক রেখা কাহাকে বলে, তাহা জানো? যাহার দৈর্ঘ্য আছে—প্রস্থ নাই, তাহাই রেখা। প্রস্থবিহীন দৈর্ঘ্য যদি তোমার দেখিবার ইচ্ছা হয়, তবে এখন তুমি তাহা দেখিতে পাইবে না। কিছুকাল ধরিয়া জ্যামিতিবিদ্যার মন্ত্রপূত অঞ্জনে তোমার জ্ঞানচক্ষুকে মার্জ্জিত কর, তাহা হইলেই অবলীলাক্রমে তুমি তাহা দেখিতে পাইবে; আর, তখন তুমি বুঝিতে পারিবে যে, জ্যামিতিক রেখা শুধুকেবল জ্ঞানেরই ব্যাপার—তাহা সত্তারও কোনো ধার ধারে না—শক্তিরও কোনো ধার ধারে না। রেখাও যেমন, সমতাও তেমনি, দুই-ই নিছক জ্ঞানের ব্যাপার; আর, সমস্ত জ্যামিতি-বিদ্যা ঐ দুই অতীব সূক্ষ্ম—যেমন সূক্ষ্ম তেমনি দৃঢ়—ভিত্তিমূলের উপরে প্রতিষ্ঠিত। তা ছাড়া, যন্ত্রবিদ্যার (mechanics এর) ক খ'র সঙ্গে যদি তোমার ঘুণাক্ষরেও পরিচয় থাকিত, তাহা হইলে বলিবামাত্রই বুঝিতে পারিতে যে, গতিরই সঙ্গে গতি মেশামেশি করে, গতিরই সঙ্গে গতি যোঝাযুঝি করে, গতিরই সঙ্গে গতি বেগ বিনিময় করে, গতির সমস্ত সম্বন্ধ স্বজাতির মধ্যেই—গতির মধ্যেই—আবদ্ধ; তাহা নিছক শক্তিরই ব্যাপার; তাহা জ্ঞানেরও সহিত কোনো সংস্রব রাখে না—সত্তারও সহিত কোনো সংস্রব রাখে না।" বুঝিলাম। ইনি যদি আমার স্পর্দ্ধা মার্জ্জনা করেন, তবে ইহাকে একটি কথা আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই:—

জ্যামিতি-বিদ্যা কি তাঁহার মুখস্থ-বিদ্যা-মাত্র—না আর-কিছু? শুধুই যদি তাহা মুখস্থ বিদ্যা হয়, তাহা হইলে মুখে "রেখা" "সমতা" প্রভৃতি কতকগুলা বাঁধি গৎ উচ্চারণ করিলেই সে বিদ্যার যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হয়—মনে কিছু না ভাবিলেও চলে। তাহা যদি না হয়—জ্যামিতি-বিদ্যা শুধু যদি মুখস্থ-বিদ্যা না হয়, তবে মুখে রেখা শব্দ উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে মনে রেখা ভাবনা করা আবশ্যক—দোকানের বহির্দ্বারের ললাটে জমকালো অক্ষরে "কাশ্মীরি শাল" মুদ্রাঙ্কিত করিবার পূর্ব্বে দোকানের ভিতর-মহলে

কাশ্মীরি শাল গুছাইয়া রাখা আবশ্যক। মনে রেখা ভাবনা করিতে গেলেই চিদাকাশে রেখা টানা ব্যতিরেকে আর কোনো উপায়ে তাহা সম্ভবনীয় নহে। অতএব প্রতিবাদীর জ্যামিতি-বিদ্যা শুধুই যদি মুখস্থ বিদ্যা না হয়, তবে মুখে রেখা-শব্দ উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে মনের আলেখ্যপটে মনে মনে একটা রেখা টানা তাঁহার পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক। মনের আলেখ্যপটে মনে মনে রেখা টানা একপ্রকার ক্রিয়া—মানসিক্ ক্রিয়া। মানসিক ক্রিয়া মনের শক্তিস্ফূর্ত্তি। তবেই হইতেছে যে, "জ্যামিতিক-রেখা শুধুই কেবল জ্ঞানের ব্যাপার—শক্তির সহিত মূলেই তাহার কোনো সম্পর্ক নাই" এরূপ একটা কথা নিতান্তই গায়ের জোরের কথা, তাহা যুক্তির বড়-একটা ধার ধারে না। তোমার জ্যামিতিক-রেখার তো এই দশা—তাহার আবার একটা শনিবারের দোসর জুটাইয়াছ সমতা!

দুই রেখা দেখিবামাত্রই—না ভাবিয়া না চিন্তিয়া—আমি যদি বলি যে, উভয়ে পরস্পরের সহিত সমান, তবে তাহা আমার একটা মুখের কথামাত্র হইয়াই ক্ষান্ত থাকিবে। পক্ষান্তরে, আমি যদি রেখা-দুটাকে পরস্পরের গায়ে-গায়ে মিলাইয়া মাপিয়া দেখিয়া, অথবা, সে-দুটাকে একে-একে তৃতীয় কোনো রেখার গায়ে-গায়ে মিলাইয়া মাপিয়া দেখিয়া বলি যে, উভয়ে পরস্পরের সহিত সমান, তাহা হইলেই আমার মুখের কথার সহিত মনের কথার মিল থাকিবে। মনে মনে মানসিক রেখাদ্বয়কে গায়ে-গায়ে মিলানো একপ্রকার যোজন-ক্রিয়া—মানসিক যোজন-ক্রিয়া। মানসিক যোজন-ক্রিয়া মনের শক্তিস্ফূর্ত্তি, তাহাতে আর ভুল নাই। তবে আর কেমন করিয়া বলিব যে, জ্যামিতিক সমতা শুধুই কেবল জ্ঞানের ব্যাপার—শক্তির সহিত মূলেই তাহার কোন সম্পর্ক নাই? জ্যামিতিক রেখা, তথৈব জ্যামিতিক সমতা, জ্ঞানের ব্যাপার তাহা কে না স্বীকার করিবে? কিন্তু তা ছাড়া, দুইই তলে-তলে শক্তির ব্যাপার, এ কথাটিও

স্বীকার করা চাই—তা নহিলে নিস্তার নাই। প্রধান দুইটি জ্ঞান-ঘ্যাঁসা পদার্থ, রেখা এবং সমতা, শক্তির সহিত কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে জড়িত—এই তো তাহা কষামাজা করিয়া দেখা গেল; অতঃপর, দুইই বাস্তবিকসত্তার সহিত কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে জড়িত, তাহা কষিয়া-মাজিয়া দেখাযাক্।

ইউক্লিড্ তাঁহার জ্যামিতির চতুর্থ প্রস্তাবের গোড়াতেই বলিতেছেন—"অমুক ত্রিভুজকে অমুক ত্রিভুজের গাত্রে যোজনা (apply) কর।" তুমি বলিবে যে, ইউক্লিড্ ত্রিভুজ-দুটাকে মনে মনে পরস্পরের সহিত যোজনা করিতে বলিতেছেন। আমিও তাহাই বলি। কিন্তু আবার এটাও বলি যে, ত্রিভুজ-দুটাকে যদি দৃঢ়বস্তু (rigid body) বলিয়া ভাবনা করা না যায়, তবে মনে মনেও সে-দুটাকে গায়ে গায়ে মিলাইয়া মাপিয়া দেখা কাহারো কর্তৃক সম্ভাবনীয় নহে। ক-অক্ষরটিকে তুমি মনে মনে ক-স্থান হইতে

ক খ

খ-স্থানে সরাইয়া রাখিতে পার—ইহা কেহই অস্বীকার করিতেছে না; কিন্তু ক-অক্ষর আকাশের যে স্থানটি ভরাট্ করিয়া রহিয়াছে, সেই শূন্য স্থানটিকে (space-টিকে) মনে মনে খ-স্থানে সরাইয়া রাখো দেখি—কখনই তাহা তুমি পারিবে না। অতএব এটা স্থির যে, যে-সময়ে আমি মনে মনে দুই বস্তুকে পরস্পরের গায়ে-গায়ে মিলাইয়া মাপিয়া দেখিতে যাই, সে সময়েও মাপ্য বস্তু দুটাকে দৃঢ়বস্তু (rigid body) বলিয়া না ভাবিলে চালতে পারে না; কেন না, বায়ুর ন্যায় উড়া বস্তু দ্বয়কে, অথবা, জলের ন্যায় তরল বস্তুদ্বয়কে মনে-মনেও—কল্পনাতেও—গায়ে-গায়ে মিলাইয়া মাপিয়া দেখা কাহারো কর্তৃক সম্ভাবনীয় নহে। ফলে, সমস্ত বস্তুই যদি বায়ুর ন্যায় অদৃঢ় হইত, তাহা হইলে কাহারো মনোমধ্যে "জ্যামিতিক সমতা" বলিয়া একটা ভাব বদ্ধমূল হইতে পারা দূরে থাকুক্—দাঁড়াইতেই পারিত না, ইহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। কাজেই বলিতে হইতেছে যে, জ্যামিতিক সমতা দৃঢ়বস্তুর সত্তার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে

জড়িত। এ সম্বন্ধে আর একটি বিষয় দ্রষ্টব্য এই যে, "একটা বস্তু" বা "একটি বস্তু" বলিতে দৃঢ়-বস্তুই বুঝায়—অদৃঢ় বস্তু বুঝায় না। তার সাক্ষী, দৃঢ়-বস্তুর ব্যালা আমরা বলি "একটি টাকা" "একটা লাঠি" ইত্যাদি, অদৃঢ়-বস্তুর ব্যালা বলি "একঘটি জল" "একঘর ধোঁয়া" ইত্যাদি। শেষোক্তের ব্যালা "একটি জল" বা "একটা ধোঁয়া" এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহার অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া ভার হয়। ভার হয় কেন? তাহার কারণ কি? তাহার কারণ আর-কিছু না—অদৃঢ়-বস্তুর আয়তনের পরিমাণ স্থির রাখিতে হইলে তাহাকে দৃঢ় বস্তু দিয়া ঘেরাও করা ব্যাতিরেকে অন্য কোনো উপায়ে তাহা সম্ভাবনীয় নহে। আমরা যেমন বলি "একটি টাকা", তেমনি বলি "একটি রেখা"; ইহাতেই ভাবে বুঝা যাইতেছে যে, রেখা বলিতে আমরা দৃঢ়-রেখাই বুঝি।

ভাবে এ যাহা বুঝা যায়—যুক্তিতেও তাহাই পাওয়া যায়। যুক্তি এইরূপ :—

(১) রেখার আর এক নাম দৈর্ঘ্য।

(২) দৈর্ঘ্যমাত্রেরই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ থাকা চাই।

(৩) দৃঢ়-বস্তুর বিনা সাহায্যে অদৃঢ়-বস্তুর দৈর্ঘ্যকে (বায়ুর দৈর্ঘ্যকে বা জলের দৈর্ঘ্যকে) নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আটক করিয়া রাখা সম্ভবে না।

(৪) কাজেই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দৈর্ঘ্য বা রেখা ভাবনা করিতে গেলেই সেই সঙ্গে দৃঢ়-বস্তুর ভাবনা আপনা-আপনি আসিয়া পড়ে।

এখন দ্রষ্টব্য এই যে, আমি যদি বলি "দৈর্ঘ্য এক প্রকার গুণ—সুতরাং তাহা বস্তু-সাপেক্ষ," তবে তাহার উত্তরে তুমি অনায়াসে বলিতে পার যে, দৈর্ঘ্য গুণ বটে, কিন্তু তাহা বস্তুর গুণ নহে—তাহা এক প্রকার অবস্তুর গুণ—শূন্য আকাশের গুণ। স্বীকার করিলাম যে, দৈর্ঘ্য শূন্য আকাশের গুণ—কিন্তু দৃঢ়তা তো আর শূন্য আকাশের গুণ নহে। দৃঢ়তা দৃঢ়বস্তুরই

গুণ, তাহাতে আর ভুল নাই। পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ রেখা ভাবিতে গেলেই দৃঢ়-রেখা ভাবনা করিতে হয়; এখন দেখিতেছি যে, দৃঢ়তা বাস্তবিক পদার্থের গুণ. তা বই, তাহা শূন্য আকাশের গুণ নহে। তবেই হইতেছে যে, জ্যামিতিক রেখা দৃঢ়-বস্তুর বাস্তবিক সত্তার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-সূত্রে জড়িত। তোমার পক্ষের প্রধান দুইটি সাক্ষী হ'চ্চে জ্যামিতি-বিদ্যার রেখা এবং যন্ত্র-বিদ্যার গতি। রেখা-সাক্ষী নিরস্ত হইল—এখন গতি-সাক্ষী কি বলে, তাহা দেখা যাক্।

"গতি" বলিলে শুনিতে শুনায় একটিমাত্র শব্দ, কিন্তু বুঝিতে বুঝায় দুইটি বিষয় একসঙ্গে—(১) চলমান বস্তু এবং (২) প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার স্থান-পরিবর্ত্তন। স্থান-পরিবর্ত্তন শক্তিরই ব্যাপার, তাহাতে আর ভুল নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া এটা ভুলিলে চলিবে না যে, চালক শক্তি চাল্য বস্তুর উপরেই কার্য্য করে—শূন্যের উপরে কার্য্য করে না। আপাতত মনে হইতে পারে যে, আলোক-পদার্থ, তথৈব তাড়িত-পদার্থ. নিছক গতিক্রিয়া; তাহার সহিত বাস্তবিক-পদার্থের মূলেই কোনো সম্পর্ক নাই। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, ও-সকল বৈদ্যুতিক গতি এক-প্রকার সূক্ষ্ম পদার্থের তরঙ্গ-লীলা—ঈথরের তরঙ্গলীলা।

কোনো-কিছুরই গতি নহে—অথচ গতি, এরূপ গতি বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অসম্ভব। তবেই হইতেছে যে, গতি বস্তুসত্তার সহিত, অথবা, যাহা একই কথা—বাস্তবিক সত্তার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে জড়িত;—জ্ঞানেরও সহিত তদ্বৎ। জ্ঞানেরও সহিত যে, তাহা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে জড়িত, তাহার প্রমাণ কি? তাহার প্রমাণ এই :—

ক-বস্তুর অচল অবস্থায় বা গতিশূন্য অবস্থায়, ক-বস্তু প্রতিমুহূর্ত্তেই

ক

ক-স্থান ভরাট্ করিয়া অবস্থিতি করে। পক্ষান্তরে, ক-বস্তুর সচল অবস্থায়, সে ক-স্থান খালি করিয়া

খ-স্থান ভরাট্ করে, খ-স্থান খালি করিয়া গ-স্থান ভরাট্ করে, ইত্যাদি।

ক খ গ

এখন দ্রষ্টব্য এই যে, ক-স্থান যদি ক্রমাগতই ক-বস্তুর সত্তায় ভরাট্ থাকে, তাহা হইলে ক-স্থানে ক-বস্তুর গতি থাকিতে পারে না ; তেমনি আবার, খ-স্থান যদি ক্রমাগতই খালি থাকে, তবে খ-স্থানেও ক-বস্তুর গতি থাকিতে পারে না। ক-বস্তুর গতি তবে থাকে কোন্ স্থানে ? যখন ভরাট্ স্থান খালি হইবামাত্র খালি স্থান ভরাট্ হয়—যখন ক-স্থান খালি হইবামাত্র খ-স্থান ভরাট্ হয়—তখন ক বস্তুর গতি খালি-স্থানে এক পা রাখিয়া ভরাট্ স্থানে আরেক পা বাড়ায়। তবেই হইতেছে যে, গতি দাঁড়াইয়া থাকে অতীব একটি সঙ্কট-স্থানে ; এক দিকে, অব্যবহিত পূর্ব্বমুহূর্ত্তে যাহা ভরাট্ ছিল, কিন্তু এখন খালি হইয়াছে, সেই খালি-স্থান ; আর-এক দিকে, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে যাহা বস্তু-সত্তায় ভরাট্ হইল, সেই ভরাট্ স্থান (খালি স্থান এবং ভরাট্ স্থান) : এই দুই নৌকায় পা দিয়া—ভেল্কিবাজ গতি দুয়ের সন্ধিস্থানে দাঁড়াইয়া থাকে। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, সেই যে খালিস্থান—যাহাতে এক পায়ের ভর না রাখিলে গতির গতিত্ব হয় না—সে খালি-স্থান বস্তুটা কি ? তাহা শূন্য আকাশমাত্র ; তাহা বস্তুহিসাবেও কিছুই না—শক্তিহিসাবেও কিছুই না ; তাহা জ্ঞানেরই ব্যাপার। তবেই হইতেছে যে, গতি বলিয়া যে একটা ক্রিয়া, তাহা শক্তি এবং সত্তার সঙ্গেও যেমন—জ্ঞানের সঙ্গেও তেমনি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে জড়িত। এ যাহা অতীব সংক্ষেপে বলিলাম, তাহা আর-একটু বিস্তার করিয়া না বলিলে—কথাটা হয় তো পাঠকের মনের ধারণা হইতে ফস্কিয়া যাইবে। অতএব ঐ কথাটিই আর-একটু খোলসা করিয়া বলি :—

একটা পাখী যখন চক্ষের সম্মুখ দিয়া উড়িয়া চলিতেছে, তখন তদ্দৃষ্টে কেহ বলিতে পারেন যে, "আমি ঐ পাখীটার গতি চক্ষে দেখিতেছি"।

কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, তিনি প্রত্যেক মুহূর্ত্তে সেই মুহূর্ত্তের ভরাট্ স্থানটিই কেবল চক্ষে দেখিতেছেন, তা বই, অতিবাহিত-পূর্ব্ব খালি-স্থান তিনি চক্ষে দেখিতেছেন না। যাহা চক্ষে দেখা যায় না, তাহা তিনি কিরূপে চক্ষে দেখিবেন? খালি-স্থান বস্তুশূন্য আকাশ—তাহা তিনি কিরূপে চক্ষে দেখিবেন? একথা সত্য যে, তিনি প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই একটি-না-একটি ভরাট্ স্থান দেখিতেছেন; কিন্তু শুধুকেবল ভরাট্ স্থানেই তো আর গতি হয় না; পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ত্তী স্থান খালি হইবার সঙ্গে সঙ্গে পরপরবর্ত্তী স্থান ভরাট্ হইতে থাকিলে, সেইরূপ ক্রিয়াকেই আমরা গতি নামে নির্দ্দেশ করি। তবেই হইতেছে যে, দর্শক ভরাট্ স্থানই চক্ষে দেখিতেছেন—গতি চক্ষে দেখিতেছেন না। তবে কেন তিনি বলেন যে, "আমি ঐ পাখীটার গতি দর্শন করিতেছি"। তাহা যে তিনি বলেন কেন, তাহার বিশেষ একটি কারণ আছে; তাহা এই:—

অতিবাহিত স্থান বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে খালি হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বমুহূর্ত্তে তাহা ভরাট্ ছিল। তাহা যে পূর্ব্বমুহূর্ত্তে ভরাট্ ছিল, এ কথাটি দর্শকের স্মরণে মুদ্রাঙ্কিত রহিয়াছে। দর্শক করিতেছেন দুইটি কার্য্য—দর্শন এবং স্মরণ; "অতিবাহিত স্থান পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে ভরাট্ ছিল" এটা তিনি স্মরণ করিতেছেন; "অধিকৃত স্থান বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে ভরাট্ হইল" এইটিই তিনি দর্শন করিতেছেন। করিতেছেন দর্শন এবং স্মরণ দুইই একসঙ্গে; বলিতেছেন "দর্শন করিতেছি"। তাঁহার কথার ভাবে এইরূপ বুঝাইতেছে—যেন তিনি খালি-স্থান এবং ভরাট্ স্থান দুইই একসঙ্গে দেখিতেছেন। কিন্তু সে 'দেখা'র মধ্যে চক্ষের দেখাও আছে—জ্ঞানের দেখাও আছে। গতির মধ্যে জ্ঞানের ব্যাপার যেটা রহিয়াছে, সেটা তিনি জ্ঞানেই দেখিতেছেন। সেটা কি? না শূন্য আকাশের সহিত সম্বন্ধ। পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, জ্যামিতিক রেখা এবং জ্যামিতিক সমতা—জ্ঞান,

শক্তি এবং সত্তা, তিনেরই সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে জড়িত। এখন দেখিতে পাইতেছি যে, গতি—

পালিস্থান	—	ভরাটস্থান
জ্ঞান	শক্তি	সত্তা

(ক্ষেত্র দেখ) জ্ঞান, শক্তি এবং সত্তা, তিনেরই সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে জড়িত।

এ কথা আমি অস্বীকার করি না যে, জ্যামিতিক রেখা প্রধানত একটা মনের ভাব, সুতরাং তাহা জ্ঞানপ্রধান; গতি প্রধানত একপ্রকার ভৌতিক ক্রিয়া, সুতরাং তাহা শক্তিপ্রধান। আমার মনোগত অভিপ্রায় শুদ্ধকেবল এইটি দেখানো যে, জ্যামিতিক রেখা জ্ঞানপ্রধান হইলেও জ্ঞানই যে তাহার সর্ব্বস্ব তাহা নহে—তলে তলে তাহা শক্তি এবং সত্তার সহিত অবিমোচ্য সম্বন্ধসূত্রে জড়িত; তেমনি, গতি শক্তিপ্রধান হইলেও শক্তিই যে তাহার সর্ব্বস্ব তাহা নহে—তলে-তলে তাহা সত্তা এবং জ্ঞানের সহিত অবিমোচ্য সম্বন্ধসূত্রে জড়িত।

অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, পৃথিব্যাদি বস্তু সত্তাপ্রধান হইলেও তলে-তলে তাহা শক্তি এবং জ্ঞানের সহিত অবিমোচ্য সম্বন্ধসূত্রে জড়িত।

আমরা যখন বলি যে, পৃথিবীর পরমাণুপুঞ্জ তাহার কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে জমাটবদ্ধ হইয়া গোলাকারে বিধৃত রহিয়াছে, তখন আমরা মনে মনে পৃথিবীর পরমাণু-নিচয়কে পরস্পর হইতে বিশ্লেষিত করি এবং তাহার পরে সেই বিশ্লেষিত পরমাণুগণকে গোলাকারে সংহিত করি। ইহারি নাম সঙ্কল্প-বিকল্প। সঙ্কল্প-বিকল্প আর-কিছু না—একপ্রকার মানসিক ভাঙন-গড়ন। কিন্তু এটা ভুলিলে চলিবে না যে, আমাদের মানসিক-শক্তি-চালনার বহুপূর্ব্ব হইতে পৃথিবীর পরমাণুপুঞ্জ আকর্ষণী এবং বিকর্ষণী শক্তির কার্য্যকারিতায় স্বস্ব স্থানে বিধৃত হইয়া স্বস্ব কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে।

আমাদের জন্মিবার পূর্ব্বে পৃথিবীর পরমাণুপুঞ্জ অনেকানেক যুগযুগান্তর ধরিয়া কোটিকোটি যোজন আকাশ হইতে আকাশান্তরে পরিব্যাপ্ত ছিল, ক্রমে ক্রমে ক্রমে তাহা সংহত হইতে সংহত হইয়া-হইয়া এক্ষণে (ব্রহ্মার হিসাবে সেদিন কেবল) রূপ ধারণ করিয়াছে গোলাকৃতি এবং নাম ধারণ করিয়াছে পৃথিবী। এ ভাঙন-গড়ন আমাদের মানসিক ভাঙন গড়ন নহে —এ ভাঙন-গড়ন বাস্তবিক ভাঙন-গড়ন। মানসিক ভাঙন-গড়ন যেমন মনের শক্তিস্ফূর্ত্তি—বাস্তবিক ভাঙন-গড়ন তেমনি বাস্তবিক সত্তার শক্তি-স্ফূর্ত্তি। সত্তার সহিত শক্তির সম্বন্ধ এইরূপ সুস্পষ্ট; সত্তার সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধও তদ্বৎ। শক্তির কার্য্যই হ'চ্চে সত্তাকে বিবৃত করিয়া প্রকাশ করা, এবং সত্তার প্রকাশের নামই জ্ঞান। আমরা যদি অন্তরে দৃষ্টিপাত করি, তবে দেখিতে পাই যে, সঙ্কল্প বিকল্প-রূপিণী মানসিক শক্তির পরিচালনা জ্ঞানেতেই পর্য্যবসিত হয়; আমরা যদি বাহিরে দৃষ্টিপাত করি, তবে দেখিতে পাই যে, বাস্তবিক সত্তার শক্তিস্ফূর্ত্তি জ্ঞানবান্ মনুষ্যের অভিব্যক্তিতেই পর্য্যবসিত হয়।

উপরের আলোচনা হইতে মোট কথাটি যাহা সংগ্রহ করিয়া পাওয়া যাইতেছে, তাহা এই :—

যেমন রাজা বলিলেই রাজ্য এবং প্রজাবর্গ, রাজ্য বলিলেই রাজা এবং প্রজাবর্গ, প্রজা বলিলেই রাজা এবং রাজ্য, আপনা-আপনি আসিয়া পড়ে; তেমনি সত্তা বলিলেই শক্তি এবং জ্ঞান, শক্তি বলিলেই সত্তা এবং জ্ঞান, জ্ঞান বলিলেই সত্তা এবং শক্তি আপনা-আপনি আসিয়া পড়ে। পুনশ্চ, রাজা যদি রাজ্যের সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া বনে চলিয়া যা'ন, রাজ্য যদি রাজার সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া অরাজক হইয়া উঠে, প্রজারা যদি রাজার সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া স্বস্বপ্রধান হইয়া উঠে, তাহা হইলে যেমন রাজা অরাজা হইয়া যান, রাজ্য অরাজ্য হইয়া যায়, প্রজা

অপ্রজা হইয়া পড়ে; তেমনি, জ্ঞান এবং শক্তি হইতে সম্বন্ধচ্যুত হইলে সত্তা অসত্তা হইয়া যায়; সত্তা এবং জ্ঞান হইতে সম্বন্ধচ্যুত হইলে শক্তি অশক্তি হইয়া যায়, সত্তা এবং শক্তি হইতে সম্বন্ধ চ্যুত হইলে জ্ঞান অজ্ঞান হইয়া যায়। তবে, এরূপ হইতে পারে যে, কোনো রাজ্যে রাজার, কোনো রাজ্যে প্রজাবর্গের, কোনো রাজ্যে রাজপুরুষদিগের, কোনো রাজ্যে তিনের সামঞ্জস্যের বেশী প্রাদুর্ভাব। তার সাক্ষী—বর্ত্তমান অব্দে জর্ম্মান-রাজ্যে রাজার, ফরাসী-রাজ্যে প্রজাবর্গের, ইংলণ্ডে রাজপুরুষদিগের এবং আমেরিকায় তিনের সামঞ্জস্যের অপেক্ষাকৃত বেশী প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তত্ত্বজ্ঞানের ভারতখণ্ডে উহারই একপ্রকার উল্টা-পঠের অঙ্কস্ফোট দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, শঙ্কর-শাস্ত্রে জ্ঞানকে, কাপিল-শাস্ত্রে সত্তাকে, পাতঞ্জল-শাস্ত্রে আত্মশক্তিকে, এবং গীতা-শাস্ত্রে তিনের সামঞ্জস্যকে সর্ব্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠান করানো হইয়াছে; তবে যে, আপাতদর্শী লোকের মনে সময়ে-সময়ে এইরূপ ভ্রম হয়—যেন বেদান্ত-শাস্ত্রে কেবলমাত্র জ্ঞান (শক্তি-ছাড়া এবং সত্তা-ছাড়া জ্ঞান), সাংখ্য-শাস্ত্রে কেবলমাত্র সত্তা (শক্তি-ছাড়া এবং জ্ঞান-ছাড়া সত্তা), যোগ-শাস্ত্রে কেবলমাত্র আত্মশক্তি (সত্তা-ছাড়া এবং জ্ঞান-ছাড়া আত্মশক্তি), একাকী সর্ব্বেসর্ব্বা, সেরূপ ভ্রমের কারণ আর কিছু না—অনভিজ্ঞ সমালোচকের চক্ষে প্রাধান্যমাত্রই একাধিপত্যের আকার ধারণ করে। একজন অনভিজ্ঞ লোক যদি শোনে যে, আমেরিকা-রাজ্য প্রজাতন্ত্র, তবে তাহার মনোমধ্যে সহসা এইরূপ একটা ভ্রম জন্মিতে পারে যে, তবে বুঝি আমেরিকা-রাজ্যে রাজকার্য্যের কোনোপ্রকার বিলিব্যবস্থা নাই—রাজা নাই, তার আবার রাজকার্য্য—মাথা নাই, তার আবার মাথা-ব্যথা! রাজা নাই বটে; আমেরিকা-রাজ্যের মস্তক যিনি—যাঁহার নাম প্রেসিডেণ্ট—তিনি তবে কি? তিনি রএ আকার রা, জএ আকার জা নহেন, ইহা দেখিতেই

পাওয়া যাইতেছে ; কিন্তু তথাপি রাজার যাহা কার্য্য, তাহা তাঁহাকে যোলো-আনা মাত্রায় করা চাই, রাজোচিত গুণ তাঁহাতে ষোলো-আনা মাত্রায় থাকা চাই, রাজোচিত সম্মান তাঁহাকে যোলো আনা মাত্রায় দেওয়া চাই ;—তবে আর রাজার বাকি রহিল কি ? তুমি বলিতেছ যে, শঙ্করাচার্য্যের মতে চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কিছুই না। তবে কি তিনি "কিছুই না" দলন করিবার জন্য দলবল সমভিব্যাহারে দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষময় দাপাদাপি করিয়া বেড়াইয়াছিলেন ? অতএব মুখে যিনি যাহা বলুন না কেন—সকলেই মনে মনে জানেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিলক্ষণই একটা-কিছু ! শঙ্করাচার্য্য না হয় বলিলেন অবিদ্যা, কপিলমুনি না হয় বলিলেন প্রকৃতি, পুরাণতন্ত্রকর্ত্তারা না হয় বলিলেন শক্তি, তাহাতে কি আইসে যায় ? নামে কি আইসে যায় ! শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য তো "অবিদ্যা" বলিবেনই ! তাঁহার শাস্ত্রে শুধুকেবল জ্ঞানেরই সংস্থান রহিয়াছে, তা ছাড়া প্রকৃতির সংস্থান নাই ; অথচ প্রকৃতি ব্যতিরেকে কোনো কাজই চলে না ;—জ্ঞানের কাজও চলে না। কিন্তু প্রকৃতিকে তিনি আপন শাস্ত্র হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়াছেন—তাহাকে পাওয়া যাইবে কিরূপে ? তিনি তাহার উপায় করিলেন এই যে, প্রকৃতিকে অজ্ঞান বা অবিদ্যা নামে অবগুণ্ঠিত করিয়া জ্ঞানেরই উল্টাপিঠ বলিয়া গ্রহণ করা যা'ক্। অবিদ্যা'র গোড়া'তে অ রহিয়াছে, প্রকৃতির গোড়া'তে প্র রহিয়াছে। অ কিনা ন—কিছুই না ; প্র কিনা প্রধান—সর্ব্বপ্রধান বস্তু। নামে, এইরূপ, দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। কিন্তু কাজে শঙ্কের-শাস্ত্রের অবিদ্যাও যা, সাংখ্য-শাস্ত্রের প্রকৃতিও তা, তন্ত্র-শাস্ত্রের শক্তিও তা—একই। "কাজে" শব্দের অর্থ এখানে তত্ত্বজ্ঞানের কাজে। ভজন-সাধনের কাজে তিনের মধ্যে বিশিষ্টরকমের প্রভেদ আছে, এ কথা আমি খুবই মানি ; কিন্তু এ প্রভেদ বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রসঙ্গ বহির্ভূত। প্রকৃত প্রস্তাব হইতে একটু

যেন দূরে সরিয়া পড়া হইয়াছে, অতএব এখানে আর কালবিলম্ব না করিয়া গন্তব্যপথে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাক্।

যদিও সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান পরস্পরের সহিত অবিমোচ্য সম্বন্ধসূত্রে জড়িত, তথাপি এরূপ হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে যে, কোনো বস্তু দেখিলে প্রধানত সত্তা চক্ষে পড়ে, কোনো বস্তু দেখিলে প্রধানত শক্তি চক্ষে পড়ে, কোনো বস্তু দেখিলে প্রধানত জ্ঞান চক্ষে পড়ে। অন্তঃকরণ-রাজ্যে প্রাণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সত্তা'র ভাব প্রধানত চক্ষে পড়ে; তার সাক্ষী—লোকে বলে "বেঁচে-বর্ত্তে থাকা"। বর্ত্তিয়া থাকা (বর্ত্তমান থাকা) সত্তা'রই ধর্ম্ম। মনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে শক্তির ভাব প্রধানত চক্ষে পড়ে; তার সাক্ষী—লোকে বলে "মনের জোর"। বুদ্ধির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে জ্ঞানের ভাব প্রধানত চক্ষে পড়ে; তার সাক্ষী—লোকে বলে "বুদ্ধির পরামর্শ"। অন্তরিন্দ্রিয়-রাজ্যে এ যাহা দেখা গেল—বহিরিন্দ্রিয় রাজ্যে দৃষ্টিপাত করিলে তাহারই আর-এক পিঠ স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা দেখিতে হইলে স্পর্শেন্দ্রিয়ের অর্থের পরিধিকে আভিধানিক সংজ্ঞার সীমা ছাড়াইয়া আর একটু বেশীদূর বিস্তৃত করা আবশ্যক। আমরা দেখিতে পাই যে, হস্তের স্পর্শ যেমন হস্তের সহিত অব্যবহিতভাবে (অর্থাৎ মাখামাখি-ভাবে) গাত্রে অনুভব হয়, রসের আস্বাদ তেমনি রসের সহিত অব্যবহিত-ভাবে রসনায় অনুভূত হয়; এবং পরিমলের ঘ্রাণ তেমনি পরিমলের সহিত অব্যবহিত-ভাবে নাসিকায় অনুভূত হয়। অতএব ইন্দ্রিয়ের বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার, এই দুয়ের মাখামাখি-ভাবকে যদি স্পর্শের বৈশেষিক লক্ষণ বলিয়া ধরা যায়, তবে ত্বক, রসনা এবং নাসিকা, তিনকেই স্পর্শেন্দ্রিয়ের কোঠায় নিক্ষেপ করা যাইতে পারে। এখানে তাহাই করা হইল। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, স্পর্শেন্দ্রিয়ে প্রাণ এবং সত্তার ভাব প্রধানত স্ফুরিত হয়; তার সাক্ষী—সুস্নিগ্ধ সমীরণের সংস্পর্শে,

সুস্বাদু অন্নপানীয়ের আস্বাদনে, সুরভি পুষ্পের আঘ্রাণে লোকে বলে "প্রাণ ঠাণ্ডা হল"। আর, সেইরূপ প্রাণ ঠাণ্ডা হওয়া গতিকে শরীরে একপ্রকার স্বাস্থ্য অনুভব হয়। স্বাস্থ্য-শব্দের অর্থ হ'চ্চে আপনাতে আপন স্থিতি ;—তাহা সত্তারই ধর্ম্ম। শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রধানত মন এবং শক্তির ভাব স্ফুরিত হয়; তার সাক্ষী—"শোনো" এবং "মন দেও", এ দুয়ের মধ্যে অত্যল্পই প্রভেদ। তা ছাড়া, যুদ্ধক্ষেত্রে সিংহনাদ, ভেরীনির্ঘোষ, হল্লারব প্রভৃতি শব্দ স্বপক্ষদলের বাহুতে শক্তি সঞ্চার করে, এবং বিপক্ষদলের বাহু হইতে শক্তি হরণ করে। চক্ষুরিন্দ্রিয়ে প্রধানত বুদ্ধি এবং জ্ঞানের ভাব স্ফুরিত হয়; তার সাক্ষী—যদি বলা যায় "দেক্‌চ না, এটা কেবল একটা স্তোকবাক্য"; তবে "দেক্‌চ না" কথাটির অর্থ "বুঝতে পারচ না" ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। মন এবং বুদ্ধির মধ্যে প্রভেদ যে, কিরূপ, তাহা বহু-পূর্ব্বে বলিয়া চুকিয়াছি; শ্রবণেন্দ্রিয় এবং দর্শনেন্দ্রিয়ের মধ্যে তাহারই অবিকল প্রতিরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। মন যেমন ভাবের-অনুবন্ধিতা (association of ideas) -সূত্রে বিশেষ বিশেষ হইতে বিশেষ বিশেষে প্রধাবিত হয়, শ্রবণেন্দ্রিয় সেইরূপ ক হইতে খ-এ, খ হইতে গ-এ, গ হইতে ঘ-এ—এইরূপ ব্যষ্টি হইতে ব্যষ্টিতে প্রধাবিত হয়। পক্ষান্তরে, বুদ্ধি যেমন বিবিধপ্রকার বিশেষ বিশেষ ব্যাপারকে সামান্যের অন্তর্ভূত করিয়া সামান্য এবং বিশেষ দুইকেই একযোগে অবধারণ করে, দর্শনেন্দ্রিয় সেইরূপ সমষ্টি ব্যষ্টি—বন এবং বনস্থ বৃক্ষরাজি—দুইই একযোগে উপলব্ধি করে। সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, দর্শনেন্দ্রিয় বুদ্ধিপ্রধান, মনঃ শ্রবনেন্দ্রিয় প্রধান, স্পর্শেন্দ্রিয় প্রাণ-প্রধান, আর, তাহা হইতেই আসিতেছে এই যে, দর্শনেন্দ্রিয় জ্ঞানপ্রধান, শ্রবণেন্দ্রিয় শক্তিপ্রধান, স্পর্শেন্দ্রিয় সত্তাপ্রধান।

উপরে যাহা সংক্ষেপে—একপ্রকার সাঁটেসোঁটে—বলিলাম, তাহার সমস্ত বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুশীলন করিতে হইলে তাহা দুই এক ছত্রের

কর্ম্ম নহে ; তাহার আলোচনায় অধ্যায়কে অধ্যায় পার হইয়া যাইতে থাকিলেও—যতগুলা অধ্যায় ছাড়াইয়া আসা যাইবে, ততগুলা ভাবী অধ্যায়ের খোরাক জমা হইতে থাকিবে—কিছুতেই আর জের মিটিবে না। মাঝপথে কালবিলম্ব করা শ্রেয়স্কর নহে, তাহা আমি গোড়াতেই বলিয়াছি - বলিয়া-কহিয়া তবে এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এক্ষণে কেবল একটি বিষয় বলিবার আছে, সেইটি হইয়া চুকিলেই পাথেয়-সংগ্রহের দায় হইতে এ-যাত্রা আমি অব্যাহতি পাইতে পারি; সেটি হ'চ্চে সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান, তিনের সামঞ্জস্য।

আমি যেরূপ ব্যক্তি এবং আমার যেরূপ শক্তি তাহা ছাড়াইয়া আমার জ্ঞানের আদর্শ এত উচ্চ হইয়া উঠে যে, কোনো গতিকেই আমি তাহা হাত বাড়াইয়া নাগাল পাইতে পারি না, এক কথায়—জ্ঞান যদি সত্তা এবং শক্তিকে, অথবা যাহা একই কথা—প্রাণ এবং মনকে, অনেক-হাত নীচে ফেলিয়া মহোচ্চ সত্যের শিখরে আরোহণ করে, তাহা হইলে আমার জ্ঞানের সেই উচ্চ আদর্শ আমার মধ্যে একপ্রকার উল্টা ফল উৎপাদন করে—আপন মহোজ্জ্বল আলোকে আমার অপদার্থতা এবং অক্ষমতা ফুটাইয়া তুলিয়া আমার মনোমধ্যে অশান্তি এবং বিষাদের উৎস উন্মুক্ত করিয়া দ্যায়। কিন্তু তাহাও স্বীকার—তথাপি জ্ঞানের আলোক আমার চক্ষের সম্মুখ হইতে একটুও সরাইয়া রাখা আমার প্রার্থনীয় হইতে পারে না। কেন না, তাহা করিলে আপাতত একপ্রকার মনকে-প্রোবোধ দেওয়া রকমের শান্তি লাভ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে উন্নতির দ্বারে কপাট পড়িয়া গিয়া তলে তলে অধোগতির সোপান প্রস্তুত হইতে থাকে। এরূপ স্থলে সৎপরামর্শ হ'চ্চে—নীচের নীচের ধাপ মাড়াইয়া জ্ঞানের উচ্চ শিখরে শক্তিকে এবং সত্তাকে—মনকে এবং প্রাণকে টানিয়া তোলা।

মনে কর, একজন চাসা'র বড়ই ইচ্ছা গিয়াছে যে, সে জমিদার হয়। সে আপনার লাঙলের কাজে জলাঞ্জলি দিয়া অষ্টপ্রহর কেবল জমিদারী সেরেস্তায় আনাগোনা করে, আর, সেই গতিকে জমীদারী কার্য্যের প্রণালী-পদ্ধতি-বিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে মন্দ না। কিন্তু হইলে হইবে কি—এক-কাঠা জমি ক্রয় করে, সে সঙ্গতি তাহার নাই। যৎকিঞ্চিৎ যাহা তাহার ধান্যের পুঁজি ছিল—কৃষিকার্য্যে অনবধানতা-গতিকে সে তাহা অনেকদিন হইল খোয়াইয়া বসিয়া আছে। এ অবস্থায় তাহার কর্ত্তব্য হ'চ্চে—প্রথমত জমিদারী সেরেস্তায় ঘুরিয়া বেড়ানো বন্ধ করা। দ্বিতীয়ত কৃষিকার্য্যে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া ধান্যের সংস্থান করা। তৃতীয়ত ধান্যের মহাজনদিগকে আদশ করিয়া অল্প-স্বল্প বাণিজ্য-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়া। চতুর্থত যখন সে দেখিবে হাতে কিছু টাকা জমিয়াছে, তখন দুই এক-বিঘা জমি ক্রয় করা! চাসাটির আদর্শ খুব উচ্চ—এটা ভাল বই মন্দ নহে; কিন্তু তা বলিয়া এটা ভুলিলে চলিবে না যে, নীচের নীচের ধাপ মাড়াইয়া আপনার শক্তি সামর্থ্যকে সেই উচ্চ আদর্শের কাছ বরাবর টানিয়া তুলিতে হইবে। এটা কেবল একটা উপমা মাত্র। প্রকৃত কথা এই যে, জ্ঞানের সহিত শক্তি এবং সত্তার সামঞ্জস্য ব্যতিরেকে মনুষ্য মনের অশান্তি এবং বিষাদ কিছুতেই ঘুচিবার নহে। জ্ঞান, শক্তি এবং সত্তা, তিনের সামঞ্জস্যই আনন্দের প্রস্রবণ। প্রথমে সত্তা এবং শক্তি হইতে জ্ঞানকে কতকমাত্রা বিশ্লেষিত করা আবশ্যক; কেন না, তাহা না করিলে সদসদ্বিবেক জন্মিতে পারে না। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, পঠদ্দশায় বালক ব্যাকরণ এবং গণিত প্রভৃতি বিদ্যা যাহা শিক্ষা করে, তাহা নিছক জ্ঞানেরই ব্যাপার, তাহার সহিত কাজের কিংবা বাস্তবিক পদার্থের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কোনো সংশ্রব নাই। ইহাতে—বালকের বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়; কাহাকে বলে কর্ত্তা, কাহাকে বলে কর্ম্ম, কাহাকে বলে ক্রিয়া, কাহাকে বলে রেখা, কাহাকে

বলে ফলক, কাহাকে বলে পিণ্ড ইত্যাদি বিষয়ে তাহার জ্ঞান জন্মে। প্রথমে জ্ঞানের এইরূপ বিশ্লেষণ আবশ্যক হয় বটে—কিন্তু চিরকালই যদি বালকের ব্যাকরণজ্ঞান শক্তি এবং সত্তা হইতে বিশ্লেষিত থাকে—বালক যদি যথা কালে ব্যাকরণে সুপণ্ডিত হইয়াও একছত্র চিঠি লিখিতে হইলে গলদ্-ঘর্ম্ম কলেবর হয়, তবে তাহার সে জ্ঞান থাকা না থাকা সমান। পুঁথিগত জ্ঞানের সঙ্গে সত্তা এবং শক্তির যোগ হইলে, তবেই তাহা কাজের জ্ঞান হইয়া উঠে। প্রথম-বয়সে জ্ঞানকে সত্তা এবং শক্তি হইতে বিশ্লেষিত করা যেমন আবশ্যক—উত্তর-বয়সে বিশ্লেষিত জ্ঞানকে সত্তা এবং শক্তির সহিত যোজনা করা তেমনিই আবশ্যক। কিন্তু একটি বিষয় সর্ব্বকালেই আবশ্যক; সে বিষয়টি হ'চ্চে—বিশ্লেষণ এবং সংযোজনের মধ্যে সামঞ্জস্যরক্ষা! প্রথম-বয়সেও জ্ঞানকে মাত্রাতীত বেশী বিশ্লেষিত করা বিধেয় নহে আর, তাহা বিধেয় নহে বলিয়াই এক্ষণে পাশ্চত্যপ্রদেশের অভিভাবক-মহলে কিণ্ডারগার্টেন (Kindergarten) নামক নূতন শিক্ষা-প্রণালীর এতাধিক আন্দোলন চলিতেছে। তেমনি আবার দ্বিতীয়-বয়সেও জ্ঞানকে কার্য্যের সহিত অতিমাত্র বিমিশ্রিত করিয়া জ্ঞানের বিশুদ্ধি সমূলে নষ্ট করা বিধেয় নহে; আর, তাহা বিধেয় নহে বলিয়াই, পাশ্চাত্য পণ্ডিত-মহলে বৈশেষিক (specialist)দিগের মাত্রাতীত দলবৃদ্ধির প্রতিবিধানের জন্য সর্ব্বসমন্বয়ের (synthetic philosophyর) একটা প্রকৃষ্ট পথ আবিষ্কার করিবার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। প্রকৃত কথা এই যে, শান্তি এবং আনন্দ লাভ করিতে হইলে, সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান—তিনের বিশ্লেষণ এবং সংযোজনের সামঞ্জস্য ব্যতিরেকে তাহা কোনো প্রকারেই সম্ভাবনীয় নহে। এখন কথা হ'চ্চে এই যে, সামঞ্জস্য হয় কিসে? বিশ্লেষণই বা কতমাত্রা হইলে ঠিক হয়—সংযোজনই বা কত মাত্রা হইলে ঠিক হয়? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এক হিসাবে অতীব সহজ,

আর এক হিসাবে অতীব কঠিন। তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর যে, মধ্যাহ্ণভোজনের সময় কি পরিমাণ অন্ন ভক্ষণ এবং কি পরিমাণ জল পান করিলে ঠিক হয়, তবে তাহার সহজ উত্তর এই যে, "তোমার ক্ষুধা তৃষ্ণা যেরূপ বলিবে—তুমি সেইরূপ করিবে।" কিন্তু সে কথায় সন্তুষ্ট না হইয়া তুমি যদি বলো "আমি প্রত্যহ কয়সের অন্ন ভক্ষণ করিব এবং কয়সের জল পান করিব, তাহার ঠিক্‌ঠাক্‌ পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া দাও"—তবে সেটা বড়ই কঠিন সমস্যা।

ক্ষুধাতৃষ্ণা যেমন বলিয়া দ্যায়—এই-পরিমাণ অন্ন এবং এই-পরিমাণ জল সেবনীয়, আনন্দ তেমনি বলিয়া দ্যায়—সত্তা-শক্তি-জ্ঞানের এই-পরিমাণ সংযোজন এই-পরিমাণ বিশ্লেষণ এবং এই-পরিমান সংযোজন প্রার্থনীয়। ফল কথা এই যে, সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান একীভূত হইয়া, মৃত সত্তায়, অথবা ফাকা জ্ঞানে, অথবা অন্ধ শক্তিতে পরিণত হইলেও আনন্দ হয় না, আর, পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যূথভ্রষ্ট—মৃগের ন্যায় তিন বীর তিন পথে প্রধাবিত হইলেও আনন্দ হয় না। সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞানের যে-মাত্রা সংযোজন বিশ্লেষণে আনন্দ হয়, তাহারই নাম সামঞ্জস্য।

সৌর জগতে আকর্ষণ এবং বিকর্ষণের সামঞ্জস্য কেমন চমৎকার! সূর্য্যের বন্ধনের টানে পড়িয়া সৌরজগৎ যদি সূর্য্যের সহিত একীভূত হইয়া যায়, তাহা হইলেও যেমন; আর, সূর্য্যের নিকট হইতে তাড়া খাইয়া সৌরজগৎ যদি দড়ি ছিঁড়িয়া পলায়ন করে, তাহা হইলেও তেমনি; দুয়েতেই সৌরজগতের প্রলয়দশা উপস্থিত হয়। কতমাত্রা কাল সূর্য্যের অভিমুখী হইতে হইবে এবং কত মাত্রা কাল সূর্য্য হইতে পরাঙ্মুখী হইবে—পৃথিবীকে তাহা বলিয়া দিতে হয় না;—পৃথিবী তাহা ভালরূপ জানে;—পৃথিবীর তালবোধ আছে; তালবোধ থাকিবারই কথা—কেন না, সর্ব্বত্র নাট্যের কর্ত্রী ঐশী-শক্তি বিনিদ্রনয়নে জাগিতেছেন।

এবারকার আলোচনাপথের মধ্যদিয়া আমরা ত্রিক হইতে চতুষ্কে উপনীত হইলাম। ত্রিক কি? না, সত্তা-শক্তি-জ্ঞান। চতুষ্ক কি? না সত্তা-শক্তি-জ্ঞান-আনন্দ। আনন্দ হয় কিসে? সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞানের সামঞ্জস্যে। মাঝ পথের কার্য্য এক-প্রকার হইয়া চুকিল অতঃপর পোঁট্‌লা পুঁট্‌লি বাঁধিয়া সত্যরাজ্যের অভিমুখে প্রয়াণের উদ্যোগ করা যাইবে।

আছি এবং আছে।

এই সময়ে পথের কতকগুলি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করা আবশ্যক বিবেচনায় বিগত দুইবারে সত্তা, শক্তি, জ্ঞান এবং আনন্দের মধ্যে কিরূপ ঘনিষ্ঠ একাত্মভাব, তাহা বিধিমতে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া ঐ তিনটি প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাথেয়-সম্বলের সহিত পোটরী বাঁধিয়া লওয়া হইয়াছিল।

এক্ষণে প্রয়াণ-পথের কোন্ স্থান হইতে কোন্ স্থানে আসিয়াছি এবং কতদূর অবধি গিয়া কোন্ স্থানে তাঁবু গাড়িতে হইবে, তাহা একবার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা আবশ্যক।

পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে যে, দ্রব্যাদি-সংগ্রহের জন্য মাঝপথে থামিয়া দাঁড়াইবার পূর্ব্বে আমরা আত্মজ্ঞানের দুই বিভিন্ন মূর্ত্তি পৃথক্ পৃথক্-রূপে পর্য্যালোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। সে দুইমূর্ত্তি হচ্চে—ভাব-মূর্ত্তি এবং সত্য মূর্ত্তি। কিন্তু সঙ্কল্পিত পর্য্যালোচনা কার্য্যের অর্দ্ধেকটা শেষ হইতে-না-হইতেই মাঝ-পথের ব্যাপারে আটক পড়িয়া গেলাম। আত্মজ্ঞানের ভাব মূর্ত্তি কিরূপ, তাহার আলোচনা আমরা যথাসাধ্য করিয়া চুকিয়াছি: তা বই, তাহার সত্য-মূর্ত্তি কিরূপ, সে সম্বন্ধে এখনো পর্য্যন্ত একটি কথারও উল্লেখ করি নাই। আমরা দেখাইয়াছি যে, আত্মশক্তি খাটাইয়া আত্ম-জ্ঞানের ভাব-মূর্ত্তি উদ্ভাবন করা যাইতে পারে; আর, তাহার সাধন পদ্ধতি

হ'চ্চে যোগশাস্ত্রের উপদেশানুযায়ী ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি। এ বিষয়ে যোগশাস্ত্রের প্রথম মন্তব্য এই যে, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"। তুমি যেরূপ বিষয়ের প্রয়াসী, তোমার সিদ্ধিও সেইরূপ হইবে;—কিন্তু অমনি হইবে না, তাহার জন্য সাধন করা চাই। সাধন যেরূপে করিতে হইবে, তাহাই তোমাকে বলিয়া দেওয়া হইল।

দ্বিতীয় মন্তব্য এই যে, নীচের নীচের ভূমি মাড়াইয়া উচ্চোচ্চ ভূমিতে সংযম প্রয়োগ করা (অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি প্রয়োগ করা) কর্ত্তব্য। ভূমি-বিভাগ কিরূপ, তাহা যদি জিজ্ঞাসা কর তবে তাহা মোটামুটি এইরূপ;—

প্রথম ভূমি পৃথিবী-তত্ত্ব; দ্বিতীয় জল-তত্ত্ব; তৃতীয় অগ্নি-তত্ত্ব; চতুর্থ-বায়ু-তত্ত্বও পঞ্চম আকাশ-তত্ত্ব; ষষ্ঠ মনস্তত্ত্ব; সপ্তম অহঙ্কার-তত্ত্ব; অষ্টম বুদ্ধি-তত্ত্ব; নবম প্রকৃতি। যোগশাস্ত্রের উপদেশ এই যে, পৃথিবী-তত্ত্ব হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া নীচের নীচের ভূমি একে একে মাড়াইয়া উপরের উপরের ভূমিতে আত্মশক্তি বা সংযম প্রয়োগ কর; অর্থাৎ, যে পথ দিয়া প্রকৃতির ক্রমবিকাশ হইয়াছে, সেই পথ দিয়া প্রকৃতি ভেদ করিয়া উচ্চে ওঠো; উচ্চে উঠিয়া পুরুষে—স্বরূপে—আত্মাতে—স্থিতি কর।

নীচের নীচের ভূমি মাড়াইয়া উপরের উপরের ভূমিতে উত্থান করিতে হইবে—এটা সাধারণ ব্যবস্থা; তা ছাড়া, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। কোনো ব্যক্তির পাঠ আরম্ভ করা আবশ্যক ক-খ হইতে; কাহারো বা—ব্যাকরণ হইতে; কাহারো বা—সাহিত্য হইতে। যাহার যোগ্যতার যতটা দৌড়, সেই অনুসারে তাহার সাধনের গোড়া'র পইটা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু কে তাহার নির্দ্দেশ করিয়া দিবে? যে ব্যক্তি যাহা মনে করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতেই তাহার যোগ্যতার দৌড় প্রকাশ পায়; এবং তদনুসারে সাধক

আপনিই আপনার সাধনের পঁইটা নির্দ্ধারণ করিতে পারেন ; তাহাই তিনি করুন্ ; তাহা হইলেই তিনি আন্তরিক ইচ্ছার সহিত সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন ; আর, তাহা হইলেই সাধন আশু-ফলপ্রদ হইবে। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, সঙ্গীতের দিকে যাহার স্বভাবতই মনের দৌড়, সে সঙ্গীতের চর্চ্চায় নিযুক্ত হইলে তাহার যেরূপ সহজে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে, অপরের পক্ষে তাহা সম্ভাবনীয় নহে। এইজন্য যোগশাস্ত্রের প্রধান একটি মন্তব্য কথা এই যে, যেরূপ লক্ষ-বস্তু তোমার মনের ইচ্ছার অনুযায়ী, তাহাতেই প্রথমে তুমি আত্মশক্তি বা সংযম প্রয়োগ কর—প্রয়োগ করিয়া সেই অভিষ্ট বিষয়টি আপনার সম্যক্ বশে আনয়ন কর ; তাহার পরে ক্রমশ নীচের নীচের বিষয় বশীভূত করিয়া উচ্চ উচ্চ বিষয়ের সাধনে প্রবৃত্ত হও। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সাধনের লক্ষ্যবস্তু তত নয়—সাধনের পদ্ধতিই যত যোগশাস্ত্রের উপদেষ্টব্য বিষয়। যোগশাস্ত্রের একটি স্থানে কেবল সাধনের লক্ষ্যবস্তু সুনির্দ্দিষ্ট। কোন্ স্থানে ? না, যেখানে বলিতেছেন—"ঈশ্বর প্রনিধানাদ্বা।" এই স্থানটিতেই আত্মশক্তির পবিবর্ত্তে ঐশী শক্তির পরাকাষ্ঠা বলবত্তা এবং ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বরে কর্ম্ম-সমর্পণের বিধেয়তা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এই স্থানটির কথা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা আবশ্যক ; এবং তাহা বুঝিয়া দেখিতে হইলে আমাদের জ্ঞানরাজ্যে আত্মকর্ত্তৃত্বেরই বা কার্য্যকারিতা কিরূপ, ঐশী শক্তিরই বা কার্য্যকারিতা কিরূপ, তাহার প্রতি রীতিমত অনুসন্ধান প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। তাহারই এক্ষণে চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

আত্মকর্ত্তৃত্বের মূলে ঐশী শক্তির কার্য্যকারিতা কিরূপ তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হইতে হইলে সাধনের কথা ছাড়িয়া দিয়া সহজে আমরা আত্মাকে কিরূপে উপলব্ধি করি, তাহারই প্রতি সর্ব্বপ্রথমে প্রণিধান করা কর্ত্তব্য।

আপামর-সাধারণ সকল ব্যক্তিই "আমি আছি" এইকথাটি খুবই স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করে; হৃদয়ঙ্গম করিয়াও শুদ্ধকেবল সেই কথাটির বলে আপনার ধ্রুব অস্তিত্ব-বিষয়ে নিঃসংশয় হইতে পারে না। অতএব, সহজ জ্ঞানের এই যে একটি কথা—"আমি আছি"—এ কথাটির বলবত্তার দৌড় কতদূর পর্য্যন্ত, তাহা একবার তোলাপাড়া করিয়া দেখা নিতান্তই আবশ্যক।

"আছি" এবং "আছে" এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ কি? "আছি" এবং 'আছে"র মধ্যে ব্যকরণঘটিত উত্তমপুরুষ এবং প্রথমপুরুষের প্রভেদ তো আছেই—কিন্তু সে প্রভেদ তত্ত্বজিজ্ঞাসুর বড় একটা গায়ে লাগে না; তা ছাড়া দুয়ের মধ্যে নিগূঢ়-রকমের একটি প্রভেদ আছে—সেইটি এখানে দ্রষ্টব্য; তাহা এই :—

আমি যদি বলি যে, "হিমালয়-পর্ব্বত আছে," তবে শ্রোতা বলিতে পারে যে, "তাহা যে আছে, তাহার প্রমাণ কি?" পক্ষান্তরে, আমি যদি বলি যে, "আমি আছি," তবে আমার সেই কথাটিই আমার অস্তিত্বের প্রমাণ; কেন না আমি না থাকিলে "আমি আছি" এ কথাটি আমার মুখ দিয়া বাহির হইতে পারিত না। "আমি আছি" এ কথাটি আমি যদি মুখে না-ও উচ্চারণ করি—শুধু যদি কেবল মনে মনে বলি যে,"আমি আছি," তবে তাহাই আমার অস্তিত্বের যথেষ্ট প্রমাণ; কেন না আমি না থাকিলে "আমি আছি" এ কথাটি আমার মনেও আসিতে পারিত না। তা শুধু না—"আমি আছি" না বলিয়া আমি যদি মনে মনে বলি যে, "আমি নাই" অথবা "আমি আছি কি নাই তাহা আমি জানি না," তবে তাহাতেও প্রকারান্তরে বলা হয় যে,"আমি আছি"; কেন না আমি যদি না থাকিতাম, তবে 'আমি নাই' এ কথাও আমার মনে আসিতে পারিত না, অথবা আমি আছি কি নাই তাহা জানি না, একথাও আমার মনে আসিতে পারিত না। এই স্থানটিতে দেকর্ত্তা-(Des-cartes) নামক ফরাসীস্ তত্ত্ববিদের প্রসিদ্ধ মহাবাক্যটি

মনে পড়ে ; কি ? না, Cogito ergo sum—"আমি চিন্তা করিতেছি অতএব আমি আছি।" কথাটি খুব ঠিক্ ; কিন্তু উহার বলবত্তার দৌড় যে 'চিন্তা করিতেছি'র মধ্যেই আবদ্ধ, দেকর্ত্তা তাহা বুঝিয়াও বুঝেন নাই ; তাহা বুঝিলে তিনি 'আছি' এবং 'আছে'র মধ্যে একটা অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর সন্নিবেশিত করিবার বৃথা-চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতেন না।

প্রকৃত কথা যাহা, তাহা এই :-

যখনই আমার মনোমধ্যে যে-কোনো চিন্তা উপস্থিত হইতেছে, তখনই সেই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে আমি-আছি' এই কথাটি আমার জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছে ; কিন্তু সে যে আমি আছি, তাহা তখন আমি আছি ; আর, সেই তখন-'আমি-আছি'র প্রমাণ তখনকার সেই চিন্তা। পক্ষান্তরে, আমি গতকল্য যাহা চিন্তা করিয়াছিলাম, সে চিন্তা সাক্ষাৎসম্বন্ধে এখন-আমি-আছি'র প্রমাণ নহে। আমার এখনকার চিন্তাই এখন আমি আছি'র প্রমাণ। দে-কর্ত্তার মতে "আছি"রই কেবল প্রমাণ আছে—'আছে'র কোনো প্রমাণ নাই। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, আছে'র, যদি কোনো প্রমাণ না থাকিত, তবে "আছে" এরূপ একটা কথা আমাদের বুদ্ধিতে আমল পাইতেই পারিত না। আছি'র যেমন প্রমাণ হাতে-হাতে—আছে'রও তেমনি ; প্রভেদ কেবল এই যে, আছি'র প্রমাণ অপেক্ষাকৃত নিরবচ্ছিন্ন, আছে'র প্রমাণ অপেক্ষাকৃত ব্যবচ্ছিন্ন। আমি এখন লিখিতব্য বিষয় চিন্তা করিতেছি, আর, সেই সঙ্গে এই কথাটি জ্ঞানে উপলব্ধি করিতেছি যে, এখন আমি আছি ; আমার এখনকার চিন্তা আমার এখনকার অস্তিত্বের এ যেমন প্রমাণ, তেমনি, আমার সম্মুখে আমি ঐ যে উদ্যান দেখিতেছি, ঐ উদ্যানের রশ্মি-প্রতিক্ষেপণী ক্রিয়া (অর্থাৎ ঐ উদ্যান সূর্য্যরশ্মি প্রতিহত করিয়া আমার চক্ষু-গোলকে যে বিচিত্র বর্ণ ক্ষেপণ করিতেছে—সেই প্রতিক্ষেপণী ক্রিয়া) উদ্যানের

অস্তিত্বের প্রমাণ। প্রভেদ কেবল এই যে, যখন আমি ঘরে ঢুকিয়া জানালা বন্ধ করিব, তখন উদ্যান আমার নিকটে অদৃশ্য হইয়া যাইবে, আর, সেই সঙ্গে "উদ্যান আছে" এ কথাটির সাক্ষাৎ প্রমাণ আমার সম্মুখ হইতে সরিয়া পলাইবে। পক্ষান্তরে, আমার জাগরিত অবস্থায় মুহূর্ত্ত-পরম্পরায় আমার মনোমধ্যে একটার পর আরেকটা চিন্তা উদিত হইতেছে এবং উদিত হইতে থাকিবেও; আর যখনই যে চিন্তা উদিত হইতেছে, তখনই তাহা "এখন আমি আছি" এই কথাটির প্রমাণ যোগাইতেছে। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, "এখন আমি চিন্তা করিতেছি, অতএব এখন আমি আছি" এবং "এখন উদ্যান আমার দৃষ্টি আক্রমণ করিতেছে, অতএব এখন উদ্যান আছে," এই দুই কথার মাঝখানকার অতএবের মূল্য নিক্তির ওজনে সমান। তবে কি না, চিন্তা নিরবচ্ছেদে একটার পর একটা মুহুর্মুহু মনোমধ্যে উপস্থিত হইতেছে; উদ্যান কখনো বা আমার দৃষ্টিক্ষেত্রে উপস্থিত, কখনো বা অনুপস্থিত। যদি আমি অষ্টপ্রহর অনিমেষ-চক্ষে উদ্যানের প্রতি চাহিয়া থাকি, তাহা হইলে—আমি আছি এবং উদ্যান আছে—দুইই এক সঙ্গে আমার মনকে ক্রমাগতই আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিবে। উদ্যানটি যখন মেঘাবৃত অমানিশার প্রগাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়, তখন তাহার অস্তিত্বের সাক্ষাৎ প্রমাণ সেই সঙ্গে তিরোহিত হয়—ইহা কাহারো অবিদিত নাই; ইহাও তেমনি কাহারো অবিদিত নাই যে, সুষুপ্তির মন্ত্রগুণে যখন আমার জ্ঞানের ক্রিয়াস্ফূর্ত্তি একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়, তখন সেই সঙ্গে আমার অস্তিত্বের সাক্ষাৎ প্রমাণ অন্তর্ধান করে। সুষুপ্তির অবস্থায় যখন আমার মনের কপাট বন্ধ থাকে, তখন "আমি আছি" বা "আমি নাই" বা "আমি আছি কি নাই, তাহা জানি না" এই তিন রকমের তিন কথার কোনোটিই আমার মনে প্রবেশ পাইতে পারে না। আমার সে অবস্থায় "আমি আছি" ঘুচিয়া যায়—অথচ আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া দর্শক

বলে যে, "ইনি আছেন—কিন্তু নিদ্রায় নিমগ্ন।" ইনি যে আছেন, তাহার প্রমাণ কি ? "ইনি আছেন" এ কথা তুমি বলিতেছ—আমি তো বলিতেছি না। আমার অস্তিত্বের প্রমাণ তোমার কথায় হইতে পারে না। তোমার মুখের কথা বা মনের ভাবনা বা জ্ঞানের ক্রিয়া-স্ফূর্ত্তি তোমার অস্তিত্বেরই প্রমাণ ; তা বই, তাহা আমার অস্তিত্বের প্রমাণ নহে। তবেই হইতেছে যে, আছে'র সাক্ষাৎ প্রমাণ যেমন সময়ে সময়ে জাগিয়া উঠে এবং সময়ে সময়ে অন্তর্হিত হয়, আছির প্রমাণও সেইরূপ পরিবর্ত্তনশীল। অতএব, একথা যদি সত্য হয় যে, পরিবর্ত্তনশীল ঘটনাবলীর মূলে অপরিবর্ত্তনীয় একটা-কিছু থাকা চাই, তবে আছি এবং আছে দুয়েরই মূলে তাহা থাকিবার কথা ; এইজন্য দুয়ের সন্ধিস্থানেই তাহা অন্বেষিতব্য।

উপরে যে ভাবের আছি এবং আছে'র প্রমাণ দেখানো হইল, তাহা কেবল এখন আছি এবং এখন আছে মাত্র ; সুতরাং তাহা কালদ্বারা পরিচ্ছিন্ন। এতদ্ব্যতীত ঐ দুই পরিচ্ছিন্ন আছি এবং আছে'র সন্ধিস্থানে সমস্ত লইয়া যে এক আছি বিরাজমান, তাহাই সত্যজগতের প্রবেশদ্বার। আগামী বারে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

আছে এবং আছি'র অধিকারভেদ।

বিগত বারের প্রবন্ধের উপসংহার করিয়াছিলাম এই বলিয়া :—

"উপরে যে-ভাবের আছি এবং আছে'র প্রমাণ দেখানো হইল, তাহা কেবল এখন আছি এবং এখন আছে মাত্র ; সুতরাং তাহা কালদ্বারা পরিচ্ছিন্ন। এতদ্ব্যতীত ঐ দুই পরিচ্ছিন্ন আছি এবং আছে'র সন্ধিস্থানে সমস্ত লইয়া যে এক আছি বিরাজমান, তাহাই সত্য-জগতের প্রবেশদ্বার।"

এখন দ্রষ্টব্য এই যে, সমস্তের আদি-অন্ত-মধ্য লইয়া সেই-যে সর্ব্বমূলাধার আমি আছি, তিনি সাধনের পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধ—সকল বিষয়েই সিদ্ধ—

সকল প্রকারেই সিদ্ধ—পরাকাষ্ঠা-সিদ্ধ—স্বতঃসিদ্ধ। পক্ষান্তরে, কালদ্বারা পরিচ্ছিন্ন এই যে, আমি আছি, ইহাকে ক্রমাগতই সাধন দ্বারা বর্ত্তমান থাকিতে হইতেছে;—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বায়ু সেবন করিয়া, প্রহরে প্রহরে অন্ন-পানীয় সেবন করিয়া, নিরন্তর আলোক এবং উত্তাপ সেবন করিয়া প্রাণ-ধারণ করিতে হইতেছে; অষ্টপ্রহর চলা-ফেরা বলা-কহা দেখা-শোনা করিয়া মনের পাথেয়-সম্বল যোগাইতে হইতেছে; বিচার-বিবেচনা এবং যুক্তি-পরিচালনা করিয়া বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিতে হইতেছে। এ আছি সকল বিষয়েই আছের নিকট ঋণী;—আছে'র খাইয়া মানুষ, আছে'র কাঁধে ভর দিয়া দাঁড়ায়, আছে'র হাত ধরিয়া চলা-ফেরা করে। আছে'র বলেই আছি—অথচ যেন আপনার বলেই আছি, এইরূপ একটা নাট্যাভিনয় চলিতেছে। দৈবাৎ কখনো রঙ্গভূমি হইতে আড়ালে সরিয়া দাঁড়াইয়া, আমরা যখন আমাদের শরীরের বিসদৃশ সাজসজ্জার প্রতি চক্ষু নিবিষ্ট করি, তখন আমাদের চমক লাগে। ক্ষণপরে আবার যখন অধিকারীর ধমকের চোটে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া স্বাধীনতার উচ্চ শিখরে উন্নত-মস্তকে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াই, তখন আমাদের মনে হয় যে, আছিই গোড়ার কথা—আছে তাহার একটা লেজুড় মাত্র; পক্ষান্তরে, যখন আমরা দৈবদুর্ব্বিপাকে অক্রান্ত হইয়া স্বাধীনতার প্রতি আস্থাহীন হই, তখন আমাদের মনে হয় যে, আছেই গোড়ার কথা, আছি তাহার একটা লেজুড় মাত্র।

যাহাই হউক্ না কেন—আমরা স্বাধীনতায় ভর করি তো! কিসের জোরে ভর করি—সেইটিই এখন বিবেচ্য। শুধু কি কেবল গায়ের জোরে স্বাধীনতায় ভর করি? অথবা আর-কোনো-কিছু'র জোরে?

এই প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া যখন আমরা অন্তরে-বাহিরে চারিদিকে চাহিয়া দেখি, তখন আমরা দুই ক্ষেত্রে আপনার দুইপ্রকার

বিপরীত ভাব দেখিতে পাই; বুদ্ধিক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেখিতে পাই এবং ইন্দ্রিয়ক্ষেত্রে পরাধীনতা দেখিতে পাই।

বুদ্ধি-ক্ষেত্রে আছি'র স্ফূর্ত্তি।

ফরাসীস্ তত্ত্ববিৎ দে-কর্ত্তা'র উদীরিত "Cogito (চিন্তয়ামি) ergo (অতঃ) sum (অস্মি); "ভাবিতেছি অতএব আছি" আজিকের কালের বিদ্যার বাজারে সকলেরই জানা কথা। পরন্তু, আমাদের স্বদেশের পঞ্চদশী-গ্রন্থে, এবং সাংখ্যসার-নামক একখানি চটি সংস্কৃত পুস্তকে অবিকল উহারই দুইটি জুড়ি-বচন যে স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে—এ রহস্যটি অনেকেই জানেন না। দে কর্ত্তা বলিয়াছেন "আমি আপন অস্তিত্বে সংশয় করিতে পারি না, কেন না, সংশয় করিলেই সংশয়কর্ত্তা যে আমি আপনি, তাহা সপ্রমাণ হইয়া সংশয় তৎক্ষণাৎ ঘুচিয়া যায়! ইহারই:একটি জুড়ি-ধাঁচা'র কথা এই যে, আমার "জিহ্বা নাই" এরূপ বাক্য আমি বলিতে পারি না; কেন না, "জিহ্বা নাই" বলিলেই প্রমাণ হয় যে, আমি জিহ্বা দ্বারা ঐ কথাটি উচ্চারণ করিলাম। পঞ্চদশীর গ্রন্থকার তাই বলেন যে—

> জিহ্বা মেঽস্তি ন বেত্যুক্তির্লজ্জায়ৈ কেবলং যথা।
> ন বুধ্যতে ময়া বোধো বোদ্ধব্য ইতি তাদৃশী॥

ইহার অর্থ এই যে—"আমার জিহ্বা আছে কি নাই" এ কথা যেমন হাস্যাস্পদ, "আমার জ্ঞান আছে কি না তাহা আমি জানি না" এ কথাও তদ্বৎ। পুনশ্চ দে-কর্ত্তা বলেন—"আমি চিন্তা করিতেছি" এইরূপ-জ্ঞানের বলেই আমার অস্তিত্ব সপ্রমাণ। সাংখ্যসার-প্রণেতা বলেন—

> "দ্রষ্টা সামান্যতঃ সিদ্ধো জানেঽহমিতি ধীবলাৎ।"

ইহার অর্থ এই যে—"আমি জানিতেছি" এইরূপ বুদ্ধিবলে দ্রষ্টার অস্তিত্ব সাধারণত সপ্রমাণ। দে-কর্ত্তা বলেন—"ভাবিতেছি, অতএব

আছি," সাংখ্যসার-প্রণেতা বলেন—"জানিতেছি, অতএব আছি," ভাবার্থ একই।

প্রকৃত কথা এই যে, অতএবের সাঁড়াষী দিয়া 'ভাবিতেছি' হইতে 'আছি' টানিয়া বাহির করা যুক্তির একটা ভড়ং বই আর কিছুই না। যদি ভাবিতেছি এবং আছি'র মাঝখানে একটা রাস্তা-বন্দি করা নিতান্তই প্রয়োজন হয়, তবে তাহা একটিমাত্র অতএবের সোজা রাস্তা বাঁধিয়া দেওয়ার কর্ম্ম নহে; একটির জায়গায় উপর্য্যুপরি তিনটি অতএবের সিঁড়ি বাঁধিয়া দেওয়া আবশ্যক :—স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক যে—

(১) ভাবনা জ্ঞানক্রিয়া

অতএব

"ভাবিতেছি" বলিলেই বুঝায় যে, জ্ঞান কার্য্য করিতেছে।

(২) কার্য্য-মাত্রই শক্তিসাধ্য,

অতএব

"জ্ঞান কার্য্য করিতেছে" বলিলেই বুঝায় যে, তাহার মূলে ধীশক্তি আছে।

(৩) শক্তিমাত্রই সত্তাশ্রিত,

অতএব

"ধীশক্তি আছে" বলিলেই বুঝায় যে, ধীমান্ পুরুষ আছে—আমি আছি।

তুমি হয় তো বলিবে যে, "তোমার তিন অতএব স্যাকরার ঠুক্‌ঠাক্‌, দে-কর্ত্তার এক অতএব কামারের এক ঘা:—এক অতএবেই বস্ আছে—তিন অতএব বহ্বাড়ম্বর!" ইহার উত্তর এই যে, কামারের এক ঘা খাটাইবার উপযুক্ত স্থান অনেক আছে—দার্শনিক তত্ত্বের কাঁচা সোণার উপরে কেন এ দৌরাত্ম্য! ভূয়োদর্শনের লৌহপিণ্ডের উপরে অনুমান

হাতুড়ির এক ঘা প্রয়োগ করিয়া জগৎ-জোড়া বিশাল তত্ত্বসকল উদ্ভাবন করুন্—তাহাতে বারণ নাই। পরন্তু দার্শনিক তত্ত্বের হার গাঁথিতে হইলে সূক্ষ্ম যুক্তিসূত্রের—(অতএব পরম্পরা'র) সঞ্চালন ব্যতিরেকে আর-কোন উপায়ে তাহা সম্ভাবনীয় নহে—ইহা জানা উচিত। কথাটা হ'চ্চে এই :—

"আমি চিন্তা করিতেছি" বলিলে যেমন বুঝায় যে, আমিই চিন্তা করিতেছি সুতরাং আমি আছি ; "আমি কার্য্য করিতেছি" বলিলেও তেমনি বুঝায় যে, আমিই কার্য্য করিতেছি সুতরাং আমি আছি ; তা যদি বুঝায়—তবে কেন দে-কর্ত্তা "কার্য্য করিতেছি অতএব আছি" না বলিয়া "চিন্তা করিতেছি অতএব আছি" বলিলেন ? আমি যে-কোনো কার্য্য করি, তাহাতেই যদি আমার অস্তিত্ব যথেষ্ট সপ্রমাণ হয়, তবে আমার আর-আর কার্য্যের মধ্য হইতে চিন্তা-কার্য্যটিকে বাছিয়া লইয়া সেই কার্য্যটিকেই কেবল আমার অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ বলিয়া ধার্য্য করিবার তাৎপর্য্য কি ? তাহার বিশেষ একটি তাৎপর্য্য আছে ; তাহা এই :—

আমার সকল কার্য্য শুদ্ধ যে কেবল আমার নিজের শক্তিতে কৃত হয়, তাহা নহে। মনে কর, আমি চন্দ্রোদয় দেখিতেছি। চন্দ্রের প্রতি তাকাইয়া চন্দ্রের প্রকাশ চক্ষুরিন্দ্রিয়ে অনুভব করিতেছি। চন্দ্রের প্রকাশ এক-প্রকার প্রভাব, আর আমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ে প্রকাশের সেই যে অনুভূতি তাহা সেই প্রভাবেরই প্রতিভাব। প্রতিভা যেমন প্রভার প্রতিবিম্ব, প্রতিভাব তেমনি প্রভাবের প্রতিবিম্ব। তবেই হইতেছে যে, চন্দ্রেরই শক্তিপ্রভাবে আমি চন্দ্রদর্শন করিতেছি—আমার নিজের শক্তিপ্রভাবে নহে। তাহার পরে, মনে কর, আমি বিছানায় পড়ে শুয়ে-শুয়ে চন্দ্র ভাবিতেছি। এখন আর চন্দ্রের প্রভাব আমরা চক্ষুর উপরে কার্য্য করিতেছে না ; এখন

আমি তাই স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি যে, আমি আমার নিজের ধীশক্তির প্রভাবে চন্দ্র ধ্যান করিতেছি। প্রতিভাবের গোড়ায় যে প্রতি রহিয়াছে, তাহাকে চেন' নাই—সেটি সহজ পাত্র নহে। সেই প্রতিটাই ইঙ্গিতচ্ছলে জ্ঞাপন করিতেছে যে, 'প্রতিভাব তোমার আপন শক্তির প্রভাব নহে, তাহা অপর-কোনা বস্তুর প্রভাবের প্রতিবিম্ব। কিন্তু এক্ষণে যখন আমি বিছানায় শুইয়া চন্দ্র ভাবিতেছি, তখন, প্রতিভাবনার প্রতি ঘুচিয়া গিয়াছে, আর, সেই-গতিকে আমার এক্ষণকার জ্ঞানক্রিয়া নিখুঁত ভাবনা-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এখন আমি অসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, এ যে আমার ভাবনা—এ ভাবনা প্রতিভাবনা নহে, এ ভাবনা প্রভাবনা ইহা আমার নিজের ধীশক্তির প্রভাব-স্ফূর্ত্তি। এই যে একটি কথা যে, "ভাবনা-কার্য্যে আমাদের নিজের ধীশক্তির প্রভাব-স্ফূর্ত্তি পায়, অতএব ভাবনা আমাদের নিজের অস্তিত্বের পরিচায়ক"—এ কথাটি দে-কর্ত্তা যদি-চ বলেন নাই—আমরাই কেবল বলিতেছি ; কিন্তু ভাবে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, আমাদের ঐ কথাটি দে-কর্ত্তার মনোমধ্যে বিলক্ষণই আধিপত্য করিয়াছিল ; তবে কিনা—তাঁহার নিয়োজিত একটিমাত্র অতএবের শরীরে এতাধিক বল নাই যে, তাঁহার ঐ প্রকৃত মন্তব্য কথাটির গুরুভার স্কন্ধে বহন করে। আমরা যেরূপ উত্তরোত্তরক্রমে 'ভাবিতেছি' হইতে 'আছি'তে নাবিলাম—প্রথম অতএবে ভর দিয়া ভাবনা হইতে জ্ঞানে নাবিলাম, দ্বিতীয় অতএবে ভর দিয়া জ্ঞান হইতে ধীশক্তিতে নাবিলাম, তৃতীয় অতএবে ভর দিয়া ধীশক্তি হইতে ধীমান্ পুরুষের অস্তিত্বে নাবিলাম ; এরূপ না করিলে (মন্তব্য কথাটি খুলিয়া-খালিয়া না বলিলে)—"ভাবিতেছি অতএব আছি" "দেখিতেছি অতএব আছি" "নাচিতেছি অতএব আছি" ইত্যাকার সমস্ত কথারই মূল্য সমান হইয়া দাঁড়ায়, আর, সেই-গতিকে দে-কর্ত্তার মহাবাক্যটি সচ্ছিদ্র নৌকার ন্যায় জলমগ্ন হইয়া যায়।

প্রশ্ন উঠিয়াছিল এই যে, আমরা যখন স্বাধীনতায় ভর করিয়া দাঁড়াই, তখন কি গায়ের জোরে স্বাধীনতায় ভর করি—অথবা আর-কোনো-কিছুর জোরে? এখন দেখিতেছি যে, ধীশক্তির জোরে আমরা স্বাধীনতায় ভর করিয়া দাঁড়াই। আমি আছি'র বোধ হইতে স্বাধীনতার ভাব আপনা-আপনি আসিয়া পড়ে। আসিয়া পড়ে এইরূপে :—

আমার আপনার অস্তিত্ব আমার আপনারই ধীশক্তির প্রভাবে সমর্থিত হয়, তদ্ব্যতীত অপর-কোনো-কিছুর শক্তির প্রভাবে সমর্থিত হয় না—আমি-আছির'র সমর্থন-কার্য্য আমার আপনারই ধীশক্তির অধীন, তদ্ব্যতীত আর-কোনো-কিছুর অধীন নহে—সুতরাং আমি স্বাধীন।

এইরূপে আমরা স্বাধীনতায় ভর করিয়া দাঁড়াই বুদ্ধিক্ষেত্রে। কিন্তু তা ছাড়া—আর-এক ক্ষেত্র আছে ;—সেটা হ'চ্চে ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্র। ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রেও আমরা পূর্ব্বের ন্যায় তিন অতএবের সিঁড়ি ভাঙিয়া—

কার্য্য হইতে শক্তিতে এবং শক্তি হইতে সত্তাতে অবতরণ করি। এবারকার সোপান-পদ্ধতি এইরূপ :—

(১) দর্শন ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া,

অতএব

"আমি দর্শন করিতেছি" বলিলেই বুঝায় যে, আলোকদ্বারা আমার চক্ষুরিন্দ্রিয় উপরক্ত হইতেছে।

(২) কার্য্যমাত্রই শক্তিসাধ্য,

অতএব

"আলোকদ্বারা আমার চক্ষুরিন্দ্রিয় উপরক্ত হইতেছে" বলিলেই বুঝায় যে, আলোকের উপরঞ্জনী শক্তি আমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের উপরে কার্য্য করিতেছে।

(৩)শক্তিমাত্রই সত্তাশ্রিত,

অতএব

"আলোকের উপরঞ্জনী শক্তি কার্য্য করিতেছে" বলিলেই বুঝায় যে, আলোক-পদার্থ আছে।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে, দর্শনক্রিয়া আমার আপনারই ইন্দ্রিয়ক্রিয়া। আমার আপনার ক্রিয়াতে আমার আপনারই অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়। অতএব ভাবনা-ক্রিয়াও যেমন, দর্শন-ক্রিয়াও তেমনি—দুইই শুধু-কেবল আমার আপনার অস্তিত্বেরই সাক্ষ্যপ্রদান করে; তা বই, দৃষ্টবস্তুর অস্তিত্বের সাক্ষ্যপ্রদান করে না। স্বপ্নেতেও তো আমরা আলোক দর্শন করি; কিন্তু তাহা তো আর বাস্তবিক আলোক নহে। ইহার উত্তর এই যে, ধ্বনি না থাকিলে যেমন প্রতিধ্বনি থাকিতে পারে না, জাগরিতাবস্থা না থাকিলে তেমনি স্বপ্নাবস্থা থাকিতে পারে না। স্বপ্নাবস্থা জাগরিতাবস্থারই প্রতিধ্বনি। ধ্বনি এবং প্রতিধ্বনি উভয়ে যেমন নিরবচ্ছিন্ন কার্য্যকারণসূত্রে সংগ্রথিত, জাগরিতাবস্থার আলোকদর্শন এবং স্বপ্নাবস্থার আলোকদর্শন, এ দুইটি ব্যাপার তেমনিই নিরবচ্ছিন্ন কার্য্যকারণসূত্রে সংগ্রথিত। মনে কর, একজন পাচকের হস্ত হইতে একটা লোহার হাতা দৈবক্রমে খসিয়া জ্বলন্ত উনানের ভিতরে পড়িয়া গেল। অগ্নি-সংযোগে হাতা এরূপ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল যে, পাচক তাহা তুলিয়া লইতে পারিল না। এরূপ অবস্থায় হাতাটি যে অগ্নির শক্তিপ্রভাবে উত্তপ্ত হইয়াছে—পাচকের এটা দেখা কথা। মনে কর, তাহার পরে, উনানে একঘটি জল ঢালিয়া অগ্নি সমূলে নির্ব্বাণ করিয়া ফ্যালা হইল; কিন্তু হাতাটা এখনো উত্তপ্ত। অগ্নি যদিও এখন নাই, তথাপি পাচককে হাতার উষ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, পাচক বলিবে যে, অগ্নির শক্তিপ্রভাবেই হাতাতে উত্তাপের সঞ্চার

হইয়াছে। এ যেমন দেখা গেল, তেমনি, স্বপ্নদর্শকের চক্ষু এখন যদি-চ নিমীলিত, এবং সূর্য্য এখন যদি-চ অস্তমিত, কিন্তু সাত-আট ঘণ্টা পূর্ব্বে তাহার চক্ষু উন্মীলিত ছিল এবং সূর্য্য আকাশে দীপ্তি পাইতেছিল। আর চক্ষুর সেই উন্মীলিত অবস্থায় তাহার গোলকের অভ্যন্তরে সূর্য্যালোক যেরূপ শক্তিসঞ্চার করিয়াছে, স্বপ্নের আলোক-দর্শন তাহারই একপ্রকার ফ্যাকৃড়া প্রভাবস্ফূর্ত্তি। ইহার প্রমাণ যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহা স্পষ্টই পড়িয়া আছে ;—তাহা এই যে, স্বপ্ন-দর্শকের আলোক দর্শন যখন তাহার নিজের ইচ্ছাধীন নহে, তখন তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, কোনো-না-কোনো বহির্বস্তুর শক্তিপ্রভাবেই তাহা সংঘটিত হইতেছে। বলিলাম, "সূর্য্যের শক্তিপ্রভাবে স্বপ্নদর্শক আলোক দর্শন করিতেছে"; তাহা না বলিয়া বলিতে পারিতাম যে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের তৈজস-তন্তুর (Nerve-এর) শক্তি-প্রভাবে স্বপ্নদর্শক আলোকদর্শন করিতেছে ; মরুভূমির বালুকার উত্তাপ এবং সূর্য্যের উত্তাপ, একই বস্তু। সূর্য্যালোকের প্রভাব যদি চাক্ষুষ তৈজস-তন্তুতে কোনোকালেই সংক্রামিত না হইত, তাহা হইলে স্বপ্নেও সূর্য্যালোকের দর্শনলাভ সম্ভাবনীয় হইত না। অতএব এটা স্থির যে, ইন্দ্রিয়ক্ষেত্রে আমরা (১) বহির্বস্তুর শক্তির প্রভাব, (২) তাহারই সত্তার প্রাদুর্ভাব এবং (৩) আমাদের নিজের স্বাধীনতার অভাব, তিনই একসঙ্গে অনুভব করি।

আমাদের গোড়া'র কথাটি এতক্ষণে সপ্রমাণ হইল ; সে কথা এই যে, "আমরা দুই ক্ষেত্রে আপনার দুইপ্রকার বিপরীত ভাব দেখিতে পাই :—বুদ্ধিক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেখিতে পাই—ইন্দ্রিয়ক্ষেত্রে পরাধীনতা দেখিতে পাই।"

অতঃপর দেখিতে হইবে এই যে, বুদ্ধিক্ষেত্রে আমরা স্বাধীনতা অনুভব করি বটে—কিন্তু কতক্ষণ? বুদ্ধি যতক্ষণ চলে—ততক্ষণ।

কোনো-গতিকে যদি আমার বুদ্ধিক্রিয়া স্তম্ভিত হইয়া যায় (যেমন ক্লোরে ফর্ম্ম-সেবন-গতিকে) তাহা হইলে সেই সঙ্গে আমার স্বাধীনতাবোধও অন্তর্ধান করে—আছি-বোধও অন্তর্ধান করে। ফল কথা এই যে, আমি-আছি এই বোধ এবং সেই সঙ্গে আমার স্বাধীনতাবোধ, দুইই সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমার নিজের ধীশক্তির উপরেই নির্ভর করে—এ কথা সত্য। কিন্তু তা বলিয়া এটা ভুলিলে চলিবে না যে, পরোক্ষসম্বন্ধে তাহা বহির্বস্তুর অস্তিত্বের উপরে নির্ভর করে। সাক্ষাৎসম্বন্ধ হ'চ্চে বস্তুগুণের সম্বন্ধ; পরোক্ষসম্বন্ধ হ'চ্চে কার্য্যকারণের সম্বন্ধ। আর, সে দুই সম্বন্ধের গোড়া'র কথা হ'চ্চে সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞানের একাত্মভাব।

পূর্ব্বে দেখা হইয়াছে যে, সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান, পরস্পরের সহিত এরূপ হরিহরাত্মা যে, সে তিন পদার্থ একপ্রকার তিনে এক—একে তিন! ইহা হইতেই আসিতেছে এই যে, আমাদের জ্ঞান এক-দিকে সত্তার সহিত এবং আর-এক-দিকে শক্তির সহিত—দুয়েরই সহিত—ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে জড়িত। কাজেই, জ্ঞানকে দুই কূল রক্ষা করিয়া চলিতে হয়—দুই দিকের দুইপ্রকার সম্বন্ধ সমান মানিয়া চলিতে হয়। একদিকের সম্বন্ধ হ'চ্চে সত্তা-ঘটিত বস্তুগুণের সম্বন্ধ; আর-এক-দিকের সম্বন্ধ হ'চ্চে শক্তি-ঘটিত কার্য্যকারণের সম্বন্ধ।

বস্তুগুণের দ্বার।

বস্তুগুণ-সম্বন্ধের দ্বার দিয়া আমি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, জ্ঞান আমারই একপ্রকার গুণ; তাহা আমাতেই উত্থান করে, আমাতেই বিলীন হয়; তাহা ষোলআনা আমার নিজস্ব সম্পত্তি—তাহার অপর-কোনো অংশী নাই—সরিক নাই। আর, আমার আপনারই সেই জ্ঞানে আমার অস্তিত্ব সপ্রমাণ। আমার অস্তিত্বের দৃঢ়তা এবং বলবত্তা

সাধন করিবার জন্য আমাকে অপর-কাহারো দ্বারস্থ হইতে হয় না; আমার অস্তিত্ব স্বাধীন অস্তিত্ব—আমি স্বাধীন।

কার্য্যকারণের দ্বার।

পক্ষান্তরে, কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের দ্বার দিয়া আমি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, আমার জ্ঞান একপ্রকার কারণমূলক কার্য্য; তাহা আমরা ধীশক্তির স্ফূর্ত্তির উপরে নির্ভর করে; ধীশক্তির স্ফূর্ত্তি চেতনা-শক্তির উপরে নির্ভর করে; চেতনাস্ফূর্ত্তি প্রাণস্ফূর্ত্তির উপরে নির্ভর করে; প্রাণস্ফূর্ত্তি বহির্বস্তুর শক্তিস্ফূর্ত্তির উপরে নির্ভর করে।

স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা।

আমরা যখন জ্ঞানরূপ গুণের আধার বস্তুর উপরে লক্ষ্য নিবিষ্ট করি, তখন স্বাধীনতা অনুভব করি; পক্ষান্তরে, যখন জ্ঞানরূপ কার্য্যের কারণের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করি, তখন পরাধীনতা অনুভব করি। আমি যদি পরাধীনতার হস্ত এড়াইবার জন্য বুদ্ধিক্ষেত্রের কৈলাসশিখরে স্বাধীনতায় ভর করিয়া নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকি, আর, মনে করি যে, কার্য্যকারণের সম্বন্ধ এখানে আমাকে হাত বাড়াইয়া নাগাল পাইবে না—তবে তাহা শুদ্ধকেবল মনে করা মাত্র। কেন না, আমি যতই কেন আপনাকে স্বাধীন মনে করি না—নিশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য আমাকে বায়ুর আশ্রয়ে নির্ভর করিতে হইবেই; অন্ন পানীয়ের জন্য মৃত্তিকা-জলের আশ্রয়ে নির্ভর করিতে হইবেই; আলোক-উত্তাপের জন্য অগ্নি-সূর্য্যের আশ্রয়ে নির্ভর করিতে হইবেই। তবে, এমন হইলে হইতে পারে যে, কোনো যোগসিদ্ধ পুরুষ দেবলোক-নিবাসীদিগের ন্যায় পৃথিবীর সঙ্গ ছাড়িয়া নূতন এক সূক্ষ্মতর জগতের সহিত বন্ধুতা পাতাইয়া সেখানে

হইতে সূক্ষ্ম-শরীরের উপাদান এবং প্রাণ-মন-বুদ্ধির উপজীবিকা তলে-তলে সংগ্রহ করেন। তাহা যদি হয়, তবে সে-সমস্ত উপাদান এবং উপজীবিকার জন্য যোগী পুরুষ পৃথিবীর নিকটে ঋণী না হইলেও নূতন-এক-তরো সূক্ষ্ম অপার্থিব রাজ্যের নিকটে ঋণী। মনে কর, যেন পূর্ব্বে আমি কলিতায় বাস করিতাম—এক্ষণে হিমাচলে বাস করিতেছি। এক্ষণে আমাকে কলিকাতার আইন মানিয়া চলিতে হইতেছে না—ইহা সত্য। কলিকাতার যেন আইন মানিয়া চলিতে হইতেছে না—হিমাচলের তো আইন মানিয়া চলিতে হইতেছে! তার সাক্ষী—কলিকাতায় আমি খালি-গায়ে থাকিতাম, এখানে আমি আমার গায়ে সাতপুরু কম্বল জড়াইয়াও সন্তুষ্ট নহি। তেমনি কোনো যোগী পুরুষ যদি পৃথিবীরাজ্য হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া আর-এক উচ্চ রাজ্যে ভর্ত্তি হন, তবে সেই নূতন রাজ্যের নিয়মাবলী অবশ্যই তাঁহাকে মানিয়া চলিতে হইবে। প্রকৃত কথা যাহা, তাহা এই :—

এরূপ মহাপুরুষ কালে কালে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং করেনও, যাঁহারা আমাদের ন্যায় তমসাচ্ছন্ন ব্যক্তির তুলনায় সিদ্ধপুরুষ। কিন্তু আমাদের তুলনায় সিদ্ধপুরুষ স্বতন্ত্র, এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে সিদ্ধপুরুষ স্বতন্ত্র। প্রকৃত কথা এই যে, মনুষ্য সিদ্ধপুরুষ নহে—মনুষ্য সাধক পুরুষ। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, যোগসাধক যে-কোনো সিদ্ধি লাভ করিতে চেষ্টা করুন্ না কেন—সে সিদ্ধি পূর্ব্ব হইতেই আমাদের চক্ষের সম্মুখে অনেককাল হইয়া বসিয়া আছে। তুমি আকাশে উড়িতে ইচ্ছা করিতেছ—পতঙ্গ-বিহঙ্গ অনেককাল পূর্ব্ব হইতে আকাশে উড়িতেছে। তুমি ধোঁয়াকলে জাহাজ চালাইতেছ—ধোঁয়া অপেক্ষা শতকোটিগুণ সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম বাষ্পযোগে জীবশরীর অনেককাল হইতে পৃথিবীতে চলা-ফেরা করিতেছে। যে-কোনো বিষয়েই তুমি সিদ্ধির

১৫

অল্প একরত্তি আভাস অনেক সাধ্য-সাধনায় উপার্জ্জন করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেছ—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অনেক পূর্ব্বে তাহা পূরামাত্রায় হইয়-বসিয়া আছে। তু'ম ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড—তোমার চতুর্দ্দিকে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের বৃহৎ সিদ্ধি তাহার চিরন্তন সম্পত্তি—তোমার ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র সিদ্ধি সবে-মাত্র আজিকের নূতন আমদানি। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের বৃহৎ সিদ্ধি তোমার ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র সিদ্ধিকে অনেককাল গ্রাস করিয়া বসিয়া আছে। তুমি সাধনদ্বারা যত-কিছু শক্তি উপার্জ্জন করিতেছ, সমস্তই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড হইতে আসিতেছে; আর যত-যত-প্রকার সিদ্ধি লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে—সমস্তেরই পরাকাষ্ঠা আদর্শ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। অতএব এটা স্থির যে, প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধ-পুরুষ একমাত্র অদ্বিতীয় সত্য—যিনি নিখিল বিশ্বভুবনের আদি-অন্ত-মধ্য সমস্ত লইয়া এক আমি-আছি-রূপে চির বিরাজমান! আমরা যখন বলি যে, আমি বহির্বস্তুর অধীন—আছি আছে'র অধীন—তখন তাহার অর্থই এই যে, আমি ঐশী শক্তির অধীন। "ভারতবর্ষ ইংরাজসৈন্যের বশতাপন্ন" এ কথার অর্থই এই যে, ভারতর্ষ ইংলণ্ডাধিপের বশতাপন্ন। এ আমি-আছি একমাত্র অদ্বিতীয় আমি আছি'র অধীন। কার্য্য-কারণ-হিসাবে অধীন; তত্রাচ, বস্তুগুণ-হিসাবে—জলের সহিত যেমন জলের ঐক্য, আছি'র সহিত তেমনি আছি'র ঐক্য রহিয়াছে; ঐক্য রহিয়াছে বলিয়াই সমস্ত জগতের আদ্যন্তব্যাপী পরাকাষ্ঠা সত্যকে আমরা "আছে" না বলিয়া "আছি" বলি। তা ছাড়া, আমরা যে দীন-হীন-পরাধীন হইয়াও স্বাধীনতার গোঁ কিছুতেই ছাড়ি না—তাহার কারণই ঐ; কি? না, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের মূলাধিষ্ঠিত সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বাত্মক চিরন্তন মহান আছি'র সহিত ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের মূলাধিষ্ঠিত কালাবচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র আছি'র ঐক্য। কেন না, সমস্ত লইয়া এক অদ্বিতীয় সত্য যিনি চির-বিরাজমান, তাঁহার বাহিরে দ্বিতীয় কিছুই

নাই; সুতরাং তাঁহার শক্তি বাহিরের অন্য-কোনো-কিছুর শক্তিদ্বারা ব্যাবছিন্ন বা প্রতিহত হইতে পারে না—সুতরাং বাস্তবিক হিসাবে তিনিই কেবল স্বাধীন। তবেই হইতেছে যে, কালাবচ্ছিন্ন সুতরাং পরাধীন এই যে আছি, এ আছি'র স্বাধীনতা অন্য-কোনো প্রকারেই সম্ভাবনীয় নহে—সওয়ায় চিরন্তন আছি'র সহিত ঐক্যের উপলব্ধি। মহান আছি'র সহিত আমাদের এই ক্ষুদ্র আছি'র ঐক্যই আমাদের একমাত্র স্বাধীনতা—অস্ফুট ঐক্য অস্ফুট স্বাধীনতা, পরিস্ফুট ঐক্য পরিস্ফুট স্বাধীনতা। বিষয়টি অতীব গুরুতর এবং গভীর। সাঁটেসোঁটে ইঙ্গিত-ইষারায় অতীব সংক্ষেপে বলা হইল। এই যে, মহান আছি'র সহিত ক্ষুদ্র আছি'র ঐক্য, ইহাই আমাদের স্বাধীনতা'র গোড়া'র কথা। এই সংক্ষিপ্ত বচনটির মৰ্ম্মের ভিতরে প্রবেশ করিতে হইলে উহার অন্ধিসন্ধির' জানালা-কপাট খুলিয়া দিয়া উহার ভিতরে রীতিমত আলোক নিক্ষেপ করা আবশ্যক; তাহারই এক্ষণে চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

আছি'র সহিত আছি'র ঐক্য।

কালিদাস প্রথম বয়সে মূর্খ ছিলেন, পশ্চাৎবয়সে অসামান্য কবি হইয়া উঠিয়াছিলেন, ইহা সকলেরই জানা কথা। ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, পণ্ডিতের এবং মূর্খের আছি'র মধ্যে অলঙ্ঘনীয় প্রাচীরের ব্যবধান নাই। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিবার আছে; তাহা এই:—

কালিদাস যখন মূর্খ ছিলেন, তখন তিনি জানিতেন যে, তাঁহার নাম "কালি" এই এক কথায় পরিসমাপ্ত। তাহার পরে যখন তিনি আপনার নামাক্ষর বানান্ শিখিতেছেন, তখন তিনি সেই এক কথার জায়গায় দুই কথা দেখিতেছেন:—দেখিতেছেন (১) কএ আকার কা, (২) লএ কার লি। আরো কিছুদিন পরে যখন তাঁহার প্রথম পাঠ সাঙ্গ হইল, তখন তিনি দুই কথার জায়গায় তিন কথা দেখিলেন;—দেখিলেন (১) কএ আকার কা + (২) লএ ইকার লি = (৩) কালি।

তৃতীয় বয়সের তিন কথা আর-কিছু না—দ্বিতীয় বয়সের দুই কথার সহিত প্রথম বয়সের এক কথার যোগ-বন্ধন ;—কা এবং লি এই দুই কথার সহিত যোগ-বন্ধন। এই গেল উপমা— উপমেয় হ'চ্চে এই ঃ—

সহজ জ্ঞান "আছি" এই এক কথা বলিয়াই ক্ষান্ত। মনোবিজ্ঞান ঐ এক কথা'র পর্দ্দার আড়ালে দুই কথা দেখিতে পা'ন ; দেখিতে পান—আছি এবং আছে এই দুই যমজ সহোদর পিঠোপিঠি জোড়া লাগানো। তার সাক্ষী—আমাকে দেখিয়া কেহ যদি বলে "এ ব্যক্তি আছে, তবে সে ব্যক্তি যাহাকে বলিতেছে "আছে," তাহাকেই আমি বলিতেছি "আছি।" তা ছাড়া—আমার আপনার নিকটেও আমার শরীর, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি আছে ; আমি সেই আছের সহিত জড়িতভাবে আছি—এরূপ জড়িতভাবে যে, আমার শরীর-মন প্রভৃতি যত-কিছু পদার্থ আমার সাক্ষাতে আছে বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে, সমস্তই যদি আমার জ্ঞান হইতে সরিয়া পালায়, তবে আছিও সেই সঙ্গে সরিয়া পালায় ;—যেমন সুষুপ্তিকালে। এইজন্য বলিতেছি যে, সহজ জ্ঞান যেখানে দেখেন শুধুই কেবল আছি, মনোবিজ্ঞান সেখানে দেখেন আছে-আছি একসঙ্গে জড়ানো। তত্ত্বজ্ঞান আবার মনোবিজ্ঞানের অপেক্ষাও সূক্ষ্মদর্শী। মনোবিজ্ঞান আছে'র একপিটেই কেবল আছি দেখিতে পা'ন ; তত্ত্বজ্ঞান আছির এ-পিট ও-পিট দুই পিঠেই আছি দেখিতে পা'ন। তত্ত্বজ্ঞানের অন্তরের কথা কিরূপ—যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে নিম্নে প্রণিধান করা হোক্ ঃ—

তত্ত্বজ্ঞানের একটি অন্তরের কথা

তোমাকে লক্ষ্য করিয়া আমি বলি যে, "ইনি আছেন"—আমার ভাষায় আমি বলি ইনি আছেন।" তোমার ভাষায় তুমি "ইনি আছেন" বলো না—তুমি বলো "আমি আছি।" একই বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া আমার

ভাষায় আমি বলিতেছি "ইনি আছেন." তোমার ভাষায় তুমি বলিতেছ "আমি আছি।" দুই কথার ভাবার্থ একই। ভাবার্থ একই বটে—কিন্তু তত্রাচ তোমার ভাষায় তুমি যে বলিতেছ "আমি আছি" এইটিই মূল কথা ; আর, আমার ভাষায় আমি যে বলিতেছি "ইনি আছেন," এটা সেই মূলের অনুবাদ। ওটাকেই বা মূল বলি কেন—এটাকেই বা অনুবাদ বলি কেন? কেন যে বলি, তাহার কারণ দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে ; কারণ আর কিছু না - তুমি যে বলিতেছ "আমি আছি," এটা তোমার হওয়া কথা ; আর আমি যে বলিতেছি "ইনি আছেন" এটা শুধু আমার দেখা কথা। তত্ত্বজ্ঞান বলেন যে, দেখা কথার মূলে যদি হওয়া কথা না থাকে, তবে দেখা-কথা শুধুকেবল একটা কথার কথা হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই বলিতে হয় যে, তুমি যে বলিতেছ "আমি আছি" সেইটিই মূল কথা ; আর আমি যে বলিতেছি "ইনি আছেন," এটা তাহারই অনুবাদ। তুমি হয় তো বলিবে যে, দেয়াল তো বলে না "আমি আছি"—তুমিই বলিতেছ "দেয়াল আছে"—"দেয়াল আছে" ইহার ভিতরে দেখা কথা ছাড়া হওয়া কথা কোনখানটায়? ইহার উত্তর এই যে তুমি যখন বলিতেছ যে, দেয়াল আছে, তখন তাহার অর্থই এই যে, তোমার দেখা-কথার ও-পিটে দেয়ালের নিজের একটি হওয়া-কথা আছে—যদিচ দেয়াল তাহা মনুষ্যের ভাষায় ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারে না। দেয়াল যদি মনুষ্যের ভাষায় কথা কহিতে জানিত—তাহা হইলে দেয়াল নিশ্চয়ই বলিত আমি আছি।" দেয়াল নিতান্তই পরদেশের লোক ;—দেয়াল তোমার দেশের ভাষায় কথা কহিতে জানে না ; তাই সে মুখে বলিতে পারে না যে, "আমি আছি" তুমি দেয়ালের উকিল। দেয়াল আপনার অন্তরের কথা আপনি প্রকাশ করিয়া বলিতে অক্ষম—তাই তুমি দেয়ালের হইয়া এরূপ ওকালতি করিতেছ যে, দেয়াল আছে ; ইহাতে প্রকারান্তরে বলা হইতেছে যে,

"আমি আছি" এটা দেয়ালের অন্তরের কথা; যদিচ দেয়াল সে কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে জানেও না—বলিতে চাহেও না। দেয়ালকে মারো-ধরো-দেয়ালের তাহা গায়ে লাগে না; কাজেই "আমি আছি' একথা প্রকাশ করিয়া বলিবার জন্য তাহার মাথাব্যথা হয় না; প্রকাশ করিয়া না বলুক্—ঠারেঠোরে বলিতে ছাড়ে না; এমন কি—দেয়াল তোমার চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতেছে আমি আছি," দেয়ালের অঙ্গুলি হ'চ্চে শ্বেতাংশুপ্রতিক্ষেপণী শক্তি সেই তাহার অব্যর্থ শক্তি তোমার চক্ষের ভিতরে চালাইয়া দেয়াল মুখে না বলুক—কাজে বলিতেছে "আমি আছি।"

তত্ত্বজ্ঞানের কথা এই যে, তুমি দেয়ালই হও আর মনুষ্যই হও—তাহাতে আইসে যায় না;— যাহাই তুমি হও না কেন—তোমাকে লক্ষ্য করিয়া আমি যদি বলি যে, "ইনি আছেন," তবে সেই "ইনি আছেন" কথাটির দুই পারেই "আমি আছি" বিরাজমান। এপারের "আমি আছি" আমার অন্তরের কথা—ওপারের "আমি আছি" তোমার অন্তরের কথা; আর তোমার সেই অন্তরের কথাটিকে আমি আমার ভাষায় অনুবাদ করিয়া বলিতেছি যে "ইনি আছেন" অথবা এটা আছে।"

আছির সহিত আছি'র ঐক্য যে কাহাকে বলে, তাহা এক্ষণে বুঝিতে পারা গেল। দেখিতে পাওয়া গেল যে,

প্রথমত, দেখা-কথার দুই পারেই হওয়া কথা থাকা চাই। এপারে দ্রষ্টার অর্থাৎ আমার, আমি আছি থাকা চাই—ওপারে লক্ষ্য বস্তুর অর্থাৎ তোমার আমি থাকা চাই।

দ্বিতীয়ত, দেখা কথা'র এপারের হওয়া-কথা'র সহিত ওপারের হওয়া কথা'র ঐক্য থাকা চাই।

তৃতীয়ত, এপারের হওয়া-কথার সহিত ওপারের হওয়া-কথার সেই যে ঐক্য, তাহারই নাম আছির সহিত আছি'র ঐক্য।

আছি'র সহিত আছি'র ঐক্যের স্থূল দৃষ্টান্ত।

"আমি তোমাকে দেখিতেছি" এই যে একটি দেখিতেছি-ব্যাপার, এই দেখিতেছি'র এপারে আমি বলিতেছি "আমি আছি" ওপারে তুমি বলিতেছ "আমি আছি।" "আমি তোমাকে দেখিতেছি" এ কথাটি একটি বই কথা নহে, অথচ সেই একটিমাত্র-কথা'র দুই পারে দুই আছি বিরাজমান।

দুইটি কথা দ্রষ্টব্য।

প্রথম কথা এই যে, দেখিতেছি'র এপারে দাঁড়াইয়া আমি যে বলিতেছি "আমি আছি," তাহার অর্থ এই যে, দেখিতেছি = দেখিতে + আছি অর্থাৎ দেখিতেছি-রকমে আছি। তবেই হইতেছে যে, দেখিতেছি আছিরই রকমভেদ বা প্রকার ভেদ। রূপকের ভাষায়—দেখিতেছি আছি'রই তরঙ্গ ভঙ্গ। দার্শনিক ভাষায়—দেখিতেছি একপ্রকার পরিবর্ত্তনশীল গুণ; সেই পরিবর্ত্তনশীল গুণের অপরিবর্ত্তনীয় আধার-বস্তু থাকা চাই; সে আধার বস্তু কে? না, আছি। কেন না গোড়ায় আছি না থাকিলে, ব্যবহারক্ষেত্রে দেখিতেছি থাকিতে পারে না।

দ্বিতীয় কথা এই যে, "আমি তোমাকে দেখিতেছি" বলিলেই বুঝায় যে তুমি আমার চক্ষুরিন্দ্রেয়ের উপরে কার্য্য করিতেছ, তাই আমি তোমাকে দেখিতেছি। সে কার্য্যের কারণ আমি নহি—সে কার্য্যের কারণ তুমি। ফলে, দেখিতেছি-ব্যাপারটি এপারের আছি'র একপ্রকার গুণপরিবর্ত্তন। "পূর্ব্বে দেখিতেছিলাম না—এক্ষণে দেখিতেছি" এইরূপ একটা গুণপরিবর্ত্তন এই গুণপরিবর্ত্তনের উপরে ওপারের আছি'র কার্য্যকারিতা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে স্পষ্ট।

এই দুইটি কথা পরস্পরের সহিত মিলাইয়া দেখিয়া আমরা পাইতেছি এই যে, "আমি তোমাকে দেখিতেছি" এই কথাটির সঙ্গে দুই পারের দুই

আছির সম্বন্ধ রহিয়াছে। এপারের আছি'র সম্বন্ধ যাহা রহিয়াছে, তাহা বস্তুগুণের সম্বন্ধ; ওপারের আছি'র সম্বন্ধ যাহা রহিয়াছে, তাহা কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ। বস্তু-গুণ-সম্বন্ধের সোপান দিয়া আমি দেখিতেছি-হইতে এপারের আছিতে অবতরণ করি; কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের সোপান দিয়া আমি দেখিতেছি হইতে ওপারের আছিতে আরোহণ করি। দুই পারের দুই আছি'র ঐক্যের নামই আছি'র সহিত আছি'র ঐক্য।

প্রকৃত কথা এই যে সম্বন্ধমাত্রেরই মূলে ঐক্য অবশ্যম্ভাবী। আমি যদি বলি যে, "তোমার সহিত আমার কোনো সম্বন্ধ নাই," তবে তাহার অর্থই এই যে, তোমাতে আমাতে ঐক্য নাই। পুত্র একসময়ে মাতার শরীরেরই অঙ্গের সামিল ছিল—তাই মাতার সহিত পুত্রের এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। মনুষ্যমাত্রেই জগতের শ্রেষ্ঠ উপাদান হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এইজন্য মনুষ্যে মনুষ্যে এরূপ ঘনিষ্ঠ সমন্ধ। সম্বন্ধের মূলে ঐক্যই যদি নাই—তবে সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া থাকিবে কিসের উপরে? শূন্যের উপরে? না বালির বাঁধের উপরে? অতএব এটা স্থির যে, সম্বন্ধমাত্রেরই মূলে ঐক্য রহিয়াছে। এমন কি তেলে-জলের সম্বন্ধের মধ্যেও ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। একটা কাচ-পাত্রে যদি তেল আর জল একাধারে বিন্যস্ত হয়, তাহা হইলে দুয়ের সন্ধিস্থানে উভয়ের ঐক্য এরূপ সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে যে, সে স্থানের চক্রাকৃতি রেখাটিকে তৈল-রেখা বলিব কি জল-রেখা বলিব, তাহার ঠিকানা পাওয়া যায় না। ইহাতে দাড়াইতেছে এই যে, আছি'র সহিত দেখিতেছি'রও ঐক্য রহিয়াছে; আছি'র সহিত আছির'ও ঐক্য রহিয়াছে। আছি'র সহিত দেখিতেছি'র ঐক্য প্রকাশ পায় বস্তুগুণের সম্বন্ধ-সূত্রে; আছি'র সহিত আছি'র ঐক্য প্রকাশ পায় কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ-সূত্রে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে দুই পারের দুই আছি'র ঐক্যের প্রতি লক্ষ্য

করিয়াই কিয়ৎপূর্ব্বে সাঁটে-সোঁটে বলা হইয়াছিল— মহান "আছি'র সহিত ক্ষুদ্র আছির ঐক্যই আমাদের স্বাধীনতার ভিত্তিমূল।"

অতঃপর আছি'র সহিত আছি'র ঐক্যের সঙ্গে স্বাধীনতার কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যা'ক্।

মনে কর, দেবদত্ত-নামক একজন বলবান্ যুবা পুরুষ কয়েক ভরি সোণার গহনা বোঁচকায় বাঁধিয়া লইয়া একাকী পদব্রজে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতেছেন। দুই গ্রামের মধ্যে ১৫ক্রোশের ব্যবধান। প্রত্যুষে যখন তিনি রওনা হইলেন, তখন তাঁহার মনে হইল যে, তিনি গন্তব্যপথ এক-নিশ্বাসে গ্রাস করিয়া ফেলিবেন। তিনি ভাবিলেন "একঘণ্টার মধ্যেই আমি ২৫ক্রোশ পথ হাঁটিয়া পার হইব—কাহার সাধ্য আমার গতি-রোধ করে—আমি স্বাধীন!" এরূপ যে তাঁহার মনে হইল, তাহা হইবারই কথা; কেন না একটি-আধটি নহে—তিন-চারিটি মাথালো-গোচের কারণ একযোট্ হইয়া তাহার মনোমধ্যে ঐরূপ একটা মহোত্তম-শালি-স্বাধীনতা-বোধের ফোয়ারা খুলিয়া দিয়াছে।

প্রথম কারণ হ'চ্চে সুস্থ শরীরের বল-স্ফূর্ত্তি।

দ্বিতীয় কারণ হ'চ্চে নিঃশঙ্ক মনের আনন্দ-স্ফূর্ত্তি।

তৃতীয় কারণ হ'চ্চে গম্যস্থানে যাইবার জন্য আগ্রহের আতিশয্য।

চতুর্থ কারণ হ'চ্চে—কর্ত্তব্য-কার্য্যে প্রবৃত্ত-হওয়া গতিকে অন্তরাত্মার (Conscienceএর) প্রসন্নতা।

দেবদত্ত স্বাধীনতায় ভর করিয়া দশক্রোশ পথ অকাতরে অতিবাহন করিলেন। তাহার পরে ক্রমে তাহার স্বাধীনতা মন্দা পড়িয়া আসিতে লাগিল। কায়-ক্লেশে তিনি আর দুইক্রোশ পথ কথঞ্চিৎ প্রকারে অতি-বাহন করিলেন; কিন্তু এখনো তিন-ক্রোশ গন্তব্যপথ তাঁহার সম্মুখে দিগন্তর-হইতে দিগন্তরে প্রসারিত রহিয়াছে তাঁহার পদদ্বয় বেঘোরে পড়িয়া

নিতান্ত না চলিলে নয় তাই চলিতেছে। যে স্বাধীনতা বোধের নূতন-স্ফূর্ত্তির সময় ১৫ক্রোশ পথ দেবদত্তের চক্ষে এক ক্রোশের বেশ ধারণ করিয়াছিল, সেই স্বাধীনতা বোধের এখন অস্ত-গমনের কাল উপস্থিত এখন তাই একক্রোশ পথ তাঁহার চক্ষে শতক্রোশ বা ততোধিক। দেবদত্ত এখন মনে করিতেছেন যে, "আমার স্বাধীনতায় কাজ নাই—মাঠের মধ্যে কোথাও যদি একটা বটগাছের আড়াল পাই, তবে তাহার সুস্নিগ্ধ ছায়ায় মুহূর্ত্তেকের জন্য হাত-পা ছড়াইয়া বাচি।" পূর্ব্বে দেবদত্তকে দেবদত্তের মন তিন-সত্য করিয়া বলিয়াছিল "তুমি স্বাধীন"; এখন অম্লান-বদনে বলিতেছে "তুমি পরাধীন।" মনের দুই কথাই কিছু আর সত্য হ'তে পারে না; হয় ওটা সত্য—নয় এটা সত্য। তবেই হইতেছে যে, দেবদত্তের তখনকার সেই যে স্বাধীনতা-বোধ এবং এখনকার এই যে পরাধীনতা-বোধ– দুইই তাঁহার দুই বিভিন্ন অবস্থার উপযোগী দুইপ্রকারের মনের ভাব, তা বই আর-কিছুই নহে। তাহার পরে মনে কর, অস্ত-দিবাকরের সঙ্গে সঙ্গে যখন তাঁহার স্বাধীনতাবোধ অস্তমিত হইল, তখন তিনি সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ দেখিয়া তাহার তলে বোঁচকা ঠেলান দিয়া বসিলেন—বসিয়া শ্রমাপনোদন করিতেছেন ইতিমধ্যে জনৈক অপরিচিত পথিক তাঁহার দুই-হাত অন্তরে সেই বটবৃক্ষের আর এক পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিল।

দেবদত্তের মনোমধ্যে দুইটি কথা কাঁধ ধরাধরি করিয়া উপস্থিত হইল। একটি কথা এই যে, বোঁচকার ভিতরে চারি পাঁচভরি স্বর্ণালঙ্কার রহিয়াছে; আর একটি কথা এই যে, পার্শ্বের লোকটির মুখের আকার-প্রকার ভাল নহে; তা ছাড়া তাহার হাতের লাঠির আয়তনের পরিমান কিছু যেন মাত্রাতীত। দেবদত্ত যে, স্থানান্তরে উঠিয়া যাইবেন সে শক্তি তাঁহার নাই; তাহাতে আবার নিদ্রার আকর্ষণে তাহার চক্ষু বুজিয়া আসিতেছে।

কিন্তু নিদ্রাকে কোনোমতেই আসিতে দেওয়া হইবে না” এই তাহার প্রতিজ্ঞা। তাঁহার মনের ভাব এই যে, “কি জানি! হাতের যষ্টির সহিত মুখের চেহারার অমন যখন মিল, তখন “বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ! কিন্তু নিদ্রাকুহকিনীকে তিনি কত ঠেকাইয়া রাখিবেন! যেই একটু ফাঁক পাইতেছে—অমনি নিদ্রা চুপি চুপি আসিয়া চক্ষুর কপাটে কুলুপ আঁটিয়া মস্তকের ভার বোঁচকার দিকে ঢুলাইয়া দিতেছে; মস্তক বট-বৃক্ষের গায়ে ঠোকর খাইয়া সচকিতভাবে স্থানে উঠিয়া দাঁড়াইতেছে; আর তৎক্ষণাৎ দেবদত্তের তন্দ্রা ভাঙিয়া যাওয়াতে দেবদত্ত বোঁচকাটিকে আপনার আয়ত্তের মধ্যে সরাইয়া আনিয়া সাবধান করিয়া রাখিতেছেন। নিদ্রা কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহে—নিদ্রা অপ্রতিহত উদ্যমের সহিত আক্রমণের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিতেছে। এমন-সময় দেবদত্তের একজন পুরাতন বন্ধু সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন—তিনি দেবদত্তকে দেখিয়া মহা-আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন। দেবদত্ত সেখানে গিয়া চির পরিচিত বন্ধুবর্গের মাঝখানে স্বাধীনতার স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইলেন - মনের সুখে ঘুমাইয়া বাঁচিলেন। দেবদত্তের যাত্রারম্ভ হইতে বন্ধুভবনে উপনীত হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার স্বাধীনতা-বোধের পথের সমাচার যদি জিজ্ঞাসা কর তবে তাহা এই :—

যাত্রাকালে দেবদত্ত আপন শরীরে বলের স্ফূর্ত্তি এবং মনে আনন্দের স্ফূর্ত্তি প্রচুর পরিমাণে অনুভব করিয়াছিলেন। স্ফূর্ত্তিই অনুভব করিয়াছিলেন—স্ফূর্ত্তির বাধা অনুভব করেন নাই। তিনি তখন মনে করিয়াছিলেন যে, আমার এ স্ফূর্ত্তি বাহিরের কোনো-কিছুর বশতাপন্ন নহে—ইহারই নাম স্বাধীনতাবোধ। দেবদত্তের এই প্রথম উদ্যমের স্বাধীনতাবোধের প্রধান কারণ শরীরের স্বাস্থ্য। শরীর যদি কোনো অংশে অসুস্থ হয়, তবে যে অংশে তাহা অসুস্থ, সেই অংশে তাহা দেহী ব্যক্তির পর।

পক্ষান্তরে, সম্পূর্ণ সুস্থ শরীর দেহী ব্যক্তির আপনার তো বটেই—তা ছাড়া তাহা একপ্রকার দ্বিতীয় আপনি। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে, শরীর আছে এবং আমি আছি, এ দুয়ের ভিন্নতা বোধ থাকে না। সুস্থ শরীর দেহী ব্যক্তির দ্বিতীয় আপনি বলিয়া—সুস্থ শরীরের পরিধির মধ্যে দেহী ব্যক্তি একপ্রকার সহজ স্বাধীনতা অনুভব করে। এই সহজ স্বাধীনতা, ইহার মধ্যে আছি'র সহিত আছি'র ঐক্য কোন্‌খানঠায়, তাহা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহার ঠিকানা পাওয়া যাইতে পারে এইরূপে ঃ—

দেহী ব্যক্তি দেহী বোধের এপারে থাকিয়া বলিতেছে যে, আমি আছি এবং আমার দেহ আছে। । দেহী ব্যক্তি যে বলিতেছে "আমি আছি," এইটিই দেহী ব্যক্তির হওয়া কথা ; পক্ষান্তরে—"দেহ আছে," এটা দেহী ব্যক্তির দেখা-কথা ; দেহী ব্যক্তির এই দেখা কথা ব্যতীত—দেহের নিজের একটি হওয়া কথা আছে। কেন না, দেহ একপ্রকার অশাব্দিক ভাষায় বলিতেছে যে, আমি আছি ; আর দেহী শাব্দিক ভাষায় তাহার অনুবাদ করিয়া বলিতেছে যে, দেহ আছে। এখন বক্তব্য এই যে, একদিকে অশাব্দিক ভাষায় দেহ বলিতেছে আমি আমি আছি, এবং আর-একদিকে শাব্দিক ভাষায় দেহী বলিতেছে আমি আছি। এই যে দুই দিকের দুই আছি—সুস্থ-শরীরে এই দুই আছি এক আছি'রই সামিল হইয়া দাড়ায় ; কাজেই—এ-আছি ও-আছি কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয় না বলিয়া দেহী ব্যক্তি স্বাধীনতা অনুফব করে। এইরূপে দেহ-আত্মা (যাহার শাস্ত্রীয় নাম ভূতাত্মা এবং দেহি আত্মা (যাহার শাস্ত্রীয় নাম বিজ্ঞানাত্মা) এই দুই আত্মা যখন একাত্মা হইয়া যায় তখন সেই একাত্মভাব হইতে একপ্রকার অবাধিতস্ফূর্ত্তি জন্মগ্রহণ করে ; আর, দেহ-দেহীর সেই যে একাত্মভাব. তাহাই এখানেদেহের এ-পিটের আছি'র সহিত ও-পিটের আছি'র ঐক্য বলিয়া নির্দেশিত হইতেছে।

প্রথম উদ্যমে দেবদত্ত শরীরকে যতটা আপনার মনে করিয়াছিলেন, ক্রমে দেখিলেন শরীর ততটা আপনার নহে। পরিশেষে যখন দেখিলেন যে, তাঁহার পদদ্বয় তাঁহার কথার অবাধ্য হইয়া—তিনি যত বলিতেছেন "চলো" সে দুই ভ্রাতা ততই বলিতেছে "চলিতে পারি না," তখন তাঁহার স্বাধীনতা বোধের বক্ষ একেবারেই দমিয়া গেল। তাহার পরে যখন তিনি বটবৃক্ষ-তলে নিষণ্ণ হইয়া বাহিরের লাঠিয়াল এবং অন্তরের নিদ্রা দুয়ের কাহাকে সাম্‌লাইবেন, তাহা ভাবিয়া পাইতেছেন না, তখন কত যে তিনি পরাধীন, সে বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ শিক্ষালাভ হইল। তাহার পরে যখন তিনি বন্ধু-ভবনে সুবিশ্বস্ত চিত্তে মনের কপাট খুলিয়া সুখে শয়ন করিলেন, তখন দেখিলেন যে, তাঁহার চারিদিকের লোকেরা সকলেই তাঁহার আপনার লোক—কেহই তাঁহার পর নহে। তা ছাড়া—ধনঞ্জয়-নামক গৃহকর্ত্তা তাঁহার পরম বন্ধু—একপ্রকার দ্বিতীয় আপনি। এই সকল কারণে—পথের মাঝখানে তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছেন সেই যে তাঁহার আদরের ধন স্বাধীনতা, এক্ষণে তাহা তিনি শুধসুদ্ধ ফিরিয়া পাইলেন। এক্ষণে আছি'র সহিত আছি'র ঐক্য অতীব সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিল। বন্ধুপ্রাপ্তির এ-পারে দেবদত্তের আমি আছি এবং ওপারে ধনঞ্জয়ের আমি আছি. এই দুই আছি একীভূত হইয়া দেবদত্তের অন্তঃকরণে স্বাধীনতার কপাট উন্মুক্ত করিয়া দিল। দেবদত্ত যাত্রাকালে যেরূপ স্বাধীনতা অনুভব করিয়াছিলেন, তাহার গোড়ার কথা দেহের আছি'র সহিত দেহীর আছি'র ঐক্য; এক্ষণে বন্ধু-ভবনে তিনি যেরূপ স্বাধীনতা অনুভব করিতেছেন, তাহার গোড়ার কথা বন্ধুবর্গের আছি'র সহিত আছি'র ঐক্য। কিন্তু এ দুইপ্রকার প্রাচীরের ঘের-দেওয়া স্বাধীনতা ব্যতীত আর-একপ্রকার স্বাধীনতা আছে যাহার পদবী অতীব উচ্চ; এত উচ্চ যে বর্ত্তমান কালের সভ্যতার অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, তাহাতে তাহাকে নাগাল পাওয়া দুষ্কর। সেটি হ'চ্চে

পরমার্থিক স্বাধীনতা—যাহার আর এক নাম মুক্তি। দেহ যেমন দেহীর আপনার, গেহ যেমন গেহী'র আপনার, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তেমনি ভগবদ্‌ভক্ত সাধু পুরুষের আপনার। পরিবারস্থ আত্মীয়স্বজনেরা যেমন গৃহী ব্যক্তির দ্বিতীয় আপনি, পরমাত্মা তেমনি ভক্ত জীবাত্মার দ্বিতীয় আপনি। জীবাত্মা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের আছি, পরমাত্মা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আছি—এই দুই আছি'র ঐক্যের ভিতরে সমস্ত আছি'র সহিত আছি'র ঐক্য সম্ভুক্ত রহিয়াছে আর, প্রত্যেক মনুষ্যের স্বাধীনতা বোধ সেই ঐক্যের অস্ফুট আভাস। এই অস্ফুট স্বাধীনতার ভাব যাহা প্রত্যেক মনুষ্যের ভিতরে-ভিতরে কার্য্য করিতেছে, তাহাই লৌকিক ধর্ম্মের ভিত্তিমূল ; আর তাহা যেমন ভগবদ্‌ভক্ত সাধুব্যক্তির মনোমধ্যে সুপরিস্ফুট আকার ধারণ করে, তখন তাহাই পরমার্থিক ধর্ম্মের ভিত্তিমূল এবং মুক্তির সোপান। লৌকিক ধর্ম্ম বলিতেছি কাহাকে ? যে-ধর্ম্মের দৃষ্টি ফলাফলের রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহার উর্দ্ধে ওঠে না, তাহারই নাম লৌকিক ধর্ম্ম। পরমার্থিক ধর্ম্ম বলিতেছি কাহাকে ? যে ধর্ম্মের দৃষ্টি ফলাফলের রাজ্য ছাড়াইয়া উঠিয়া নিষ্কাম-ভক্তি সহকারে পরমেশ্বরের প্রতি নিস্তব্ধ হয়, তাহারই নাম পারমার্থিক ধর্ম্ম। লৌকিক ধর্ম্মের গোড়া'র কথা হচ্চে মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ঈশ্বরের বিশ্বাস ; এক কথায় ঈশ্বর-বিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞান। পারমার্থিক ধর্ম্মের গোড়া'র কথা হ'চ্চে—ঈশ্বরকে আপনার হইতেও আপনার বলিয়া জানা ; এক কথায়—পরম-প্রীতিভক্তি-সহকৃত অপরোক্ষ জ্ঞান।

পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রায়ই ঈশ্বরতত্ত্ব হইতে স্বতন্ত্ররূপে আলোচিত হইয়া থাকে, আর, সেই গতিকে ধর্ম্মতত্ত্ব এরূপ একটা গোড়া-নাই-আগা-রকমের ধরিতে-ছুঁতে-পাওয়া-না- যাইবার কথা হইয়া দাঁড়ায় যে, তাহা 'ন দেবায় ন ধর্ম্মায়' অর্থাৎ কাহারো কোনো উপকারে আসে না। আমাদের দেশের ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা পদ্ধতি স্বতন্ত্র। আমাদের দেশের

ধর্ম্মশাস্ত্রে ভগবদভক্তি এবং ধর্ম্মনীতির (piety এবং moralityর) হর-গৌরীর ন্যায় যুগলাঙ্গভাবে অনুশীলিত হওনের প্রথা চির-প্রচলিত। বারান্তরে আমি দেখাইব যে, আমাদের দেশে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—

(১) সকাম ধর্ম্মতত্ত্ব এবং (২) নিষ্কাম ধর্ম্মতত্ত্ব; আর সেই সঙ্গে দেখাইব যে, সকাম ধর্ম্মের মূল স্বভাবসিদ্ধ ঈশ্বরেতে বিশ্বাস বা পরোক্ষ জ্ঞান; নিষ্কাম ধর্ম্মের মূল বিশিষ্টরূপ ঈশ্বর ভক্তি এবং অপরোক্ষ জ্ঞান।

শক্তি-ঘটিত এবং জ্ঞান-ঘটিত ঐক্য।

আছি'র সহিত আছি'র ঐক্যের কথা এতক্ষণ ধরিয়া এ যাহা বলিলাম তাহা সত্তা-ঘটিত ঐক্য এখন দেখিতে হইবে এই যে, সেই সত্তা-ঘটিত ঐক্যের ভিতরে আর-দুই-প্রকার ঐক্য সন্তুক্ত রহিয়াছে;—একটি হ'চ্চে শক্তি-ঘটিত ঐক্য; আর-একটি হ'চ্চে জ্ঞান-ঘটিত ঐক্য।

শক্তি-ঘটিত ঐক্য কি?—না, কর্ত্তা-কর্ম্মের ঐক্য। জ্ঞান ঘটিত ঐক্য কি?—না, জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের ঐক্য। আমি এবং তুমি উভয়ে যখন মুখা-মুখি দণ্ডায়মান থাকিয়া পরস্পরের চক্ষুর উপরে কার্য্য করিতেছি, তখন আমার কার্য্যের তুমি কর্ম্মক্ষেত্র, এবং তোমার কার্য্যের তুমি কর্ত্তা; তথৈব তোমার কার্য্যের আমি কর্ম্মক্ষেত্র, এবং আমার কার্য্যের আমি কর্ত্তা। এরূপ অবস্থায় তুমিও যেমন আমিও তেমনি, উভয়েই কর্ত্তা এবং কর্ম্ম দুইই একাধারে। ইহারই নাম কর্ত্তাকর্ম্মের ঐক্য। তেমনি আবার, তোমার জ্ঞানের তুমি জ্ঞাতা, আমি জ্ঞেয়; আমার জ্ঞানের আমি জ্ঞাতা, তুমি জ্ঞেয়। উভয়েই আমরা জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় দুইই একাধারে। ইহারই নাম জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের ঐক্য।

উভয়াত্মক ঐক্যের সুস্পষ্টরূপে ঠিকানা-নির্দ্দেশ করিবার জন্য দুই

আমিকে দুই দিক্ হইতে যোটপাট করিয়া আনিয়া মুখামুখি দাঁড় করানো হইল। কিন্তু দুই আমিকে দুই দিক্ হইতে ডাকিয়া আনা বাড়া'র ভাগ; এক আমি'র ভিতরেই আমি এবং তুমি, এই দুই আমি মুখামুখি দণ্ডায়মান, আর সেই সঙ্গে দোঁহার মধ্যে শক্তি ঘটিত এবং জ্ঞান ঘটিত ঐক্য সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান। তার সাক্ষী রামপ্রসাদের এই একটি গীত:—

"মন তুমি কৃষি-কাজ জান না।
এমন মানব-জমিন রৈল প'ড়ে,
আবাদ ক'লে ফ'লতো সোণা।"

কর্ত্তাকর্ম্মের ঐক্য

এখানে এক আমি'র ভিতরেই দুই আমির—ভৃত্য আমি এবং প্রভু আমির বোঝাপড়া চলিতেছে।

মনে কর একজন গায়ক গান করিতেছে। গাওনা হ'চ্চে একটি ক্রিয়া তাহার মূল হ'চ্চে গায়ক স্বয়ং এবং তাহার ফল হ'চ্চে গীতধ্বনি। এইরূপ যে মূল এবং ফল, কর্ত্তা এবং কর্ম্ম, দুয়ের ঐক্য ব্যতিরেক গাওনা-ক্রিয়া চলিতে পারে না। গাওনা ক্রিয়ার বীজ গায়কের কণ্ঠনালীর পথ দিয়া অঙ্কুরিত হয়, এবং গাওনা-ক্রিয়ার ফল গায়কের শ্রবণ পথ দিয়া মনোমধ্যে প্রবেশ লাভ করে; দুই পথই উন্মুক্ত থাকা চাই, তবেই গাওনা-ক্রিয়া চলিতে পারে। যদি গায়কের শ্রবণদ্বারে কপাট পড়িয়া যায়, তাহা হইলেও যেমন, আর যদি কণ্ঠনালীতে কপাট পড়িয়া যায়, তাহা হইলেও তেমনি; দুয়ের একটিতে কপাট পড়িলেই গাওনা-ক্রিয়া তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া যায়! এখন জিজ্ঞাস্য এই—কোন্‌খানেই বা গাওনা-ক্রিয়ার বীজধান হইয়াছে, আর, কোন্‌খানেই বা গাওনা-ক্রিয়ার ফলধান হইতেছে? স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, গায়কের অন্তঃকরণেই গাওনা-ক্রিয়ার বীজ রোপিত হইয়াছে, গায়কের অন্তঃকরণ হইতেই গাওনা-ক্রিয়ার বীজ অঙ্কুরিত

হইতেছে, গায়কের অন্তঃকরণেই গাওনা-ক্রিয়ার ফল ফলিত হইতেছে। একই অন্তঃকরণ-ক্ষেত্রে কর্ত্তার কর্তৃত্ব এবং কর্ম্মের ফল একযোগে অভিব্যক্ত হইয়া একীভূত হইয়া যাইতেছে ; আর, সেই কারণে গায়কের মনে দুই-ভাবের আনন্দ গঙ্গাযমুনার ন্যায় দুই দিক হইতে আসিয়া দুয়ে মিলিয়া এক আনন্দে পরিণত হইতেছে ; এক ভাবের আনন্দ হচ্চে কর্ম্মানন্দ আর এক ভাবের আনন্দ হ'চ্চে ভোগানন্দ। কর্ম্মানন্দের সাক্ষাৎ কারণ হ'চ্চে কর্ত্তার কর্তৃত্বস্ফূর্ত্তি, ভোগানন্দের সাক্ষাৎ কারণ হচ্চে কর্ম্মের ফলাস্বাদন। গীত-ধ্বনির উৎসারণে কর্ত্তার কর্তৃত্ব স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, গীতধ্বনির রসাস্বাদনে কর্ম্মের ফল ফলিত হইতেছে। গায়কের অন্তঃকরণে গাওনা-ক্রীয়ার বীজ এবং ফল (কর্ত্তার কর্তৃত্ব এবং কর্ম্মের ফল) একীভুত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মানন্দ এবং ভোগানন্দ একীভূত হইয়া যোগানন্দে পরিণত হইতেছে। বলিলাম "যোগানন্দ"! তাহার অর্থ আর কিছু না—কর্ত্তার কর্তৃত্ব স্ফূর্ত্তি এবং কর্ম্মের ফলভোগ, এই দুয়ের যোগজনিত আনন্দ। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, গায়ক যখন ভাবে মশ্‌গুল হইয়া গান করে, তখন গাওনা-ক্রিয়ার কর্ত্তা যিনি গায়ক, এবং গাওনাক্রিয়ার কর্ম্ম যে গীতধ্বনি, দুয়ের মধ্যে ব্যবধান বিলুপ্ত হইয়া গিয়া দুয়ে মিলিয়া এক হইয়া যায়। এমন কি, তেমন একজন প্রতিভাশালী গায়ক যখন চতুর্দ্দিকের শ্রোতৃমণ্ডলীর সহিত একাত্মা হইয়া গান করেন, তখন শ্রোতৃমণ্ডলী মনে মনে তাঁহার সহিত গানকার্য্যে যোগ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না ; আর, তাহাতে রঙ্গশালা দেখিতে ত্থাখায় এইরূপ—যেন সমস্ত মণ্ডলী একই গায়ক এবং একই শ্রোতা, এবং প্রত্যেক শ্রোতা যেন সমস্ত মণ্ডলী একাধারে। এরূপ মন্ত্রমুগ্ধ অবস্থায় এক গায়ক একশত শ্রোতার সঙ্গে মিলিয়া একা একশত হইয়া আপনার গানের আপন রসাস্বাদন করে, এবং একশত শ্রোতা এক গায়কের সঙ্গে মনে মনে গানে যোগ দিয়া এক

গায়ক হইয়া উঠে ; কাচপোকার প্রভাবে আর্সুলা যেমন কাচপোকা হইয়া উঠে, একের প্রভাবে অনেকে তেমনি এক হইয়া উঠে। কর্ত্তা-কর্ম্মের মধ্যে এ যেমন দেখিতে পাওয়া গেল—জ্ঞাতাজ্ঞেয়ের মধ্যেও উভয়াত্মক ঐক্যের স্ফূর্ত্তি ঠিক্ সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়।

জ্ঞাতা-জ্ঞানের ঐক্য।

গায়ক যখন গান করিতেছে, তখন গায়ক জানিতেছে যে. আমিই গান করিতেছি। এরূপ স্থলে গায়ক কাহাকে গায়ক বলিয়া জানিতেছে ? জ্ঞেয় কে ? গায়ক আপনাকেই গায়ক বলিয়া জানিতেছে—গায়ক আপনিই জ্ঞেয়। কে আপনাকে গায়ক বলিয়া জানিতেছে—জ্ঞাতা কে ? গায়ক আপনিই জ্ঞাতা। গায়ক আপনিই জ্ঞেয়, আপনিই জ্ঞাতা। তা ছাড়া, গায়ক যখন গীতরসের বিদ্যুৎপ্রবাহে শ্রোতৃমণ্ডলীর মনকে গলাইয়া আপনার মনের সহিত একীভূত করিয়া ফ্যালে, তখন গায়কের জ্ঞানে আপনি এবং আপনার শ্রোতৃমণ্ডলী, এ দুয়ের মধ্যস্থিত প্রভেদের প্রাচীর ভগ্ন হইয়া গিয়া জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের উভয়াত্মক ঐক্য সমস্ত ঘরময় ব্যাপিয়া স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এইরূপ যখন উভয়াত্মক ঐক্য স্ফূর্ত্তি পায়—কর্ত্তাকর্ম্মের মধ্যে স্ফূর্ত্তি পায়—জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের মধ্যে স্ফূর্ত্তি পায়, তখন সে ঐক্য কি অকস্মাৎ আকাশ হইতে নিপতিত হয়, অথবা যাহা ইতিপূর্ব্বে প্রসুপ্ত ছিল, তাহাই জাগ্রত হইয়া উঠে ?

এ প্রশ্নের রীতি মত মীমাংসা করিতে হইলে—বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড এবং ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞাতি জ্ঞেয়-সম্বন্ধই বা কিরূপ, দুইয়ের মধ্যে ঐক্যই বা কিরূপ, ঐক্য এবং সে ঐক্য বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড হইতে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে কিরূপেই বা সংক্রামিত হয়, তাহার প্রতি বিধিমতে অনুসন্ধান প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

আমরা প্রত্যেকে একএকটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ; এবং সমস্ত ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড

ক্রোড়ে করিয়া যে এক নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল ব্যাপিয়া বিরাজমান, তাহাই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড। কাজেই দাঁড়াইতেছে যে, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের যথাসর্ব্বস্ব যাহা কিছু আছে, সমস্তই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড হইতে ধার করিয়া পাওয়া। তার সাক্ষী মনুষ্যের উদরভাণ্ডে যে তণ্ডুলান্ন রহিয়াছে, তাহা ধান্যক্ষেত্রেরই তণ্ডুল; মনুষ্যের রক্তে যে জল রহিয়াছে, তাহা সমুদ্রেরই জল; মনুষ্যের শরীরে যে তেজ রহিয়াছে তাহা অগ্নিরই তেজ; মনুষ্যের নাসিকাপথ দিয়া যে বায়ু যাতায়াত করিতেছে, তাহা বহিরাকাশেরই বায়ু। এতো সকলেরই এক প্রকার দেখা কথা; তা ছাড়া, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন এই যে, প্রথমে পৃথিবী উচ্ছৃঙ্খল ভৌতিক শক্তি সকলের ক্রীড়াক্ষেত্র ছিল। ক্রমে পৃথিবীতে ভৌতিক শক্তির উন্মত্ত নৃত্যলীলার সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প করিয়া জীবনীশক্তির উন্মেষ হইতে লাগিল। উদ্ভিদ্ জন্মিবার পূর্ব্বে পৃথিবীতে শুদ্ধকেবল ভৌতিক শক্তির দল, সংক্ষেপে—ভূতের দল, দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতেছিল, তাহার পরে যখন উদ্ভিদের আদিম স্তর পঙ্ক শয্যা হইতে অল্পে অল্পে গাত্রোত্থান করিয়া জলস্থলের অন্ধিসন্ধি প্রদেশসকল শ্যামলচ্ছদে আবরণ করিতে লাগিল এবং তাহার পরে সেই নূতন ব্যাপারটি যখন জলের কিনারা হইতে ক্রমে ক্রমে ডাঙা বাহিয়া উঠিয়া দেশ বিদেশ ব্যাপিয়া দলে দলে সাজিয়া দাড়াইতে লাগিল, তখন পৃথিবী একবিধ শক্তির পরিবর্ত্তে দ্বিবিধ শক্তির লীলাক্ষেত্র হইল—ভৌতিক শক্তি এবং জীবনী শক্তি, এই দুইপ্রকার শক্তির লীলাক্ষেত্র হইল। তাহার পরে যখন উদ্ভিদ্‌শ্রেণী নানাবর্ণের ফলফুলপল্লবের বিচিত্রবেশে সজ্জিত হইতে লাগিল এবং জলচর, ভূচর, খেচর প্রভৃতি নানা জন্তু পঙ্ক হইতে, অণ্ড হইতে, জরায়ু হইতে কালে-কালে বাহির হইয়া পালে-পালে বিচরণ করিতে লাগিল, আর, সেইসঙ্গে গিরি-গুহা-অরণ্য গর্জ্জণরবে এবং বৃংহিতরবে, গহনবন ঝিল্লিরবে, পুষ্পমঞ্জরী গুঞ্জরিত রবে, লতাকুঞ্জ কূজিত রবে, তৃণভূমি

হম্বারবে, বিস্তীর্ণ প্রান্তর হ্রেষারবে শব্দায়মান হইতে লাগিল, তখন পৃথিবী দ্বিবিধ শক্তির পরিবর্ত্তে ত্রিবিধ শক্তির লীলাক্ষেত্র হইল—ভৌতিক শক্তি, জীবনী শক্তি এবং চেতনাশক্তি, এই তিন প্রকার শক্তির লীলাক্ষেত্র হইল। সর্ব্বশেষে যখন মনুষ্য বাহির হইয়া প্রথমে হামাগুড়ি দিতে লাগিল, এবং ক্রমে উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান হইয়া চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া গন্তব্যপথে চলিতে লাগিল এবং তাহার পরে যখন বিচারবিবেচনা এবং যুক্তি খাটাইয়া সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করিতে আরম্ভ করিল, তখন পৃথিবী ত্রিবিধ শক্তির পরিবর্ত্তে চতুর্ব্বিধ শক্তির লীলাক্ষেত্র হইল—ভৌতিক শক্তি, জীবনী শক্তি, চেতনাশক্তি এবং ধীশক্তি, এই চারি প্রকার শক্তির ক্রীড়াক্ষেত্র হইল। এই যে চারিপ্রকার শক্তি—ভৌতিক শক্তি, জীবনী শক্তি, চেতনাশক্তি এবং ধীশক্তি, এ চারিপ্রকার শক্তির প্রথমে প্রথমটি একাকী, তাহার পরে প্রথম এবং দ্বিতীয় যুগ বাঁধিয়া, তাহার পরে প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যোট বাঁধিয়া, পৃথিবীতে যথাক্রমে পরে পরে আবির্ভূত হইল, এবং পরিশেষে যখন প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয়ের উপরে চতুর্থ আবির্ভূত হইল, তখন সর্ব্বপ্রকার শক্তি একত্র সমবেত হইয়া মনুষ্য-শরীরের আশ্রয় গ্রহণ করিল। অর্থাৎ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে যতপ্রকার শক্তি আছে—ভৌতিক শক্তি, জীবনী শক্তি, চেতনাশক্তি এবং ধীশক্তি—সমস্তেরই কিছু-না-কিছু নিদর্শন ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে পুঞ্জীভূত হইল; কোনো প্রকারেরই সংগ্রহকার্য্য অবশিষ্ট রহিল না। শেষরাত্রে প্রত্যুষের হ'ব হ'ব সময়ে পক্ষিকুলের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়, ইহা সকলেরই দেখা কথা। সেই দিবা এবং রাত্রির সন্ধিস্থানে সূর্য্যের উদ্বোধনী শক্তি (অর্থাৎ ঘুমভাঙানি শক্তি) একাকী অভিব্যক্ত হয়; দ্যোতনাশক্তি, তাপনশক্তি এবং দাহিকা শক্তি অনভিব্যক্ত থাকে। তাহার কিছুকাল পরে যখন প্রত্যূষ ফুটিয়া বাহির হয়, তখন সূর্য্যের উদ্বোধনী শক্তির উপরে আর-একটি শক্তি

অভিব্যক্ত হয়—সেটি হ'চ্চে দ্যোতনাশক্তি। এই সময়টিতে অর্থাৎ প্রত্যুষের দিবালোকে, সূর্য্যের দুইপ্রকার শক্তি অভিব্যক্ত হয় এবং দুইপ্রকার শক্তি অনভিব্যক্ত থাকে;—উদ্বোধনী শক্তি এবং দ্যোতনাশক্তি অভিব্যক্ত হয়, তাপনী শক্তি এবং দাহিকা শক্তি অনভিব্যক্ত থাকে। মধ্যাহ্নদিবালোকে সূর্য্যের তিনপ্রকার শক্তি অভিব্যক্ত হয়—একপ্রকার শক্তি অনভিব্যক্ত থাকে; উদ্বোধনী শক্তি, দ্যোতনাশক্তি এবং তাপনী শক্তি অভিব্যক্ত হয় —দাহিকা শক্তি অনভিব্যক্ত থাকে। তাহার পরে যদি প্রদাহক কাচের (Burning glassএর) মধ্য দিয়া সূর্য্যরশ্মিকে বস্ত্রাদির উপরে পুঞ্জীভূত করা যায়, তাহা হইলে সেই পুঞ্জীভূত সূর্য্যরশ্মিতে সূর্য্যের সর্ব্বাঙ্গীণ শক্তি অভিব্যক্ত হয়—উদ্বোধনী শক্তি, দ্যোতনাশক্তি, তাপনী শক্তি এবং দাহিকা শক্তি, এই চারিপ্রকার শক্তি একযোগে অভিব্যক্ত হয়। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে তেমনি (অর্থাৎ মনুষ্যরাজ্যে তেমনি) বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বাঙ্গীণ শক্তি অভিব্যক্ত হইয়াছে—ভৌতিক শক্তি, জীবনী শক্তি, চেতনাশক্তি, এবং ধী-শক্তি, এই চারিপ্রকার শক্তি অভিব্যক্ত হইয়াছে। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের চারি কোষ হ'চ্চে (১) ভৌতিক শক্তির আধার—ভূতকোষ; (২) ভৌতিক শক্তি এবং জীবনী শক্তি দুয়ের একাধার—উদ্ভিদকোষ; (৩) ভৌতিকশক্তি, জীবনী শক্তি এবং চেতনাশক্তি তিনের একাধার—পশ্বাদি-কোষ; (৪) ভৌতিকশক্তি, জীবনী শক্তি, চেতনাশক্তি এবং ধীশক্তি, এই চতুর্ব্বিধ শক্তির একাধার—মানবকোষ। তেমনি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের চারি কোষ হ'চ্চে (১) ভৌতিক শক্তির আধার অস্থিমাংস প্রভৃতি অন্নময় কোষ; (২) ভৌতিকশক্তি এবং জীবনী শক্তি দুয়ের একাধার—প্রাণময় কোষ (বলা যাইতে পারে Vegitative system); (৩) ভৌতিকশক্তি, জীবনীশক্তি এবং চেতনাশক্তি তিনের একাধার—মানোময় কোষ (Animal system বা Nervous system); (৪) ভৌতিক-

শক্তি, জীবনী শক্তি, চেতনাশক্তি এবং ধীশক্তি—এই চতুর্বিধ শক্তির একাধার—বিজ্ঞানময় কোষ (Brain)। ইহাই হিরণ্ময় কোষ। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময় কোষ হ'চ্চে জগতের আদিম-প্রকাশ বা আদি সূর্য্য।* তা ছাড়া, চতুর্বিধ শক্তির সামঞ্জস্যের এবং ঐক্যের একটি কেন্দ্রস্থান বা সন্ধিস্থান বা লয়স্থান বা সমাধিস্থান আছে—সেটা হ'চ্চে আনন্দময় কোষ। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সহিত ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের এইরূপ থাপে-থাপে মিল রহিয়াছে যখন, মিল রহিয়াছে—তখন ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভূত ভৌতিক শক্তি, জীবনীশক্তি, চেতনাশক্তি ধীশক্তি এবং হ্লাদিনীশক্তির একত্র সমাবেশ জনিত যে এক জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ের এবং কর্ত্তাকর্ম্মের উভয়াত্মক ঐক্য অনুভূত হয় ও সেই ঐক্যে ভর দিয়া যে এক "আমি আছি" দণ্ডায়মান হয়, সেই যে উভয়াত্মক ঐক্য এবং সেই যে "আমি আছি," দুইই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সার্ব্বাত্মক ঐক্য এবং সর্ব্বব্যাপী আমি আছি হইতে আসিয়াছে—তা বই, তাহা অকস্মাৎ আকাশ হইতে নিপতিত হয় নাই—ইহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে।

* উপরে যে কথাটির অবতারণা করা হইল, তাহা ভাঙিয়া বলিতে হইলে এক অধ্যায়ে তাহার স্থানসঙ্কুলান হওয়া দুর্ঘট। উপনিষদে আছে—"হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্‌যদাত্মবিদো বিদুঃ॥" হিরণ্ময় পরম কোষে বিরজ অখণ্ড ব্রহ্ম অবস্থিতি করেন—সেই শুভ্র জ্যোতির জ্যোতি—যাঁহাকে আত্মবিদেরা জানেন। ইহাতেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড এবং ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড দুয়েরই হিরণ্ময় কোষে ব্রহ্ম অবস্থিতি করেন, যেহেতু তিনি অখণ্ড। এটাও ভাবে বলা হইয়াছে যে, হিরণ্ময় কোষ এক হিসাবে যেমন সর্ব্বজগতের কেন্দ্রস্থান, আর-এক হিসাবে তেমনি সর্ব্বজগতে পরিব্যাপ্ত। ফলে, উহা সেইরূপ-এক অনির্ব্বচনীয় জ্যোতির্ম্মণ্ডল, যাহার উপলক্ষে পাশ্চাত্য প্রদেশীয় Augustine ঋষি বলিয়াছেন—"whose centre is every where but circumference nowhere" কেন্দ্র যাহার সকল স্থানেই—পরিধি যাহার কোনো স্থানেই নাই।

জ্ঞেয়স্থানের কেন্দ্র।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড এবং ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া সেই যে এক সর্ব্বতঃপ্রসারিত অখণ্ডনীয় ঐক্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সর্ব্বত্র ওতপ্রোত, তাহার নামই বা কি, আর তাহা পদার্থটাই বা কি?

উপরি-উক্ত ঐক্যের একটা নাম দিতে হইলে "সর্ব্বাত্মক ঐক্য" এই নামটি আপাততঃ চলিতে পারে। সর্ব্বাত্মক ঐক্য কি? না, ইংরাজিতে যাহাকে বলে Organic Unity.

উচ্চশ্রেণীর জীবশরীরে, বিশেষত মনুষ্যশরীরে, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, নবদ্বার-পুরের ঘাটিতে ঘটিতে মস্তিষ্কের সন্তান সন্ততির পাহারা বসানো রহিয়াছে। তার সাক্ষী বাহুখণ্ড দেখ, দেখিবে—এক প্রহরী বাহুর মূলগ্রন্থিতে, এক প্রহরী কনুইস্থানে, এক প্রহরী মণিবন্ধে, পাঁচ-পাঁচ প্রহরী পাঁচ-পাঁচ অঙ্গুলিমূলে—নির্নিমেষনয়নে জাগিতেছে। এক-এক প্রহরী এক একটি ক্ষুদ্র মস্তিষ্কপিণ্ড। আনখাগ্র বাহুখণ্ডে এ যেমন দেখা গেল—আপাদমস্তক সর্ব্বশরীরেই তেমনি। মস্তকের মূলতম মস্তিষ্ক হইতে বাহির হইয়া মেরুদণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মস্তিষ্কপিণ্ডের মধ্য দিয়া বিংশতি অঙ্গুলির বিংশতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মস্তিষ্কনিকর পর্য্যন্ত যে একটি নিরবচ্ছিন্ন অখণ্ড ঐক্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিব্যপ্ত রহিয়াছে, তাহারই নাম দেওয়া হইল সর্ব্বাত্মক ঐক্য। মস্তকের সহস্রদল পদ্মে সেই ঐক্যই যোগাসনে-বিরাজমান; হৃৎপদ্মে সেই ঐক্যই রাজসিংহাসনে-বিরাজমান; নাভিপদ্মে সেই ঐক্যই আহরণ-ব্যাহরণ (আমদানি-রপ্তানি) প্রভৃতি বাণিজ্যকার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক! সেই ঐক্যই রাজা, মন্ত্রী, কর্ম্মচারী; রথী, সারথি, পদাতিক; যোগী, ভোগী, জ্ঞানী, কর্ম্মী; সমস্তই একাধারে। সে ঐক্যের চক্ষু সকল স্থানেই—হস্ত সকল কাজেই। পদের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে যদি আঘাত লাগে,

তবে সে ঐক্যের তৎক্ষণাৎ তাহা গোচরে আসিবে ; হস্তে যদি আঘাত লাগে, তাহা হইলেও তাই ; বক্ষে যদি আঘাত লাগে, তাহা হইলেও তাই। তেমনি আবার, হস্ত হইতে যদি অক্ষররাজি বাহির হয়, তবে ইহা সুনিশ্চিত যে, তাহা শরীরের সর্ব্বাত্মক ঐক্য হইতেই বাহির হইতেছে ; পদ হইতে যদি ভ্রমণকার্য্য বাহির হয়, তাহা হইলেও তাই ; কণ্ঠ হইতে যদি গীতধ্বনি বাহির হয়, তাহা হইলেও তাই। এই যে এক সর্ব্বাত্মক ঐক্য, যাহা শরীরের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রত্যেকের অভাব সমস্তকে দিয়া এবং সমস্তের অভাব প্রত্যেককে দিয়া যুগপৎ পূরণ করাইয়া লইতেছে—এ ঐক্য কি কেবল ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেই আছে, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে নাই ? বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে যদি নাই—ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে আসিল তবে তাহা কোথা হইতে ? যাহাকে বলা যাইতেছে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড, তাহা আর-তো কিছু না—কেবল বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের একস্থানের একটা শাখা। শাখাতে রসের সঞ্চার হয় কোথা হইতে ? অবশ্য মূল হইতে।

তুমি হয় তো বলিবে যে, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের মস্তক হইতে পদপ্রান্ত বড়-জোর সাত-হাত দূরে অবস্থিতি করে ; কিন্তু বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের নভস্তল হইতে রসাতল কোটি-কোটি-যোজন দূরে অবস্থিতি করে। সাত-হাত স্থানের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান পূরণ করা সহজেই হইতে পারে কিন্তু কোটি যোজনের ব্যবধান পূরণ করা সোজা কথা নহে। কোটি যোজনের দুই পারের দুই বস্তুকে আঁকড়িয়া পাইতে হইলে—তাহা যিনি করিবেন, তাঁহার দৃষ্টি স্বর্গমর্ত্ত্য-পাতাল ভেদ করিতে পারিবার মতো তীক্ষ্ণ হওয়া চাই ; তাঁহার বাহুদ্বয় স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল পরিবেষ্টন করিতে পারিবার মতো দীর্ঘ হওয়া চাই। ইহার উত্তর এই যে, কিছুই চাই না—কেবল চক্ষু-দুটা উন্মীলন করা চাই। সবিতা দেব কি শতকোটিযোজন দূর হইতে পৃথিবীকে অবলোকন করিতেছেন না ? শতকোটিযোজন দূরে থাকিয়াও পৃথিবীর হস্তধারণ

করিয়া রাশিচক্রে দৌড়াদৌড়ি করাইতেছেন না? পিপীলিকার মস্তক এবং পদতলের মধ্যে যেরূপ অল্প ব্যবধান, তাহাতে পিপীলিকা বলিলেও বলিতে পারে যে, হস্তীর পদাঙ্গুলি হস্তীর ললাটশিখর হইতে কোটি যোজন দূরে অবস্থিতি করে, সুতরাং দুয়ের মধ্যে কোনোপ্রকার ঐক্যের বন্ধন স্থান পাইতে পারে না। তবে কিনা—পিপীলিকার যুক্তি পিপীলিকাকেই শোভা পায়—বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতকে শোভা পায় না। কেন না, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের নিকটে একথা গোপন থাকিতে পারে না যে, হস্তীর মস্তক এবং পদের মধ্যে বিশাল ব্যবধান সত্ত্বেও দুয়ের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন যথেষ্ট দৃঢ়, আর, পিপীলিকার মস্তক এবং উদরের মধ্যে অতীব অল্প ব্যবধান সত্ত্বেও দুয়ের মধ্যে বন্ধনের আঁট খুবই আল্‌গা।

যদি এমন হয় যে, একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্য হইতে দশ ভাই দশ দিকে ছট্‌কিয়া পড়িলে ভ্রাতাদিগের কাহারো তাহা বড় একটা গায়ে লাগে না, তবে তাহাতে প্রমাণ হয় এই যে, ভ্রাতাদিগের মধ্যে ঐক্যের বাঁধুনি বড্ড আল্‌গা। কিন্তু যদি এমন হয় যে, দশ ভাইয়ের মধ্য হইতে এক ভাই পৃথক্ হইলে তাহার তো মর্ম্মবেদনা উপস্থিত হয়ই, তা ছাড়া অপর নয় ভাইয়ের প্রত্যেকেরই প্রাণে আঘাত লাগে, তবে তাহাতে প্রমাণ হয় এই যে, ভ্রাতাদিগের মধ্যে ঐক্যের বাঁধুনি অত্যন্ত সুদৃঢ়। অতএব এটা যখন সকলেরই দেখা কথা যে, পিপীলিকার কিংবা বোল্‌তার শরীর মধ্যদেশে দ্বিখণ্ডিত হইলে তাহার পূর্ব্বার্দ্ধ এবং পশ্চার্দ্ধ উভয় খণ্ডই মিনিট-দশেক ধরিয়া জীবিত থাকে; পক্ষান্তরে, হস্তীর সেরূপ হইলে উভয় খণ্ডেরই যুগপৎ প্রাণবিয়োগ হয়; তখন তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, সর্ব্বাত্মক ঐক্যের বন্ধনের আঁট পিপীলিকাদেহে বড়ই আল্‌গা, হস্তীদেহে রীতিমত দৃঢ়। তা ছাড়া, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের মতে এটা একটা নির্ঘাত বেদবাক্য যে, পৃথিবী হইতে সূর্য্য শতকোটিযোজন দূরে অবস্থিতি করা

সত্ত্বেও সূর্য্যের জীবনই পৃথিবীর জীবন, সূর্য্যের আলোকই পৃথিবীর আলোক, সূর্য্যের বলই পৃথিবীর বল। এইজন্য বলিতেছি যে, সর্ব্বাত্মক ঐক্যের নিকটে স্থানাস্থান নাই, কালাকাল নাই, পাত্রাপাত্র নাই, দূর-নিকট নাই, বড় ছোট নাই। কিন্তু কি হিসাবে নাই? সত্তা-হিসাবেই নাই। শক্তি-হিসাবে—স্থানাস্থানও আছে, কালাকালও আছে, পাত্রাপাত্রও আছে, দূর-নিকটও আছে, বড়-ছোটও আছে। তার সাক্ষী—সত্তা হিসাবে (অর্থাৎ শুদ্ধকেবল 'অস্তি নাস্তি' বিবেচনায়) শরীরের সর্ব্বাত্মক ঐক্য মস্তকের উচ্চ শিখরেও যেমন—পদের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতেও তেমনি—উভয় স্থানেই সমান। কিন্তু শক্তিহিসাবে (অর্থাৎ শক্তির কর্ত্তৃস্থানই বা কোথায় এবং কর্ম্মস্থানই বা কোথায়; কে চালক, কে চালিত; এইরূপ চাল্য-চালক বিবেচনায়) শরীরের মধ্যে মস্তকই সর্ব্বাত্মক ঐক্যের প্রধান আসন। সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া সর্ব্বাত্মক ঐক্য একই ঐক্য—এ কথা খুবই সত্য; কিন্তু এ কথাও তেমনিই সত্য যে, সেই একই ঐক্য মস্তকের উচ্চমঞ্চে রথিরূপে অধ্যাসীন রহিয়াছে এবং পদযুগে অশ্বযুগলরূপে যোজিত রহিয়াছে। ফলেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, আপনাকে এক বলিয়া ভাবনা করিবার সময় আমরা মস্তিষ্কমণ্ডলেই মনঃসমাধান করি—পদযুগে মনঃসমাধান করি না।

মস্তিষ্কমণ্ডল যেমন ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বাত্মক ঐক্যের প্রধান আসন, দৃশ্যমান সূর্য্য তেমনি সৌরজগতের সর্ব্বাত্মক ঐক্যের প্রধান আসন, আদিসূর্য্য তেমনি বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বাত্মক ঐক্যের প্রধান আসন। এইজন্য সৌরজগৎকে এক বলিয়া ভাবনা করিতে হইলে সূর্য্যমণ্ডলের প্রতি প্রধানত লক্ষ্যসমাধান করা আবশ্যক হয়;—বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা করেনও তাই। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, সুদূর পুরাকালে সমস্ত সৌর-জগৎ ব্যাপিয়া সূর্য্য একাকী অবস্থিতি করিতেছিলেন; কালক্রমে সূর্য্য

হইতে গ্রহগণ এবং তাহাদের এক ভগ্নী আমাদের এই পৃথিবী মাতা প্রসূত হইলেন। সূর্য্য হইতে পৃথিব্যাদি প্রসূত হইয়াছে বলিয়া সূর্য্যের আর-এক নাম সবিতা কিনা প্রসবিতা।

এ তো গেল পুরাণো কালের পুরাণো কথা। তা ছাড়া, বর্ত্তমানে আমাদের চক্ষের সম্মুখে কি হইতেছে—সে কথাটির‌ও খবর রাখা চাই; কেন না, সেইটিই কাজের কথা। বর্ত্তমানের সৌর-সমাচার বিজ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করিলে বিজ্ঞান তাঁহার তান্ত্রিকী ভাষায়—এক-প্রকার ছেঁদো কথায়—যে-সকল অদ্ভুত রহস্যকাহিনী বলিতে আরম্ভ করেন, তাহা বিধিমত টীকা এবং ভাষ্যের দ্যোতনা ব্যতিরেকে বুঝিতে পারা সুকঠিন। তাহার মধ্যে প্রধান একটি রহস্যকথা এই যে, খনিগর্ব্ভস্থিত অঙ্গারের ভিতরে সূর্য্যরশ্মি পুঞ্জীভূত রহিয়াছে;—অঙ্গারকে যখনি প্রজ্বালিত করিয়া কাজে লাগানো যায়, তখনি তাহার সেই বহু-পুরাতনকালের সঞ্চিত গুপ্তধন অগ্নি-আকারে প্রকাশ্যে বাহির হইয়া পড়ে। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসা এই-খানেই থামিতেছে না; অধিকন্তু আমরা জানিতে চাই এই যে, সূর্য্য-রশ্মি কি কেবল অঙ্গারের ভিতরেই সংগোপিত রহিয়াছে—আর কোথাও সংগোপিত নাই?

বিজ্ঞান বলেন এই যে, সকল বস্তুরই অন্তঃপুরে তড়িতের প্রকৃতি-পুরুষাত্মিকা যুগলমূর্ত্তি (Negative এবং Positive Electricity) একত্রে নিলীন রহিয়াছে। অন্তঃপুর হইতে বহিঃক্ষেত্রে বাহির হইবার সময় জোড় ভাঙিয়া দোঁহে দুই দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়ায়। তাহার পরে কোনো-প্রকার সঙ্কীর্ণ ব্যবধানের দুই পারে দাঁড়াইয়া দোঁহার সহিত দোঁহার যখন চোখাচোখি হয়, তখন হুতাশন প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, এবং সেই প্রজ্বলিত হুতাশনে যুগল-তড়িৎ একীভূত হইয়া যায়। তার সাক্ষী—আকাশের বিদ্যুৎ। বিদ্যুতের উদ্ভাসনে নর-তড়িত এবং নারী-তড়িৎ কেমন আগ্রহের

সহিত বিচ্ছেদের বাঁধ ভাঙিয়া-ফেলিয়া একত্র সম্মিলিত হয়, আর, কেমন তেজের সহিত উভয়ের অন্তর্নিগূঢ় অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। ফলে, সকল বস্তুতেই যুগল তড়িৎ একত্রে নিলীন রহিয়াছে বলাও যা, আর, সকল বস্তুতে অগ্নি নিগূঢ় রহিয়াছে বলাও তা—একই কথা।* এই যে অগ্নি, যাহা সকল বস্তুরই অভ্যন্তরে নিগূঢ় রহিয়াছে, তাহা পদার্থটা আর-কিছু না—সূর্য্যেরই রূপান্তর। অগ্নি একপ্রকার পৃথিবীস্থ সূর্য্য। তবেই হইতেছে যে, সুদূর পুরাকালেও যেমন, এখনো তেমনি, সূর্য্যের প্রভাবাগ্নি সমস্ত সৌরজগৎ ব্যাপিয়া জলে-স্থলে-অনলে-অনিলে সর্ব্বত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। আসন গুটান থাকিলেও আসন, বিছানো থাকিলেও আসন; তেমনি, সৌরজগৎ সূর্য্যে বিলীন থাকিলেও তাহা সূর্য্যেরই প্রভাব, সূর্য্য হইতে ছট্‌কিয়া বাহির হইলেও তাহা সূর্য্যেরই প্রভাব।

ছট্‌কিয়া বাহির হওয়ার নামই প্রকটিত হওয়া বা প্রকাশিত হওয়া বা আবির্ভূত হওয়া; আর, আবির্ভূতির প্রকরণ-পদ্ধতি হ'চ্চে দ্বন্দ্বের প্রতি-যোগ। জল ডাঙার প্রতিযোগে প্রকাশিত হয়; ডাঙা জলের প্রতিযোগে প্রকাশিত হয়; বনকানন-গিরি-নদী-সাগরের বিচিত্র বর্ণসকল পরস্পরের প্রতিযোগে প্রকাশিত হয়। বর্ণবৈচিত্র্য আলোকের প্রতিযোগে প্রকাশিত হয়; আলোকও তেমনি আবার বর্ণবৈচিত্র্যের প্রতিযোগে প্রকাশিত হয়। গোড়া'র প্রতিযোগ হ'চ্চে—প্রকাশ এবং অপ্রকাশের প্রতিযোগ, অথবা, আলোক এবং অন্ধকারের প্রতিযোগ, আর, তাহার আনুষঙ্গিক আর দুইটি অবান্তরশ্রেণীর প্রতিযোগ হচ্চে—(১) আলোক এবং বর্ণবৈচিত্র্যের

* শক্তির বহুরূপিতা (Transformation of forces) বিজ্ঞানের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত। এক অগ্নি—উত্তাপ, আলোক এবং তড়িৎ তিনের একাধার। বস্তু-পক্ষে তিনের মধ্যে প্রভেদ নাই। প্রভেদ যাহা আছে তাহা শক্তি ঘটিত প্রভেদ, বস্তু

প্রতিযোগ ; (২) অন্ধকার এবং বর্ণবৈচিত্র্যের প্রতিযোগ ; নিম্নে দেখ :—

(১) প্রতিযোগ

আলোক বর্ণবৈচিত্র অন্ধকার

(২) প্রতিযোগ (৩) প্রতিযোগ

প্রতিযোগের মুখ্য প্রয়োজনীয়তা প্রকাশেরই জন্য। কিন্তু প্রকাশের সঙ্গে আনন্দের যোগ থাকা চাই, তা নইলে প্রকাশের সমুচিত সার্থকতা হয় না। প্রতিযোগের পথ দিয়া যেমন প্রকাশ ফুটিয়া বাহির হয়, সংযোগের পথ দিয়া তেমনি আনন্দ ফুটিয়া বাহির হয়। শাস্ত্রের মতানুসারে প্রকাশও যেমন—আনন্দও তেমনি, দুইই সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম। সত্ত্বগুণ বলিতে সত্তা, প্রকাশ এবং আনন্দ, তিনিই একসঙ্গে বুঝায়। সত্ত্বগুণ যে সত্তাবাচক, তাহা তাহার গায়ে লেখা রহিয়াছে। কবিত্ব এবং কবিতা যেমন একই কথা, সত্ত্ব এবং সত্তাও তেমনি। তা ছাড়া, সত্ত্ব-গুণের মুখ্য ধর্ম্ম দুইটি ; একটি হ'চ্চে প্রকাশ এবং আর-একটি হ'চ্চে আনন্দ। খাপছাড়া রকমের প্রকাশে আনন্দ হয় না, চৌকোষ রকমের প্রকাশেই আনন্দ হয়। অন্ধকার এবং আলোকের প্রতিযোগ মাত্রাতীত হইলে একদিকে আলোকের প্রকাশ অতিশয় তীব্রভাব ধারণ করে, আর-একদিকে অন্ধকারের প্রকাশ অতিশয় ভীষণভাব ধারণ করে। তাহাতে দর্শকের মন ব্যথিত হয়। প্রতিযোগ দর্শকের চক্ষে-অঙ্গুলি দিয়া দৃশ্যবস্তু-সকলের প্রভেদলক্ষণ দেখাইয়া দ্যায়, আর সেই সঙ্গে প্রত্যেকের বিশেষত্ব ফুটাইয়া তোলে। সংযোগ সকলের মধ্যে সদ্ভাব, সামঞ্জস্য এবং শান্তি স্থাপন করিয়া প্রত্যেকের অভাব সকলকে দিয়া এবং সকলের অভাব প্রত্যেককে দিয়া পূরণ করাইয়া লয়। আলোক, বর্ণবৈচিত্র্য এবং

অন্ধকারের সুব্যবস্থামতো সংযোগ হইলে, বর্ণবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া অন্ধকার হইতে আলোকে এবং আলোক হইতে অন্ধকারে ওঠা-নাবার পথ সুগম এবং সুখাবহ হইয়া যায়, আর, সেই গতিকে তিনের (কিনা আলোক, বর্ণবৈচিত্র্য এবং অন্ধকারের) প্রকাশও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, আর, প্রকাশের মধ্য দিয়া আনন্দ ফুটিয়া বাহির হইতে পথ পায়। আলোক এবং অন্ধকারের মধ্যে—প্রকাশ এবং অপ্রকাশের মধ্যে—প্রতিযোগের উপলব্ধি খুবই সহজ; কিন্তু দুয়ের মধ্যে সংযোগের উপলব্ধি সাধন সাপেক্ষ। আলোক এবং অন্ধকার, অথবা অব্যক্ত এবং ব্যক্ত, দুইকে এক করিয়া ছাথা-ও যা, আর, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় দুইকে এক করিয়া ছাথা ও তা—একই কথা। জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়কে এক দৃষ্টিতে ছাথা প্রথম উদ্যমেই সাধকের পক্ষে সম্ভাবনীয় নহে; তাহার পূর্ব্বে জ্ঞেয়জগৎকে একীভূত করিয়া দেখিতে শেখা চাই। প্রথমে আত্মার জ্ঞেয়স্থানে (অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষুর সম্মুখে) সর্ব্বাত্মক একত্বের দর্শন পাওয়া চাই; তাহা হইলেই বৃক্ষানল বৃক্ষানলে মিশিয়া যেমন দাবানল হইয়া উঠে, তেমনি সম্মুখে বিরাজমান জ্ঞেয়স্থানের একত্ব এবং পশ্চাতে লুক্কায়িত জ্ঞাতৃস্থানের একত্ব, এই দুই একত্ব একত্রে মিলিয়া আত্মার সর্ব্বাঙ্গীন একত্ব দেদীপ্যমান হইয়া উঠিবে। তাই বলিতেছি যে, প্রথম উপক্রমে আত্মার একত্ব জ্ঞেয়স্থানে অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষুর সম্মুখে দেখিতে হইবে। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডকে একীভূত করিয়া দেখিতে হইলে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডকে কেন্দ্রস্থানে বা সমষ্টিস্থানে বা হিরণ্ময় কোষে লক্ষ্য নিবিষ্ট করা আবশ্যক। শেষের এই কথাগুলি অতীব সংক্ষেপে বলিলাম; পরে তাহা সবিস্তারে পর্য্যালোচনা করা যাইবে।

বলিলাম—"আত্মার একত্ব জ্ঞেয়স্থানে অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষুর সম্মুখে দেখিতে হইবে। বৃহৎব্রহ্মাণ্ডকে একীভূত করিয়া দেখিতে হইলে হিরণ্ময় কোষে লক্ষ্য নিবিষ্ট করা আবশ্যক।" এই কথাটির আশপাশের

পরিধিমহলে ঘোরা-ফেরা হইয়াছে অনেক—এক্ষণে উহার ভিতর মহলের কপাট উদ্ঘাটন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহারই চেষ্টা দেখা যা'ক্।

ভিতর-মহলে প্রবেশের উদ্যোগ।

পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লি বাঁধিয়া যাত্রিগণ প্রয়াণপথে চলিয়াছেন—অতি উত্তম। কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য হ'চ্চে গম্যস্থানে যাওয়া। গম্যস্থান কোন্ স্থান্? গম্যস্থান হ'চ্চে আনন্দ;—নির্ম্মল আনন্দ, সজাগ আনন্দ, প্রশান্ত আনন্দ, পরমানন্দ। যাওয়া হইতেছে কোন্ পথ দিয়া? তত্ত্ব-জ্ঞানের পথ দিয়া। তত্ত্বজ্ঞান-পথের পাথেয়-সম্বল কি? পাথেয়-সম্বল হ'চ্চে মূলতত্ত্ব। মূলতত্ত্ব কাহাকে বলে? মূলতত্ত্ব হ'চ্চে সেই তত্ত্ব, যাহা তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলনের সময় গোড়াতেই (অর্থাৎ পহিলা নম্বরেই) স্বীকার্য্য। দৃষ্টান্ত দেখাও। জ্ঞাতৃজ্ঞান-জ্ঞেয়ের ঐক্য আত্মজ্ঞানের মূলতত্ত্ব; কেন না, আত্মজ্ঞান বলিবামাত্রই বুঝায় যে, সে-জ্ঞানের জ্ঞাতাও আপনি—জ্ঞেয়ও আপনি। তবেই হইতেছে যে, আত্মজ্ঞানের অনুশীলনকালে জ্ঞাতৃজ্ঞান-জ্ঞেয়ের ঐক্য গোড়াতেই স্বীকার্য্য; এইজন্য বলিতেছি যে, জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ের ঐক্য আত্মজ্ঞানের মূলতত্ত্ব। আত্মজ্ঞানের মূল-তত্ত্ব—কিন্তু আর-আর জ্ঞানের কোন্ তত্ত্ব? যাহা আত্মজ্ঞানের মূলতত্ত্ব, তাহা সকল জ্ঞানেরই মূলতত্ত্ব। প্রমাণ কি? প্রণিধান করা হো'ক্ঃ—

জ্ঞানের কার্য্যই হ'চ্চে সত্যকে প্রকাশ করা। সত্য কি? না, যাহা "আছে" বলিয়া ধ্রুব প্রতীয়মান, তাহাই সত্য। কিন্তু "আছে" দেখা-কথা। দেখা কথা'র মূলে হওয়া-কথা থাকা চাই; আছে'র মূলে আছি থাকা চাই; জগৎতের মূলে আত্মা থাকা চাই। অতএব এটা যখন সুনিশ্চিত যে, জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ের ঐক্য আত্মার মূলতত্ত্ব, তখন সেই সঙ্গে

এটাও সুনিশ্চিত যে, আত্মার ঐ যে মূলতত্ত্ব জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ের ঐক্য, উহা সর্ব্বজগতেরই মূলতত্ত্ব; কেন না, সর্ব্বজগতেরই মূলে আত্মা জাগিতেছে। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, আত্মাই সত্য এবং সত্যই আত্মা। ফলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, বস্তুসকলের উপরে-উপরে ভাসিয়া বেড়াইলে সত্যে পৌঁছানো যায় না—বস্তুসকলের আত্মাতে ডুব দিলেই সত্যের উপলব্ধি পাওয়া যায়।

এ কথা খুব ঠিক্ যে, জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ের ঐক্য সর্ব্বজগতেরই মূলতত্ত্ব, কিন্তু ঐ মূলতত্ত্বটি মস্তিষ্কের ভাণ্ডারে চাবি দিয়া রাখিবার জন্য হয় নাই—কাজে খাটাইবার জন্যই হইয়াছে। কোন্ স্থানে খাটাইতে হইবে? ঐ মূলতত্ত্বটির প্রয়োগ-ক্ষেত্র দুইটি—

একটি হ'চ্চে ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড, আরেকটি হ'চ্চে বৃহৎব্রহ্মাণ্ড। কোন্ কাজে খাটাইতে হইবে? উহাকে ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডে প্রয়োগ করিয়া ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বাত্মক ঐক্য অবধারণ করিতে হইবে; বৃহৎব্রহ্মাণ্ডে প্রয়োগ করিয়া বৃহৎব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বাত্মক ঐক্য অবধারণ করিতে হইবে। এই স্থানটিতে টিপ্পনীচ্ছলে একটি কথা বলিয়া রাখা নিতান্তই আবশ্যক মনে করিতেছি; কথাটি এই:—বৃহৎব্রহ্মাণ্ডকে বৃহৎব্রহ্মাণ্ড বলা হইতেছে শুদ্ধকেবল ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তুলনার অনুরোধে; প্রকৃত কথা এই যে, বৃহৎব্রহ্মাণ্ডের নামই সর্ব্বজগৎ, এবং সর্ব্বজগতের নামই বৃহৎব্রহ্মাণ্ড। সর্ব্বজগতের বাহিরে তো আর দ্বিতীয় জগৎ থাকিতে পারে না—বৃহৎব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড থাকিবে কেমন করিয়া? ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড বৃহৎব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে নাই—কিন্তু আছে তাহাতে আর ভুল নাই; কেন না, ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড আমরা আপনারাই। তবেই হইতেছে যে, ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড বৃহৎব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভূত।

এই যে কথাগুলি বলা হইল, ইহার অন্ধি-সন্ধি প্রদেশগুলা ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা যা'ক্।

বলিলাম যে, ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড বৃহৎব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে নাই—ভিতরে আছে; এ যাহা বলিলাম, এটা এক হিসাবের কথা। আর-এক হিসাবের কথা এই যে, বৃহৎব্রহ্মাণ্ডও ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে আছে। পুরাণে গল্পচ্ছলে কথিত হইয়াছে যে, বালক-কৃষ্ণকে মাটি খাইতে দেখিয়া যশোদা-মাতা তাঁহাকে যখন হাঁ করিতে বলিলেন, তখন বালক যেমি হাঁ করিল, যশোদা-মাতা কি দেখিলেন? তিনি দেখিয়া অবাক্—যে, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই ক্ষুদ্র বালকটির উদরের অভ্যন্তরে। একথার তাৎপর্য্য আর-কিছু না—সার্ব্বাত্মিক ঐক্য। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মনুষ্যশরীরে একই সার্ব্বাত্মিক ঐক্য মস্তকে যোগাসনে উপবিষ্ট, হৃদয়ে সিংহাসনে উপবিষ্ট, নাভিকেন্দ্রে কর্ম্মাসনে উপবিষ্ট। ইহাতে প্রকারান্তরে বুঝাইতেছে এই যে, শরীরের প্রত্যেক মর্ম্মস্থানে সমস্ত শরীর অন্তর্ভূত। তার সাক্ষী—যখন মাথা কাজ করে, তখন মাথার মধ্য দিয়া সমস্ত শরীর কাজ করে; যখন হৃদয় কাজ করে, তখন হৃদয়ের মধ্য দিয়া সমস্ত শরীর কাজ করে; যখন হস্তপদ কাজ করে, তখন হস্তপদের মধ্য দিয়া সমস্ত শরীর কাজ করে। তবেই হইল যে, শরীরের প্রত্যেক মর্ম্মগ্রন্থির অভ্যন্তরে সমস্ত শরীর জাগিতেছে। এই যে একটি লোকপ্রসিদ্ধ কথা যে, পরমাত্মা ঘটে-ঘটে বিরাজমান, এ কথার অর্থও তাই। সার্ব্বাত্মিক ঐক্যসূত্রে ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডের মর্ম্মেমর্ম্মে বৃহৎব্রহ্মাণ্ড জাগিতেছে বলিলেই বুঝায় যে, ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতা জীবাত্মার অভ্যন্তরে বৃহৎব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতা পরমাত্মা জাগিতেছেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, তাহাই যদি হইল, পরমাত্মা যদি ঘটে-ঘটে বিরাজমান—তবে সাধনভজনের প্রয়োজন কি? পরমাত্মাকে লাভ করিবার জন্যই তো সাধনভজন; তিনি যদি সাধকের হৃদয়ের অভ্যন্তরে আছেন—তবে তো তিনি সাধকের মুঠার মধ্যেই আছেন; আবার কেন তবে সাধনভজন? তুমি যে রত্ন চাহিতেছ, তাহা তোমার আঁচলে বাঁধা রহিয়াছে—তবে কেন তাহার জন্য

অ্যাতশত সাধ্যসাধনা? এ কথার একটা মীমাংসা করার নিতান্তই প্রয়োজন। ইহার মীমাংসা এইরূপ ঃ—

তুমি যে বলিতেছ, পরমাত্মাকে লাভ করিবার জন্য সাধ্যসাধনার প্রয়োজন কি? "লাভ করা" বলিতেছ কাহাকে? লাভ করা অর্থাৎ পাওয়া। চাওয়া ব্যতিরেকে "পাওয়া" কথাটার কোনো অর্থ হইতে পারে না। মনে কর যে, ফিন্‌কি-ফিন্‌কি বৃষ্টি পড়িতেছে—আর সেই সময়ে একজন তৃষ্ণার্ত্ত পথিক এক-গণ্ডূষ জলের জন্য হাত বাড়াইল; কিন্তু তাহার অঞ্জলিপুটে এক-ফোঁটা জল পড়িল, আর, তাহার পরেই বৃষ্টি ধরিয়া গেল। পথিক বলিল—"জল পাইলাম না"; তাহার কিয়ৎ পরে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল; পথিক হাত পাতিবামাত্রই একগণ্ডূষ জল পাইল। তখন পথিক বলিল—"জল পাইয়া প্রাণ পাইলাম।" পূর্ব্বে তাহারই হস্তে এক-ফোঁটা জল নিপতিত হইয়াছিল এবং এক্ষণে তাহারই হস্তে এক-গণ্ডূষ জল নিপতিত হইল। অথচ সেবারে পথিক বলিয়াছিল —"জল পাইলাম না", এবারে বলিল—"জল পাইয়া প্রাণ পাইলাম"। দুই বারের দুইরকম কথার তাৎপর্য্য কি? সেবারে পথিক যাহা চাহে নাই, তাহাই তাহার হস্তে পড়িয়াছিল; এবারে পথিক যাহা চাহে, তাহাই তাহার হস্তে পড়িল;—এই তাহার তাৎপর্য্য। পাওয়ার সহিত চাওয়ার এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। চাওয়া তিনরূপ;—প্রাণের চাওয়া, মনের চাওয়া এবং বুদ্ধির চাওয়া। প্রাণের চাওয়া হ'চ্চে ব্যাকুলতা, মনের চাওয়া হ'চ্চে অনুসন্ধান, বুদ্ধির চাওয়া হ'চ্ছে অবধারণ। মনে কর, তেপান্তর মাঠের মাঝখানে পথিকের প্রাণ জলের জন্য ব্যাকুল হইল; মন জলের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া সম্মুখে একটা নদীর মত দৃশ্য দেখিল, কিন্তু তাহা মরীচিকাও হইতে পারে, জলও হইতে পারে। মন বলিতেছে, উহা মরীচিকা কি জল, তাহা আমি জানিও না, জানিতে চাহিও না; জলেই আমার প্রয়োজন—

মরীচিকায় আমার প্রয়োজন নাই, অতএব উহা জলই। শেক্‌স্‌পিয়র্ এক স্থানে বলিয়াছেন "এটা তোমার মনের ইচ্ছানুযায়ী চিন্তা—তোমার Wish is father to thy thought, ইচ্ছাই তোমার চিন্তার জনয়িতা।" মন বাসনাকেই সখীত্বে বরণ করিয়া সত্যাসত্যের দিকে ফিরিয়াও চাহে না। বুদ্ধি কিন্তু মনের মন-ভুলানিয়া কথায় সন্তোষ মানিতে পারে না। বুদ্ধি ব'ল, "যাহা দেখা যাইতেছে, তাহা সত্যসত্যই জল কি মরীচিকা, তাহা সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য।" এখন বক্তব্য এই যে, ব্যাকুলতার ধাপ হইতে অনুসন্ধানের ধাপ এবং অনুসন্ধানের ধাপ হইতে অবধারণার ধাপে উঠিয়া যখন ইষ্টবস্তুকে হস্তে নাগাল পাওয়া যায়, তখন তাহারই নাম প্রকৃত পাওয়া। আপাতত ভক্তদিগের প্রাণের চাওয়া স্বভাবত কোন্ দিকে উন্মুখ হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্, তাহার পরে তাহার তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

দিঙ্‌নিরূপণ।

এটা একটা দেখা কথা যে, ভক্তগণের প্রাণের চাওয়া যখন তাঁহাদের ইষ্টদেবতার প্রতি উন্মুখ হয়, তখন তাঁহাদের চক্ষের চাওয়া স্বভাবতই আকাশের প্রতি নিবিষ্ট হয়। ভক্তেরা পরমেশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী জানিয়াও তাঁহাকে ডাকিবার সময়, বা স্মরণ করিবার সময়, বা ভজনা করিবার সময় করজোড়ে উপরে দৃষ্টিপাত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। তা ছাড়া, সৃষ্টির এক আশ্চর্য্য রহস্য দেখিতে পাওয়া যায় এই যে, বৃক্ষের মূল ভূতলে প্রোথিত; সরীসৃপ জন্তুদিগের শরীর ভূপৃষ্ঠে অবলুণ্ঠিত; গো-মেষাদির শরীর পৃথিবী হইতে অর্দ্ধোন্নত; মনুষ্যের শরীর পূর্ণসমুন্নত। মনুষ্য বৃক্ষের ঠিক্ উল্টাপিট এবং অন্যান্য জন্তুরা দুয়ের মধ্যবর্ত্তী। তার সাক্ষী—বৃক্ষের মস্তক নিম্নমুখ, হস্তপদ বা ডালপালা ঊর্দ্ধমুখ, মনুষ্যের

মস্তক উর্দ্ধমুখ, হস্তপদ নিম্নমুখ। মনুষ্যের মস্তক যেমন স্বভাবতই উর্দ্ধমুখ, ভক্তগণের প্রাণের চাওয়াও তেমনি স্বভাবতই উর্দ্ধমুখ। উপনিষৎশাস্ত্রে স্পষ্ট লেখা আছে যে, "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।" সেই বিষ্ণুর পরম স্থান সর্ব্বদা দেখেন সূরিগণ—গগনমণ্ডলে যেন চক্ষু আতত। অর্থাৎ গগনমণ্ডল যেন চক্ষুষ্মান্।

আলোচ্য বিষয়।

ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী—অথচ আমরা তাঁহাকে প্রাণ ভরে' ডাকিবার সময় স্বভাবতই উপরে দৃষ্টিপাত করি, ইহার কারণ কি?

ইহার কারণ হ'চ্চে এই :—মনে কর, তোমার আত্মার সঙ্গে আমি বাক্যালাপ করিতে ইচ্ছা করিতেছি; কোথায় আমি তোমার আত্মার সাক্ষাৎ পাইব? তুমি হয় তো বলিবে যে, "খাঁচার মধ্যে যেমন পাখী থাকে—আমার শরীরের মধ্যে তেমনি আত্মা আছেন!" কিন্তু সে কথা হইতে পারে না এইজন্য—যেহেতু ভিতর-বাহির দূর-নিকট প্রভৃতি কোনো-প্রকার আকাশঘটিত সম্বন্ধ নিরাকার আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না; আত্মাকে নাগালই পায় না—স্পর্শ করিবে কেমন করিয়া? আকাশঘটিত কোনোপ্রকার সম্বন্ধ আত্মাকে স্পর্শ করিতে না পারুক্, তথাপি তোমার সহিত আমি যখন বাক্যালাপ করিতেছি তখন কাজের গতিকে আমাকে অগত্যা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, তোমার আত্মা আমার ডাহিনেও নহে—বামেও নহে—উপরেও নহে—নীচেও নহে—পরন্তু সম্মুখে বর্ত্তমান; কেন না, তোমার সহিত বাক্যালাপের সময় তোমার আত্মা তোমার মুখ-চক্ষুর অভ্যন্তর হইতে উঁকি দিতেছে, এই ভাবে আমি তোমার আত্মাকে উপলব্ধি করি। এক-তো আত্মা অনাকাশে অবস্থিতি করেন, আর, সেইজন্য ভিতর-বাহির দূর-নিকট প্রভৃতি আকাশঘটিত সম্বন্ধ আত্মাতে

সংলগ্নই হয় না; তাহাতে আবার, যদি-বা পাঁচজনের মতে মত দিয়া মোটামুটি মানিয়া লওয়া যায় যে, আত্মা শরীরের ভিতরে আছেন, তাহা হইলে আর-এক দিকে গোল বাধে এই যে, আত্মা তো মনুষ্যের সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন; আমরা তবে মনুষ্যের প্রতি প্রণিধান করিবার সময় মনুষ্যের মুখমণ্ডলেরই প্রতি লক্ষ্য করি কেন? পদাঙ্গুলির প্রতি লক্ষ্য করি না কেন?

উপরে যাহা ইঙ্গিত করা হইল, তাহাতে সহজ-বুদ্ধিতে সহজেই এইরূপ প্রতীয়মান হইতে পারে যে, যে-কারণে লোকে মনুষ্যের প্রতি প্রণিধান করিবার সময় মনুষ্যের মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপ্রেরণ করে, সেই কারণে ঈশ্বরের প্রতি প্রণিধান করিবার সময় ঊর্দ্ধ আকাশে দৃষ্টিপ্রেরণ করে, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, সেকারণ কি?

ব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থা।

সে কারণ যে কি, তাহার সন্ধান পাইতে হইলে চারিটি বিষয় আনু-পূর্ব্বিক বুঝিয়া দেখা আবশ্যক—

(১) ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থা।

(২) বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থা।

(৩) দুয়ের সৌসাদৃশ্য।

(৪) সমস্তের সার্ব্বাত্মিক ঐক্য।

আপাতত মনে হইতে পারে যে, মনুষ্য-শরীরে রক্তবাহিনী নাড়ির নদী-নালা, বায়ুবাহিনী নাড়ির ডালপালা, তৈজসতন্তুর মাকড়সার জাল, অস্থির ইষ্টক-গাঁথুনি, মাংসপেশীর কবজা-বন্ধন, মেদের প্রলেপ বা মাংসের ছাউনি, এই সকল নানাবিধ উপকরণের একটা পরিপাটি রকমের ব্যবস্থা আছে; সেই ব্যবস্থার পশ্চাৎ ধরিয়া প্রাণ-মন-বুদ্ধি অনাহূতভাবে একে একে

শরীরের মধ্যে আসিয়া জোটে ; পক্ষান্তরে, বহির্জগতে সকলই এলোমেলো কাণ্ড ;—সেখানে প্রাণ মন-বুদ্ধির বাসের উপযোগী না আছে বসিবার আসন, না আছে শোবার বিছানা, না আছে ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির আয়োজন ; —সেখানে কেহ কাহাকেও চেনে না—কেহ কাহারও খোঁজ লয় না—কেবল এক একটা বিশাল বিশাল কাণ্ড (সমুদ্র—পর্ব্বত—মরুভূমি—অরণ্য—ইত্যাকার বৃহৎ বৃহৎ অসাড় অচেতন ভূতনিচয়) শত-শত-যোজন জায়গা জুড়িয়া পড়িয়া আছে যেন কুম্ভকর্ণের প্রপিতামহ !

বলিতেছ কি ? বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে ব্যবস্থা নাই—না তোমার চক্ষু নাই ? বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে যদি ব্যবস্থা না থাকিবে, তবে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে ব্যবস্থা আসিবে কোথা হইতে ? (১) পৃথিবীর স্তরসজ্জা ; (২) বায়ুমণ্ডলের স্তরসজ্জা ; (৩) অভ্রভেদী পর্ব্বত এবং পাতালস্পর্শী সমুদ্রের পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের-বোঝাপড়া ;—তুষার মুকুটের বাষ্পরূপী কাঁচা মাল বায়ু-বোঝাই করিয়া পর্ব্বত সমীপে পাঠাইবেন সমুদ্র, আর, নানাদেশের নানাজাতীয় মৃত্তিকাস্তরণ নদনদী বোঝাই করিয়া সমুদ্রসমীপে পাঠাইবেন পর্ব্বত, উভয়ত এইরূপ আমদানি রপ্তানির বন্দোবস্ত ; (৪) বিস্পষ্ট আলোক লইয়া সূর্য্য উঠিবেন দিবাভাগে, নিদ্রারসার্দ্র সুমধুর আলোক লইয়া চন্দ্রমা উঠিবেন রাত্রিকালে, এইরূপ রকমওয়ারি আলোকের উদয়াস্তের পালা-বিভাগ ;—বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের এ কি কম ব্যবস্থা ? বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের ইত্যাকার অনির্ব্বচনীয় মহা মহা ব্যবস্থার কোনো একটা'র একচুল এদিক-ওদিক হউক্ দেখি—তৎক্ষণাৎ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের আভ্যন্তরিক ব্যবস্থার বিপর্য্যয়দশা উপস্থিত হইবে। অতএব ব্যবস্থা-পারিপাট্য ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেও যেমন, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডেও তেমনি ; অণুবীক্ষণের চক্ষেও যেমন তাহা প্রকাশমান, দূরবীক্ষণের চক্ষেও তেমনি তাহা প্রকাশমান। এখন কথা হ'চ্চে এই যে, কে আগে, কে পিছে ? কে বড়, কে ছোটো ? কে দাতা কে গ্রহীতা ?

কে কাহার খাইয়া মানুষ? এ কথার উত্তর স্পষ্টই পড়িয়া আছে;—শস্যক্ষেত্রের মৃত্তিকাতেই মনুষ্যের শরীর গঠিত, সমুদ্রের নোনৃতা জলেই মনুষ্যের রক্ত রসায়িত, সূর্য্যের আলোকেই মনুষ্যের চক্ষু আলোকিত; মনুষ্যের নিশ্বাস-প্রশ্বাস আকাশের বায়ুমণ্ডলেরই জোয়ার-ভাঁটা। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড পদার্থটা কি? না, সেদিনকার আমি বা তুমি বা তিনি। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড কি? না যেখানে যত আমি বা তুমি বা তিনি আছেন বা ছিলেন বা থাকিবেন, সমস্ত লইয়া বৃহৎ এক ব্যাপার। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে, তাহা তো বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে আছেই; তা ছাড়া ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে যাহা নাই, তাহাও বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে আছে; দশবৎসর পরে যে বালক ভূমিষ্ঠ হইবে, সেই অজাত-বালকও বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে আছে (বালকরূপে না থাকুক্ আর কোনোরূপে আছে); আর, একশত বৎসর পূর্ব্বে যে মহাত্মারা বঙ্গদেশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন সেই স্বর্গীয় মহাত্মারাও বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে আছেন; কি বেশে এবং কি ভাবে আছেন, সে কথা স্বতন্ত্র। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে জ্ঞান, প্রাণ, মন প্রভৃতি যেখানে যত কিছু ব্যাপার আছে, সমস্তেরই আকরভূমি বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড। অতএব এটা স্থির যে, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড বড়, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ছোটো; বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড দাতা, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড গ্রহীতা; বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড চির-যৌবনসম্পন্ন কত-কালের বৃদ্ধপ্রপিতামহ তাহা বলা যায় না, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডগুলি সেদিনকার অভিনব বালক, তাহার মধ্যে অনেকে অকাল বৃদ্ধ।

দুই পক্ষের নাম তুমি যাহাই দেও না কেন—সমষ্টি-ব্যষ্টি নামই দেও, বড়-ছোটো নামই দেও, আর দাতা-গ্রহীতা নামই দেও—নাম যাহা দিতে হয় দেও, কেবল এইটি মনে রাখিও যে, দুই পক্ষ একসূত্রে গাঁথা। সে সূত্র হ'চ্চে সার্ব্বাত্মিক ঐক্য। কাজেই দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ অবশ্যম্ভাবী। সম্বন্ধ যখন অবশ্যম্ভাবী—তখন সম্বন্ধানুযায়ী কার্য্যও অবশ্যম্ভাবী। সে কার্য্য

কি? না, অভাবের পূরণ। অভাব কাহার? যে ছোটো, যে গ্রহীতা, যে ব্যষ্টি, তাহার;—ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের। অভাবের পূরণকর্ত্তা কে? না, যিনি বড়, যিনি দাতা, যিনি সমষ্টি, তিনি;—বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড এবং বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড, দোঁহার মধ্যে ব্যাপার যাহা চলিতেছে, তাহা সংক্ষেপে এই :—

(১) ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড চা'ন।

(২) বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড দ্যান।

(৩) ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড পা'ন।

চাওয়ার সহিত পাওয়ার সংযোগের নামই আনন্দ। চাওয়ার পূরণ-চেষ্টার নামই কর্ম্মচেষ্টা এবং চাওয়ার পূরণের নামই ভোগ। একাকী কেবল আমি নহি বা তুমি নহ, পরন্তু জগৎশুদ্ধ সমস্ত লোকই চাহিতেছে, চেষ্টা করিতেছে, পাইতেছে; কাজেই, চাওয়া'র সহিত চাওয়া'র সুর মিলানো চাই, চেষ্টার সহিত চেষ্টার সুর-মিলানো চাই, পাওয়ার সহিত পাওয়ার সুর মিলানো চাই; লোকমধ্যে একটা ব্যবস্থা চাই। চাহিবারও একটা ব্যবস্থা আছে, চেষ্টা করিবারও একটা ব্যবস্থা আছে, পাইবারও একটা ব্যবস্থা আছে। ব্যবস্থাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া চাহিলে চাওয়াও নিষ্ফল হয়, ব্যবস্থাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া চেষ্টা করিলে চেষ্টাও নিষ্ফল হয়, ব্যবস্থাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া পাইলে পাওয়াও নিষ্ফল হয়। দৈত্যদানবেরা যখন দেবতাদিগের যজ্ঞের ভাগ হরণ করিয়া "পাইয়াছি" বলিয়া আহ্লাদে নৃত্য করে, তখন তাহাদের জানা উচিত যে—

"অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।"

"অধর্ম্মের দ্বারা লোকে আপাতত বৃদ্ধি পায়, তাহার পরে কল্যাণ দ্যাখে, তাহার পরে শত্রুদিগকে জয় করে, সমূলে কিন্তু বিনাশ পায়!" ব্যবস্থা

ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যেও যেমন—বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যেও তেমনি—ইহা পূর্ব্বে দেখা হইয়াছে। তা ছাড়া দুই ব্রহ্মাণ্ডের পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের যোগাযোগেরও একটা ব্যবস্থা আছে; সে ব্যবস্থার একটা যৎসামান্য নমুনা এই :—

ক্ষুধা হ'চ্চে চাওয়া; ক্ষেত্রকর্ষণ হ'চ্চে কর্ম্মচেষ্টা; বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্রজাত অন্নদ্বারা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের উদর পূরণ হ'চ্চে ভোগ। ক্ষুদ্‌বোধ করিতে হইবে, কর্ম্মচেষ্টা করিতে হইবে, অন্নভোজন করিতে হইবে, এই হ'চ্চে ব্যবস্থা। তুমি হয় তো বলিবে যে, এ যে ব্যবস্থা তুমি দেখাইতেছ—এটা বড্ড একটা নীচশ্রেণীর ব্যবস্থা; উহার নাম করিতে লজ্জা বোধ হয়! মনুষ্য দেবতুল্য জীব—সে কিনা পেটের জ্বালায় লাঙল ধরিবে! ধিক্! মুখে বলিতেছ—"নীচের শ্রেণীর ব্যবস্থা"—কিন্তু সেই নীচশ্রেণীর ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া উচ্চশ্রেণীর ব্যবস্থায় ওঠো দেখি—কেমন তুমি বীরপুরুষ! তোমার উদরে একদিন অন্ন না পড়িলে তোমার সাধের মস্তিষ্ক চতুর্দ্দিক ভোঁভোঁ দেখিতে থাকিবে! কি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড, কি বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড, দুয়েরই ব্যবস্থা এমনি কড়াক্কড় যে, মস্তক যে মাথা উচু করিয়া উদরকে বলিবেন—"তুমি কোনো কাজের নহ, তোমাকে চাহি না"; অথবা উদর যে পিত্তবমন করিয়া মস্তককে বলিবেন—"তুমি কোন কাজের নহ, তোমাকে চাহি না;" সূর্য্য যে চোখ রাঙাইয়া পৃথিবীকে বলিবেন—"দূর হও তোমাকে চাহি না;" অথবা পৃথিবী যে মুখ বাঁকাইয়া সূর্য্যকে বলিবেন—"তুমি যাও তোমাকে চাহি না;" তাহার জো নাই। সকলেরই সকলকে চাহিতে হইবে তবে কি না ব্যবস্থা অনুসারে। উদর যদি চায় যে, মস্তক আমার কাজ করুন্, আমি মস্তকের কাজ করিব;" তবে সেরূপ চাওয়া ব্যবস্থা-বিরুদ্ধ, সুতারং নিতান্তই নিষ্ফল।

এখন দেখিতে হইবে এই যে, ব্যবস্থা প্রধানত বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডেরই ব্যবস্থা

—ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থা সেই মূল ধ্বনিরই প্রতিধ্বনি ; কেন না, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভূত। কথাটার ভাব এই :—

সমস্ত-শরীরের যেমন মস্তিষ্ক আছে—বাহুরও তেমনি মস্তিষ্ক আছে ; বাহুর মস্তিষ্ক বাহুমূলে অবস্থিতি করে। কিন্তু "মস্তিষ্ক" বলিতে প্রধানত মাথার মস্তিষ্কই বুঝায় বাহুর মস্তিষ্ক বুঝায় না। অঙ্গুলি যদি বলে যে, "মাথার মস্তিষ্কের খবরে আমার কি কাজ - আদা'র ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কি কাজ ? আমার কাছে বাহুর মস্তিষ্কই মস্তিষ্ক !" তবে অঙ্গুলির মুখে সে কথা শোভা পাইলেও মস্তকের মস্তিষ্ক সে কথায় কখনই সায় দিতে পারে না ; মস্তকের মস্তিষ্ক হাসিয়া বলে যে, "আমি যদি শক্তিসংহার করি—তবে বাহুর মস্তিষ্ক সেই দণ্ডে আড়ষ্ট হইয়া মৃতবৎ হইয়া পড়িবে, তাহা সে জানে না।" ফল কথা এই যে, সমষ্টির কাছে ব্যষ্টির প্রভুত্ব খাটে না। বাহুমূলের প্রভুত্ব অঙ্গুলির কাছেই খাটে—মস্তকের কাছে খাটে না। বাহুর মস্তিষ্ক এবং মস্তকের মস্তিষ্কের মধ্যে যেমন ব্যষ্টি সমষ্টি-সম্বন্ধ, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময় কোষ এবং বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময় কোষের মধ্যেও তেমনি ব্যষ্টি-সমষ্টি-সম্বন্ধ। কাজেই বলিতে হয় যে, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময় কোষই মুখ্য হিরণ্ময় কোষ, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময়-কোষ তাহার একটা চুম্বক অনুলিপ বা প্রতিলিপি। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময় কোষ যেমন ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে আত্মার সহস্রদল আসন, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময় কোষ তেমনি বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে আত্মার সহস্রাংশু আসন। অতএব সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বরের প্রতি প্রণিধান করিবার সময় লোকের চক্ষের চাওয়া এবং প্রাণের চাওয়া দুইই যে স্বভাবতই ঊর্দ্ধে—বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময় কোষের দিকে—প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, তাহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সূর্য্যের এক নাম সবিতা কিনা প্রসবিতা। সূর্য্য

এক সময়ে পৃথিবী ছাড়াইয়া আরো অনেকদূর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। "কে বলিল ?" বলিয়াছেন কম কেহ ন'ন—জ্যোতির্বিদ্যা !

বিদ্যার কথার ভাবে এইরূপ প্রতিপন্ন হয় যে, আদিমকালে মহৎ এক তৈজসপদার্থ অতীব সূক্ষ্ম তৈজসপদার্থ - নিখিল আকাশে পরিব্যাপ্ত ছিল; সেই সুসূক্ষ্ম তৈজসপদার্থ হইতে পৃথিব্যাদি লোকমণ্ডল প্রসূত হইল। পৃথিবী সূর্য্য হইতে নীচে নাবিয়া আসিয়াছে অনেকদূর পর্য্যন্ত ;— সূর্য্য পৃথিবীর প্রাণকে উপরের দিকে অর্থাৎ আপনার দিকে টানিতেছে। তা'র সাক্ষ্য—বৃক্ষেদের মূল বা মস্তক যদি-চ ভূগর্ভে প্রোথিত রহিয়াছে, তথাপি বৃক্ষেরা উর্দ্ধে হাত পা ছুঁড়িয়া আকাশের অভিমুখে ডালপালা বিকীর্ণ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। বৃক্ষেরা ভূগর্ত্ত হইতে মূল বা মাথা বাহির করিতে পারে না—সর্পেরা কিন্তু তাহা পারে। তবে কিনা সর্পেরা পৃথিবীর সঙ্গে লপ্‌টা লপ্‌টি-ভাবে চলাফেরা করে। পশ্বাদি জন্তুরা কেহ বা সরু-সরু দুই স্তম্ভে ভর করিয়া পৃথিবী হইতে অলগ্‌ হইয়া দাঁড়ায় —যেমন সারসপক্ষী ; কেহ বা মোটা-মোটা চারি স্তম্ভে ভর করিয়া পৃথিবী হইতে অলগ্‌ হইয়া দাঁড়ায়—যেমন হস্তী। জীবগণের মধ্যে মনুষ্যই কেবল একাকী পূর্ণমাত্রায় পৃথিবী হইতে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ায়। মনুষ্যের মস্তক যেমন পৃথিবী হইতে উর্দ্ধে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মনুষ্যের অপার্থিব বিশেষত্বের পরিচয়প্রদান করে, মনুষ্যের চাওয়াও তেমনি পৃথিবী হইতে উর্দ্ধে উন্মুখ হইয়া মনুষ্যের অপার্থিব বিশেষত্বের পরিচয়প্রদান করে।

মনুষ্যের আধ্যাত্মিক প্রাণের চাওয়া স্বভাবতই দুই দিকে দৌড়ে— মনুষ্যের দিকে এবং পরমেশ্বরের দিকে। মনুষ্যের চক্ষের চাওয়াও তাহার সঙ্গে গোড় দিয়া সম্মুখে মনুষ্যের চক্ষুর প্রতি এবং উর্দ্ধমুখে ঈশ্বরের চক্ষুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর, ঐ দুই দিকের দৃষ্টিচালনা কার্য্য যাহাতে সুনির্ব্বাহ হইতে পারে, তাহার মতো একটা দীপ-ব্যবস্থাও মনুষ্যশরীরে

আছে। অশ্বগবাদির দুই চক্ষু তাহাদের ললাটের দুই পার্শ্বে আড়াআড়ি ভাবে বসানো রহিয়াছে—ইহা সকলেরই দেখা কথা। কেবল মনুষ্যের এবং মনুষ্যাকৃতি জীবের দুই চক্ষু ললাটের সম্মুখে একপংক্তিতে বসানো রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। জাতিভাইদিগের পরস্পরকে পরস্পরের চক্ষের চাওয়ার মধ্য দিয়া মনের চাওয়া জানানো চাই—তাই মনুষ্য এবং মনুষ্যাকৃতি জীবদিগের দুই চক্ষু সম্মুখদৃষ্টির উপযোগী করিয়া ললাটের মধ্যস্থলে একপংক্তিতে বসাইয়া রাখা হইয়াছে। তাহার মধ্যে বিশেষ একটি দ্রষ্টব্য এই যে, জাতিভাইদিগের সহিত সম্মুখদৃষ্টি চালাচাল করিতে বানরদিগকেও দেখা যায়; কিন্তু ঈশ্বরোদ্দেশে উর্দ্ধে দৃষ্টি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আর-কোনো জীবকেই দেখা যায় না—সওয়ায় মনুষ্য। কাজেই বলিতে হয় যে, ভ্রূমধ্যস্থিত তৃতীয়চক্ষুর ঊর্দ্ধদৃষ্টি মনুষ্যের একটি স্বাজাতীয় বিশেষত্ব। তবে কিনা, মনুষ্য সবে-কেবল হামাগুড়ি ছাড়িয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে শিখিয়াছে—এখনো মনুষ্যের তৃতীয়চক্ষু ভাল করিয়া ফোটে নাই। ফলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনুষ্যের চাওয়ার যতটা টান মনুষ্যের চক্ষুর প্রতি, তার সিকির সিকি টানও ঈশ্বরের চক্ষুর প্রতি এখনো লোকসমাজে জন্মে নাই। মনুষ্যের চক্ষুর প্রতি চাহিয়া মনুষ্য কি না করে? মনুষ্যের চক্ষুর প্রতি চাহিয়া যোদ্ধা হেলায় প্রাণ দ্যায়, নাবিক ভেলায় সমুদ্র পার হয়, কবির কণ্ঠের ফোয়ারা খুলিয়া যায়, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের সূক্ষ্মদৃষ্টি পাষাণভেদী হইয়া উঠে। কোনো দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষের চতুর্দ্দিক্ হইতে যদি মনুষ্যমণ্ডলীর চক্ষু সুদূরে সরাইয়া রাখা যায়, তবে তাঁহার মহাপ্রতাপান্বিত সৌর্য্য বীর্য্য প্রভাবপরাক্রম সমস্তই একমুহূর্ত্তে মাটি হইয়া যায়! দেশশুদ্ধ লোকের প্রাণের চাওয়া এবং চক্ষের চাওয়া, দুইই মনুষ্যের চক্ষুর দিকেই দিবানিশি উন্মুখ; তা বই, বর্ত্তমান কালের কৃতবিদ্য-সমাজে কয়জনের প্রাণের এবং চক্ষের চাওয়া ঈশ্বরের চক্ষুর প্রতি দিনের

মধ্যে একবারও প্রত্যাবর্ত্তন করে? কিন্তু যাহাই হউক্ না কেন— মনুষ্য সত্যসত্যই কিছু আর পশু নহে—মনুষ্য মনুষ্য।

এটা যখন স্থির যে, তৃতীয় চক্ষুর ঊর্দ্ধদৃষ্টি মনুষ্যের একটা স্বজাতীয় বিশেষত্ব, তখন তাহা হইতেই আসিতেছে এই যে, সম্মুখদৃষ্টিই মনুষ্যের সর্ব্বস্ব নহে। কিন্তু তথাপি সম্মুখদৃষ্টি, এবং ঊর্দ্ধদৃষ্টি, দুয়ের মধ্যে এমনি একটা ক্রমান্বয়িতা-সম্বন্ধ আছে—যাহা কোনো অংশেই উপেক্ষণীয় নহে; সে সম্বন্ধ এইরূপ :—

মনে কর, একটা অরণ্যের মধ্যে শাখায় শাখায় ঘর্ষাঘর্ষি হইয়া এক স্থানে অগ্নি উত্থিত হইল। প্রথমে সে অগ্নি বায়ুদ্বারা তাড়িত হইয়া সম্মুখে বিস্তৃত হইতে লাগিল, এবং পরিশেষে সমস্ত অরণ্যটা কবলিত করিয়া আকাশাভিমুখে উদ্ধৃত হইয়া উঠিল। একটি এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, যে দাবানলের নীচের বিস্তার যত বেশী, তাহার উপরের শিখাগ্র ততই উচ্চে উত্থান করে। আর একটি দ্রষ্টব্য এই যে, অগ্নির শিখাগ্র বিন্দুপরিমাণ; অথচ সেই স্থানটিতে অগ্নির সমস্ত উত্তাপ যেন কেন্দ্রীভূত হইয়া রহিয়াছে। তৃতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, অগ্নির নীচের বিস্তার, শিখার ঊর্দ্ধগামিতা এবং শিখাগ্রের প্রাখর্য্য, তিনের পরিমাণ পরস্পরের সদৃশ। এই উপমার সাহায্যে মোটামুটি এইরূপ একটা ভাবের উপলব্ধি সহজেই হইতে পারে যে, সম্মুখদৃষ্টির বিস্তার, ঊর্দ্ধদৃষ্টির একতানতা এবং লক্ষ্য কেন্দ্রের পুঞ্জীভূত তেজ, তিনের মধ্যে সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে।

উপমা ছাড়িয়া দিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে অবতীর্ণ হওয়া যা'ক্। দাবানল যেমন ক্রমে ক্রমে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষে প্রসারিত হয়, মনুষ্য মণ্ডলীর মধ্যে তেমন প্রেম ও সদ্ভাব প্রসারিত হইয়া সমস্ত জীবাত্মার ঊর্দ্ধদৃষ্টি ক্রমশ পরমাত্মার দিকে উন্মুখ হইতে থাকে। পৃথিবী যেমন সূর্য্যকে চায়, জীবাত্মা তেমনি পরমাত্মাকে চায়; সূর্য্য যেমন পৃথিবীর সকল অভাব

পূরণ করে, পরমাত্মা তেমনি জীবাত্মার সকল অভাব পূরণ করেন।

পরমাত্মা পরমসত্য—জীবাত্মা চরম সত্য। মধ্যে প্রকৃতি। প্রকৃতির মধ্য দিয়াই জীবাত্মা পরমাত্মাকে চায়, প্রকৃতির মধ্য দিয়াই পরমাত্মা জীবাত্মার নিকটে প্রকাশিত হ'ন। প্রকৃতি যে অংশে পরমাত্মার অনুপ্রকাশ, সেই অংশে সত্ত্বগুণ প্রধান—যে অংশে পরমাত্মার আবরণ, সেই অংশে তমোগুণ প্রধান—যে অংশে অপ্রকাশ হইতে প্রকাশে এবং প্রকাশ হইতে অপ্রকাশে ওঠা নাবা, সেই অংশে রজোগুণ প্রধান। রজস্তমসাচ্ছন্ন মলিন সত্ত্বের মধ্য দিয়া জীবাত্মা পরমাত্মাকে চায়, রজতস্তমোমুক্ত শুদ্ধ সত্ত্বের মধ্য দিয়া পরমাত্মা জীবাত্মার নিকটে প্রকাশিত হ'ন। পরমাত্মাও আত্মা—জীবাত্মাও আত্মা। আত্মাই সকল-সত্যের সার সত্য—আত্মা বিনা সব অন্ধকার।